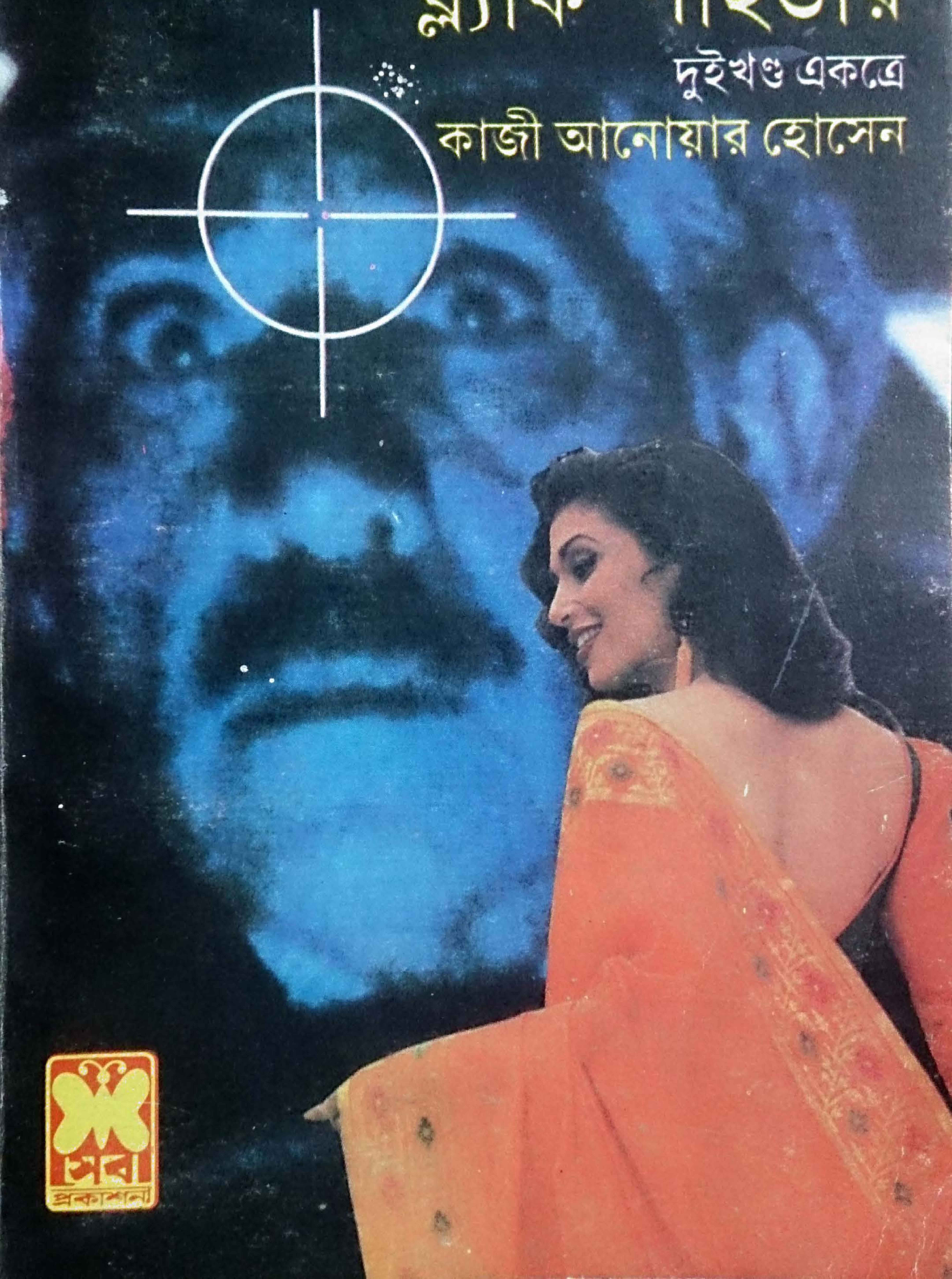
মাসুদ রানা

ব্ল্যাক স্পাইডার

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ব্ল্যাক স্পাইডার-১

ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে চলেছে অর্থলোলুপ, নিষ্ঠুর এক অর্ধোন্মাদ নরপিশাচ। হয় টাকা দাও, নইলে মৃত্যু। পাঁচ বছরের বাচ্চা মিমি যখন পিতৃহীন হলো তখন ক্ষুধার্ত বাঘের মত ঝাঁপ দিল রানা। গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হলো বম্বের কাম্বালা হিলে।

ব্ল্যাক স্পাইডার-২

নিপুণ হাতে জাল বিস্তার করেছে সে সারা পৃথিবী জুড়ে। আমেরিকার এফ.বি.আই, ব্রিটেনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, ফ্রান্সের ডুক্সেম ব্যুরো, সবাই হিমশিম খেয়ে গেছে লোকটির ভয়ঙ্কর কার্যকলাপে। শুধু সে আশ্চর্য ধূর্ত এক ব্ল্যাকমেইলারই নয়, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে চলেছে সে একটার পর একটা। অর্থালোলুপ, নিষ্ঠুর এক অর্ধোন্মাদ নরপিশাচ।

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

ব্ল্যাক স্পাইডার

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7035-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৫

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
BLACK SPIDER
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একান্ন টাকা

ব্ল্যাক স্পাইডার-১

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৭৪

এক

রাত দশটা।

ঢাকার মগবাজার এলাকার এক কুখ্যাত হোটেল–ব্যাম্বিনো।

রিসেপশন ডেস্কের ওপাশে উঁচু চেয়ারে বসে ঢুলছিল প্রৌঢ় তায়জুল ইসলাম। দরজায় খুট শব্দ হতেই চমকে সোজা হয়ে বসল। আগন্তুকের দিকে এক নজর তাকিয়েই বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দুই চোখ।

এ মেয়ে এখানে কেন? দিনের বেলা কেউ কেউ ভুল করে এখানে ঢুকে পড়ে, কিন্তু সন্ধের পর ভাল ঘরের কোন মেয়ে ভুলেও ঢোকে না এখানে। তবে? এত রাতে কি ভুল করে ঢুকে পড়ল এই ভদ্রমহিলা? এই হোটেল সম্পর্কে কিছুই জানা নেই মেয়েটার?

বাইশ-তেইশ বছর বয়স, যেমন গায়ের রঙ, তেমনি দেখতে, আর তেমনি দেহের গড়ন। সালমা-চুমকির কাজ করা একখানা হলুদ শিফন শাড়ি, নাভীর নিচে অজন্তা স্টাইলে পরা, গায়ে হাতকাটা কালো ব্লাউজ, সুগোল বাম কব্জিতে কালো ব্যান্ডে বাঁধা একটা রোলগোল্ডের ছোট্ট দামী ঘড়ি, অনামিকায় লাল পাথরের আংটি, ডান কাঁধে ঝুলানো একখানা এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ। কনক সেন্টের ঝাঁঝাল সুবাস এল তায়জুল ইসলামের নাকে। উন্মুক্ত ক্ষীণ কটিতে ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে মেয়েটা।

নড়েচড়ে বসল তায়জুল ইসলাম। দিন চারেক শেভ না করার ফলে গজিয়ে ওঠা কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্তি গাল চুলকাল। মেয়েটা নিশ্চয়ই নাম শুনে মনে করেছে খুব ভাল জাতের হোটেল এটা। সময় থাকতে সাবধান করে দিতে হবে, মালিকদের কেউ টের পাওয়ার আগেই। নইলে হরির লুট লেগে যাবে আজ রাতে এ মেয়েটিকে নিয়ে। মনে মনে কথা গুছাচ্ছিল তায়জুল ইসলাম, মুখে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল, কিন্তু সব গুলিয়ে গেল মেয়েটির প্রশ্নে।

'মোশতাক সাহেব আছেন?'

ও। এরই কথা বলেছিল তাহলে। মোস্তাকের মত ভয়ঙ্কর লোকের কাছে কি দরকার এ মেয়ের?

'আছেন। তেতলার আটাশ নম্বর রূমে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন মোস্তাক সায়েব। এই যে এদিকে সিঁড়ি। ওপরে উঠে বাঁয়ে।'

দ্বিরুক্তি না করে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, রওনা হলো সিঁড়ির দিকে। দ্রুত পায়ে উঠে যাচ্ছে উপরে।

মেয়েটির গমন পথের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল তায়জুল ইসলামের। কি দরকার এর মোস্তাকের কাছে? মোস্তাকের 'স'কে 'শ'র ঢঙে উচ্চারণ করতে দেখে বুঝে নিয়েছে সে মেয়েটা পশ্চিম বঙ্গের। ঢাকায় নতুন। একে ফাঁদে ফেলল কি করে মোস্তাক? মেয়েটা জানেও না কতখানি ভয়ঙ্কর এক হিংস্র বাঘের খাঁচায় ঢুকতে যাচ্ছে। কিছু কি করা উচিত ছিল ওর? পিছু ডেকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবে সে মেয়েটিকে? কিন্তু সেক্ষেত্রে মোস্তাক...নাহ্, দ্রুত ভেবে সিদ্ধান্ত নিল তায়জুল ইসলাম। করবার কিছুই নেই ওর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার মন দিল সে ঢুলুনিতে।

স্বল্পালোকিত করিডর ধরে এগিয়ে আটাশ নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াল মেয়েটা। কান পেতে শুনল ঘরের ভিতর থেকে কোন আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। তারপর টোকা দিল তিনটে।

খুলে গেল দরজা। বীভৎস একটা মুখ দেখা গেল দরজার ফাঁকে।

'এসেছেন?' চকচক করে উঠল মোস্তাকের এক চক্ষুর লোভাতুর দৃষ্টি। মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি তো মনে করেছিলাম বুঝি আসছেন না আজ আর।'

কথাটা বলতে বলতে ভিতরে ভিতরে রেগে উঠল মোস্তাক। ও আশা করেছিল আঁতকে উঠবে মেয়েটা ওর চেহারা দেখে, ভীতি দেখতে পাবে ওর আয়ত সুন্দর চোখে, শিউরে উঠে চোখ ফেরাবে অন্যদিকে। প্রথম দর্শনেই একটা ভয়ঙ্কর ছাপ ফেলতে চেয়েছিল সে এই মেয়েটির মনে। কিন্তু তার কোন চিহ্নই দেখতে পেল না সে মেয়েটার মধ্যে। স্থির নিষ্কম্প দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে মেয়েটা ওর কদাকার মুখের দলিত-মথিত মাংসপিণ্ড। না ভয়, না করুণা, কিছুই নেই সে দৃষ্টিতে।

মুক্তিযুদ্ধের জখম বলে চালায় এটাকে মোস্তাক। আসলে স্বাধীনতার মাস চারেক পর কাপ্তান বাজারের এক জুয়ার আড্ডায় সামান্য কয়েকটা টাকা নিয়ে মারপিট করায় আজ ওর এই হাল। মার খেয়ে চলে গেল ওরা, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল গ্রেনেড নিয়ে। গ্রেনেড, এল.এম.জি, স্টেন মোস্তাকেরও ছিল, আছেও; কিন্তু কোনরকম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই পর পর দশটা গ্রেনেড মেরে উড়িয়ে দিল ওরা জুয়াখানা, ছাত ধসিয়ে দিয়ে চলে গেল। প্রতিশোধ নিয়েছে মোস্তাক পরে, কিন্তু চেহারাটা ফিরে পায়নি। বাম চোখটা ফেলে দিতে হয়েছে উপড়ে। সেখানে লাল একটা কুৎসিত গর্ত। মুখের বাঁ দিকে ঠোঁট বলতে কিছুই নেই, গালটা ঝুলে আছে এবড়োখেবড়ো হয়ে, নোংরা দাঁত আর লালচে মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। নাকের অর্ধেকটা নেই, সে জায়গায় লালচে ফুটো। গলার একটা পাশ পুড়ে কুঁচকে আছে চামড়া কালো হয়ে। বীভৎস!

এই চেহারা দেখিয়ে মানুষকে চমকে দিয়ে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ লাভ করে সে। অনেকটা-জেদের মত। কিন্তু মনে মনে সে জানে কি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয় মানুষের মনে ওর মুখের দিকে চাইলে। স্বেচ্ছায় কোন নারী আসেনি ওর কাছে গত দুই বছরে, ধরে আনতে হয়েছে জোর করে। ঘৃণা

আর ভয় ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য মনে করে না সে আর এখন। কাঁটার মত খচখচ করে বুকের ভিতরটা, সেই সাথে আসে ভয়ানক এক জেদ। খারাপ লোক সে, অনেক অন্যায় করেছে জীবনে, অনেক পাপ করেছে; কিন্তু তাই বলে কি এমনই চরম শাস্তি পেতে হবে ওকে?

ঘরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল মেয়েটা। এগিয়ে গেল সোফা সেটের দিকে।

'প্লাস্টিক সার্জারি করে নিলেই পারেন,' মিষ্টি কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'হাজার দশেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল মোস্তাকের। মনে হলো কেউ যেন অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়েছে ওর সারা গায়ে। ঝট করে ফিরল মেয়েটার দিকে।

'আপনার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?' এক চোখে কটমট করে চাইল সে মেয়েটার মুখের দিকে। 'আমার চরকায় আমি নিজেই তেল দিয়ে নেব, আপনার সাহায্যের দরকার পড়বে না। আপনি আপনার নিজের চরকায়...'

'শাট আপ!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমক দিল মেয়েটা। 'মুখ সামলে কথা বলুন।'

মুহূর্তে কেঁচো হয়ে গেল মোস্তাক। আর একটু হলে হয়তো নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরে বসত সে! হঠাৎ বুঝতে পারল, এর কাছে বাহাদুরি দেখাতে গেলে ঝরঝরে হয়ে যাবে ওর নিজেরই ভবিষ্যৎ। এরই মাধ্যমে সে ঢুকেছে ব্ল্যাক স্পাইডারের দলে। ওর কাজ তদারক করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে একে বম্বে থেকে। যদি আগামী কাজটায় সে দক্ষতা দেখাতে পারে, যদি কাজ দেখিয়ে একে সন্তুষ্ট করতে পারে, তবেই সে আশা করতে পারে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার। গত দুই বছর প্রচুর টাকা পেয়েছে সে ব্ল্যাক স্পাইডারের কাছ থেকে। কিন্তু এই সেদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, এতদিন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়নি ওকে ইচ্ছে করেই, ছোটখাট মামুলি কাজ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে ওর কর্মক্ষমতা। বাংলাদেশে ব্ল্যাক স্পাইডার জাল বিস্তার করতে যাচ্ছে এই প্রথম। এই প্রথম ওকে সত্যিকারের কাজ দেয়া হয়েছে। এই কাজটা ঠিকমত করে দেখাতে পারলে বলা যায় না, ওকে হয়তো বাংলাদেশের চীফ বানিয়ে দেয়া হতে পারে। এই ওর সুযোগ। মেয়েটাকে চটিয়ে দিলে চিরতরে হারাবে সে এই সুবর্ণ সুযোগ।

'কিছু মনে করবেন না,' স্ত্রীলোকের কাছে ক্ষমা চাইতে হচ্ছে বলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে যাচ্ছিল ওর চেহারাটা, চট করে পিছন ফিরল সে। বহু কষ্টে গলার স্বরটা নরম করে বলল, 'আমার চেহারার ব্যাপারে একটু বেশি স্পর্শকাতর রয়ে গেছি আমি এখনও। আমার অবস্থায় পড়লে যে কেউ তাই হত। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। কফি আনাব, না চা?'

'কিছুই লাগবে না।'

সামনের টেবিলের উপর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সোফায় বসল মেয়েটা। মোস্তাকও বসল সামনের একটা সোফায়, সিগারেট ধরাল মুখটা একপাশে ফিরিয়ে, যাতে লাইটারের আলোয় ভয়ঙ্কর চেহারাটা আরও প্রকট হয়ে দেখা না যায়। সরাসরি চাইল মেয়েটা ওর মুখের দিকে।

'লোক জোগাড় হয়েছে?'

'হয়েছে। অনেক কষ্টে খুঁজে বের করেছি ওকে। এই কাজের জন্যে ওর চেয়ে যোগ্য লোক আর হয় না,' ঘড়ি দেখল মোস্তাক। 'নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। আসতে বলেছি ওকে।'

'কেন?' ভুরুজোড়া একটু কুঁচকে উঠল মেয়েটার।

'আমি মনে করলাম আপনি নিজ চোখে দেখলে খুশি হবেন,' একটু আমতা আমতা করে বলল মোস্তাক। 'অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারবেন ওর যোগ্যতা সম্পর্কে।'

'আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এই অপারেশনে কোনরকম ভুল-ভ্রান্তি হলে চলবে না। এটাই প্রথম। প্রথমবারে বিফল হলেই সব শেষ। যাকে ঠিক করেছেন, কে সে?'

'ওর নাম আলিবাবা। কোন পুলিস রেকর্ড নেই। সার্কাস পার্টির নাইফ-থ্রোয়ার ছিল। দারুণ হাত।' সিগারেটে টান দিল মোস্তাক। 'বার কয়েক আমার হয়ে চোরাচালান করেছে। নির্ভরযোগ্য লোক। কিন্তু অভাবী। টাকার অঙ্ক শুনে একবাক্যে রাজি হয়ে গেছে।'

'সব ভণ্ডুল করবে না তো শেষে?' এয়ারব্যাগ থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা বের করে কোলের উপর রাখল মেয়েটা, সেটা খুলে একটা ফিল্টার-টিপ্ড্ সিগারেট লাগাল ঠোঁটে। চট করে আগুন ধরিয়ে দিল সেটায় মোস্তাক।

'ভণ্ডুল হবে না। কাজটা ওর পক্ষে কিছুই না।'

'কি করতে হবে বুঝিয়ে বলেছেন ওকে?' নাক-মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল মেয়েটা।

'বলেছি।'

'ঠিক আছে, এবার রিপোর্ট দিন এ পর্যন্ত কি কি করেছেন।'

'গত মঙ্গলবার টাকা চেয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ রাতে একটা মাকড়সা আর একটা চিঠি রেখে আসবে আলিবাবা খাবার টেবিলে। আগামীকাল রাত ঠিক ন'টার সময় টাকা নিতে লোক পাঠাব ওখানে।' এই পর্যন্ত বলে একটু ইতস্তত করল মোস্তাক। 'কিন্তু···একটা ব্যাপার ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। যদি টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে?'

'ও নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। টাকা ও দেবে না, ঐ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। দেবে না জেনেই ওকে ঠিক করা হয়েছে আমাদের প্রথম টার্গেট হিসেবে। উড়ো চিঠির ভয়ে টাকা দেয়ার লোক ও নয়।'

'বুঝলাম। কিন্তু বাইচান্স যদি দিয়ে বসে তাহলে আমাদের আর করবার কিছুই থাকবে না।'

'দেবে না!' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল মেয়েটা।

'সেক্ষেত্রে ঠিক নয়টা পনেরো মিনিটে হাজির হবে সেখানে আলিবাবা। ভাল কথা, ছোরাটা এনেছেন?'

মেয়েটা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। এয়ারব্যাগ থেকে একটা সুদৃশ্য

কাঠের বাক্স বের করল। লোলুপদৃষ্টিতে মোস্তাক দেখল মেয়েটির শরীরের বাঁক। খচ করে একটা কাঁটা বিঁধল ওর বুকে। একটা দীর্ঘশ্বাস আসতে চাইছিল, চেপে নিল সচকিত হয়ে। এ মেয়ে ওর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাক্সটার দিকে চাইল সে এবার। চকচকে একটা ছুরি বের করে এনেছে মেয়েটা বাক্স থেকে।

ছুরিটা পরীক্ষা করল মোস্তাক। কাঠের বাঁট, চওড়া ইস্পাতের ফলা, তার উপর খোদাই করা আছে একটা কালো মাকড়সা। ছুরির ধারটা পরীক্ষা করে নিয়ে ফিরল সে মেয়েটির দিকে।

'এটা ব্যবহার করাটা কি ঠিক হবে?' জিজ্ঞেস করল মোস্তাক। 'এটা কোথা থেকে তৈরি করা হয়েছে বের করে ফেলবে পুলিস একটু চেষ্টা করলেই।'

'পারবে না। খুবই গোপনে তৈরি হয় এটা আমাদের জন্যে। ঠিক এই রকম ছুরিই আমরা ব্যবহার করছি পৃথিবীর সব জায়গায়। এটা আমাদের ট্রেড মার্ক।'

'কিন্তু এতসবের কি সত্যিই প্রয়োজন আছে?'

'কিসের কথা বলছেন?'

'এই ধরুন ভয় দেখানো চিঠি, মাকড়সা, এই ছুরি…এসব?'

'আছে।' বেশ কিছুটা তীক্ষ্ণ শোনাল মেয়েটার কণ্ঠস্বর। 'আমরা প্রচার চাই। আমরা চাই মাকড়সা, হুমকি দেয়া চিঠি, আর এই অদ্ভুত ছুরি দৃষ্টি আকর্ষণ করুক প্রেসের। হেড লাইন নিউজ হোক। তা নইলে আর সবাই ভয় পাবে কেন? পাকিস্তানী আমলে এদেশে তেমন বড়লোক কেউ ছিল না। কিন্তু এখন লম্বা লিস্ট রয়েছে আমাদের হাতে স্বাধীনতার পর রাতারাতি যারা টাকা করেছে তাদের। একে একে ধরব আমরা। আমরা চাই জোর পাবলিসিটি পাক জহুরুল হকের মৃত্যুটা। সুড়সুড় করে টাকা দেবে তখন আর সবাই। জেনে যাবে, মিথ্যে হুমকি দেয় না কালো মাকড়সা। জাপান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা সবখানে এইভাবেই মার্কেট তৈরি করেছি আমরা।'

'যদি সফল হতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের ভার কি আমার ওপর দেয়া হবে?' জিজ্ঞেস করল মোস্তাক।

'নিশ্চয়ই।' সিগারেটে টান দিল মেয়েটা। 'একবার যাকে আমরা দলে নিই তাকে সহজে বিদায় দিই না, যতদিন সে যোগ্যতা দেখাতে পারবে ততদিন থাকবে সে আমাদের সাথে।'

'তারপর?'

হাসল মেয়েটা। 'নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চাইছে? একটাইমাত্র পথ খোলা আছে আপনার সামনে। দিনের পর দিন নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে ধাপে ধাপে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা। বিফল হলেই চির বিদায়।'

খুশি হয়ে উঠল মোস্তাক। এতদিনে সত্যিই বস্ তাহলে ঢুকতে চলেছে একটা শক্তিশালী ইন্টারন্যাশনাল র‍্যাকেটে। নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিল

সে ব্ল্যাক স্পাইডারের নজরে পড়েছে বলে। এই রকম ভয়ঙ্কর একটা দুর্ধর্ষ দলের সাথে কাজ করবার স্বপ্ন দেখেছে সে বহু বছর। আজ এসেছে সুযোগ।

'বুঝলাম। সফল আমাকে হতেই হবে। হবও। আপনি দেখে নেবেন।' সোফা ছেড়ে একটা ছোট্ট দেয়ালে–আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল মোস্তাক। একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালল। ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে দেব খানিকটা?'

'না। ধন্যবাদ।'

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মেয়েটার দিকে চাইল মোস্তাক।

'আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানি না আমি। জিজ্ঞেস করাটা কি ভুল হবে ?'

'আরতি লাহিড়ী। মিস লাহিড়ী বলে ডাকতে পারেন।'

'আরতি…বাহ্, চমৎকার নাম!' মাথা ঝাঁকাল মোস্তাক। 'এই দলে কি বহুদিন থেকে আছেন?'

'আলিবাবার হাতে টাকা দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর,' মোস্তাকের প্রশ্নকে আমল না দিয়ে বলল মেয়েটা। 'কাজ শেষ করবার পর। কোথায় পাব ওকে ?' মাথায় রক্ত চড়ে গেল মোস্তাকের। চোখ পাকিয়ে চাইল আরতির দিকে।

'আপনি টাকা দেবেন? তার মানে? আপনি কেন দেবেন? আমি ওকে ঠিক করেছি, আমাকে টাকা দেবেন, আমি চুকিয়ে দেব ওর পাওনা। আমার লোক…'

'কোথায় পাব ওকে?' ঠিক একই সুরে আবার প্রশ্ন করল মেয়েটা। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে মোস্তাকের চোখে, পলকহীন।

'কিন্তু এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার।' কিছুটা সামলে নিয়ে এগিয়ে এসে আবার বসল মোস্তাক সোফায়। 'ব্ল্যাক স্পাইডার কি বিশ্বাস করেন না আমাকে?'

'আমার কি তাঁকে জানাতে হবে যে আপনি নির্দেশ মানতে রাজি নন?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল আরতি।

'না, না। তা কেন?' ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠল মোস্তাক। 'আমার কাছে ব্যাপারটা মনে হলো…'

'কোথায় পাব ওকে?' আবার জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'৫৩/ডি তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর,' প্রাণপণ চেষ্টায় রাগ চেপে বলল মোস্তাক।

টেলিফোন বেজে উঠতেই রিসিভার তুলে কানে ধরল মোস্তাক।

'আলিবাবা বলে এক ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করতে চান,' ভেসে এল তায়জুল ইসলামের কণ্ঠস্বর। 'ওপরে পাঠিয়ে দেব?'

'দাও।'

'ওই ভদ্রমহিলা কি আজ রাতে এখানেই থাকবেন? রুম লাগবে?'

আরতির দিকে চাইল মোস্তাক।

'আপনার কি এই হোটেলে রুম দরকার?'

মাথা নেড়ে নিষেধ করল মেয়েটা।

'না। উনি এখানে থাকছেন না।' কথাটা বলেই নামিয়ে রাখল সে রিসিভারটা।

দুই

লম্বা একহারা চেহারা আলিবাবার। নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো। চোখ দুটো চকচকে, ধূর্ত, সদাচঞ্চল। ঠোঁটের দুই কোণ নিচের দিকে ঝোলানো। বেপরোয়া একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে সব কিছুতে। কালোর উপর হলুদের ডোরা কাটা স্যুট, গাঢ় মেরুন রঙের শার্ট, সাদা বো টাই। পায়ে চকচকে পালিশ করা ডার্বি সোলের নাক থ্যাবড়া শু।

ভোঁস ভোঁস হুইস্কির গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছিল সে এতক্ষণ তায়জুল ইসলামের নাকের উপর, নাক কুঁচকে একটু পিছনে সরে গেল তায়জুল ইসলাম। সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তিনতলার আটাশ নম্বর রুম। ওপরে উঠে বাঁয়ে।' একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটু সামলে নিয়ে যান। ঘরে ভদ্র মহিলা আছেন। মদ খেয়ে তো একেবারে টাল-মাটাল অবস্থা...'

বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল আলিবাবার বাম হাতটা, খপ করে তায়জুল ইসলামের কলার চেপে ধরে ঝাঁকি দিল সামনের দিকে। ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা সরে গেল খানিকটা পিছনে, কড়াৎ করে ঘাড়ের হাড় ফুটল। ততক্ষণে টেনে কাছে নিয়ে এসেছে ওকে আলিবাবা।

'তর বাপের পয়সায় মদ খাইছি? নাটকার জানা! হিগাইবার আইছে আমারে! খামুস খায়া থাক, মিঞা, নাইলে একখি চাটকানা মাইরা দাত কয়টা ফালায়া দিমু!'

রক্তশূন্য বিবর্ণ হয়ে গেল তায়জুল ইসলামের মুখটা। ভীতি দেখা দিল চোখে। ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছে সে এই বেপরোয়া লোকের নিষ্ঠুর মুখে। লোকটা করতে পারে না এমন কাজ নেই।

তায়জুল ইসলামকে ভয়ে কাবু হতে দেখে খুশি হলো আলিবাবা। ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিল কলার। তারপর টলতে টলতে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

এত বেশি মদ খেয়েছে আলিবাবা আসলে ভয়ে। সন্ধে থেকে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, কিন্তু ভয়টা যাচ্ছে না কিছুতেই। অনেক টাকা দিতে চেয়েছে মোস্তাক। দশ হাজার! কিন্তু তাই বলে মানুষ খুন! ধরা পড়লে কি দশা হবে ওর? এই ছত্রিশ বছর বয়সেই হেন কাজ নেই যা সে করেনি, শুধু খুনটাই বাদ ছিল। এবার ষোলোকলা পূর্ণ হতে চলেছে, কিন্তু স্নায়ুগুলো বড় গোলমাল শুরু করেছে ওর।

টাকার এত বেশি দরকার না থাকলে স্রেফ নিষেধ করে দিত মোস্তাককে। এমন ঠেকে গেছে সে! এ ছাড়া এতগুলো টাকা এত সহজে

পাওয়ার আর কোন উপায় নেই ওর। মোস্তাক অবশ্য বলেছে এতে ধরা পড়বার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই. গোটা ব্যাপারটা খুবই সহজভাবে ঘটে যাবে. কারও সাধ্য নেই যে ওকে ধরে, কিন্তু পুলিসকে ছোট করে দেখতে পারে না আলিবাবা। বিশেষ করে খুন-খারাবির ব্যাপারগুলো কেমন করে জানি বেরিয়ে আসে, চেপে রাখা যায় না। ঠিক যখন মনে হয় আর কোন ভয় নেই, এবার সম্পূর্ণ নিরাপদ, তক্ষুনি দরজায় এসে টোকা দেয় পুলিস।

মোস্তাক বলে, তোমার ভয়ের কি আছে, কোন পুলিস রেকর্ড নেই, এই লোকটার সাথে পরিচয় তো দূরের কথা জীবনে দেখা হয়নি তোমার, কাজেই তুমি অত ভাবছ কেন? তোমাকে ঠিক যেভাবে বলেছি সেই ভাবে কাজটা করলে কারও বাপেরও সাধ্য নেই যে তোমাকে ধরে। কথাটা ঠিক। কিন্তু বলা এক কথা, করা আরেক। খুনের দায়ে পুলিস খুঁজছে ওকে ভাবতেই হাত-পা পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চায়। ছয়-সাত পেগ টানবার পর এখানে আসবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সাহস সঞ্চয় করেছে সে। ছুরিটা দেয়া হবে আজই।

স্খলিত পায়ে আটাশ নম্বর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, টোকা দিল তিনটে।

'ভেতরে এসো।' মোস্তাকের গলা শোনা গেল।

ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল আলিবাবা। ঢুকেই চোখ পড়ল আরতি লাহিড়ীর উপর। আঠার মত সেঁটে গেল দৃষ্টিটা মেয়েটার শরীরে। মোস্তাককে দেখতেই পেল না সে।

'দরজা লাগিয়ে দিয়ে এদিকে এসো।' হুকুম করল মোস্তাক।

বল্টু তুলে দিয়ে প্রথমে টাইটা ঠিক করল আলিবাবা। তারপর আবার ফিরল আরতির দিকে। এই ডানাকাটা পরী কি করছে মোস্তাকের ঘরে! একে দখল করতে যদি প্রয়োজন হয় মোস্তাককেও খুন করতে রাজি আছে ও এখন। নিজের অজান্তেই একটুকরো মন ভুলানো হাসি এসে গেছে ওর ঠোঁটে। এগিয়ে এল।

'হয়েছে, আলি। হাসি রাখো এখন। ইনি আরতি লাহিড়ী, আমাদের সাথে কাজ করছেন।'

আরও একটু বিস্তৃত হলো আলিবাবার হাসি। আরতির ঠিক সামনের সোফায় বসে তেরছা চোখে একবার মোস্তাককে দেখে নিয়ে মনোযোগ দিল রূপ বিশ্লেষণে।

'বাহ্! এক্কেরে হুর পরীর মথন খাপসুরাত। এক্কেরে মাঠার কেস! কইলকাত্তা থেইকা আইছেন বুঝি?'

'কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবেন। তার বেশি কথা বলার দরকার নেই।' ঠাণ্ডা গলায় বলল আরতি।

'হাইরি মুরা! খরাপ কি কইলাম? আমার লগে মিজাদ দেহায়ো না সুন্দরী, বালা অইব না!' কথাটা বলে অভিভূত করে দেয়ার জন্যে চোখমুখ পাকিয়ে সামনে ঝুঁকল আলিবাবা, ঠিক এই সময় চড়াৎ করে চড় পড়ল ওর

গালে। চমকে চেয়ে দেখল এবার বাম হাত তুলেছে মোস্তাক। চট করে মাথাটা সরিয়ে নিল সে একপাশে। উঠে দাঁড়িয়েছে আলিবাবা, মোস্তাকও দাঁড়িয়েছে বুক চিতিয়ে। চড় খেয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে ওর বাম চোখ থেকে। কিন্তু ধক ধক জ্বলছে ওর চোখ দুটো, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে মোস্তাকের চোখের দিকে, নড়তে সাহস পাচ্ছে না, পাছে আবার থাবড়া আসে। সোফার দিকে ইঙ্গিত করল মোস্তাক বুড়ো আঙুল দিয়ে।

'বসো! একদম চুপ!'

বসে পড়ল আলিবাবা। আলতো করে হাত বুলাল চড় খাওয়া গালে। বলল, 'কামটা বালা করলেন না, হুজুর।'

'আবার কথা বলে!' খেঁকিয়ে উঠল মোস্তাক। লাল হয়ে উঠেছে ওর চোখটা।

'একে দিয়ে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না,' যেন আলিবাবা এই ঘরে অনুপস্থিত, এমনি ভঙ্গিতে বলল আরতি। 'মাতাল হয়ে আছে, তাছাড়া বেয়াড়া, তার ওপর যতদূর মনে হয় খুবই নার্ভাস লোক।'

'যাই হোক, এ কাজটা ঠিক মত করতেই হবে ওকে। যদি গোলমাল কিছু করে খুন করে ফেলব ওকে আমি।'

আলিবাবা জানে, বাজে হুমকি দেয়ার লোক মোস্তাক নয়। হঠাৎ কেন যেন ভয়ানক দমে গেল সে মনে মনে। ছটফট করে বলে উঠল, 'খারোন, এউগা কোরচেন আছে...' মোস্তাকের লাল চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেল আলিবাবা।

'যা বলেছি তা তুমি শুনেছ,' ধমকে উঠল মোস্তাক। 'একটু এদিক ওদিক করলেই স্রেফ মারা পড়বে।'

'কিছু না করতেই দেহি মাইর সুরু কইরা দিছেন। ইদিক উদিক করতাছে ক্যাঠা?'

'না করলেই তোমার নিজের মঙ্গল।' ছুরিটা টেবিল থেকে তুলে এগিয়ে ধরল মোস্তাক আলিবাবার দিকে। 'দেখিয়ে দাও ওনাকে। এই হচ্ছে তোমার অস্ত্র। হাত ঠিক আছে কিনা দেখতে চাই আমরা।'

হাত বাড়িয়ে ছুরিটা নিল আলিবাবা। বাম হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করল। নেড়ে-চেড়ে বুঝে নিল ওজনটা। আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসে গেল ওর চেহারায়। মনে হলো কেটে গেছে মাতলামির ভাবটা, অনিশ্চয়তা দূর হয়ে চোখের দৃষ্টিতে এসেছে আত্মবিশ্বাসের দ্যুতি।

'এক লম্বরি মাল!' প্রশংসার দৃষ্টিতে উল্টে-পাল্টে দেখল সে ছুরিটাকে। উপর দিকে ছুঁড়ে দিল ছুরিটা, বনবন করে ঘুরছে, নেমে আসতেই খপ করে ধরে ফেলল হ্যান্ডেল। 'জব্বর জিনিস আমদানী করছেন!'

'দেখিয়ে দাও ওনাকে।' আবার বলল মোস্তাক।

টেবিলের উপর থেকে তাসের প্যাকেট তুলে নিয়ে হরতনের টেক্কা বের করল আলিবাবা। উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজার একটা খাঁজে আটকাল সেটাকে। তারপর চলে গেল ঘরের কোণে। বাম হাতে চিবুক রেখে ওর

কার্যকলাপ লক্ষ করছে আরতি লাহিড়ী।

হাতের তালুর উপর ছুরিটা রেখে ওজন আর ভারসাম্য বুঝে নিল আলিবাবা, তারপর সাঁই করে মারল ওটা বাথরুমের দরজার দিকে। মাঝপথে ঝিক করে উঠল ছুরিটা একবার বাতির আলোয়। পরমুহূর্তে ঘ্যাচ করে বিঁধল দরজার গায়ে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হরতনের চিহ্নটা ভেদ করে পুরু পারটেক্সের দরজাটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে ছুরি।

একলাফে উঠে গিয়ে তাস সহ ছুরিটা খুলে নিয়ে এল মোস্তাক।

'এই দেখুন, দেখেছেন? দশবারের মধ্যে দশবারই লাগবে ছুরি এই জায়গায়।'

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল আরতি। হেলান দিয়ে বসে বলল, 'হ্যাঁ, ভালই তো মনে হচ্ছে।'

টলতে টলতে এসে দাঁড়াল আলিবাবা।

'আমার মথন আর এউগা মানু বিচ্‌রাইয়া পাইবেন না সারা পাকিস্তানে, খুক্‌কু, সারা বাংলাদেশে।' বুকের উপর টোকা দিল সে গর্বের সাথে। 'কি কন, চলব আমারে দিয়া?'

'চলবে।' ওর দিকে না চেয়ে উত্তর দিল আরতি। 'তবে নার্ভাস না হলেই হয়! ঘাবড়ে গিয়ে...'

'আরে ঐল্লেইগা চিন্তা কইরেন না। ঘাবরায়া গেলে বি নিশানা হিলবো না। যাউগ্যা, ট্যাকার কথা কন। অহনে কছু দিবার লাগব।'

সোজা আলিবাবার চোখে চোখ রাখল আরতি লাহিড়ী।

'লোকটা মারা গেলে তারপর টাকা পাবেন। তার আগে নয়।' কথাটা বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে সোফা ছেড়ে। ব্যাগটা তুলে ঝুলাল কাঁধে। 'তেপ্পান্ন বাই ডি তাজমহল রোডে কাল রাত এগারোটায় দেখা করব আমি আপনার সাথে। তখন ঘটনার পুরো রিপোর্ট চাই আমার।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আলিবাবা, থেমে গেল মোস্তাককে ক্ষিপ্ত ভাবে হাত নাড়তে দেখে।

'চলি,' বলল মেয়েটা। 'আরও কাজ পড়ে আছে।' মোস্তাকের উদ্দেশে বলল, 'কাল দুপুরে এখানে আসব আমি। থাকবেন।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে থামল মেয়েটা। স্থির দৃষ্টিতে চাইল মোস্তাকের চোখে। 'মনে রাখবেন, সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না আমরা।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোন ভুল হবে না,' বলল মোস্তাক।

'হলে আপনার কপালে কি আছে জানা আছে নিশ্চয়ই?'

গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল মোস্তাক, 'জানি। মৃত্যু।'

বেরিয়ে গেল আরতি লাহিড়ী।

বন্ধ হয়ে গেল তেতলার আটাশ নম্বর দরজাটা।

তিন

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সাততলায় তিনটে কামরা নিয়ে মাসুদ রানার অফিস।

দেয়ালের গায়ে ছোট্ট সাইনবোর্ড: রানা এজেন্সি—প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটারস। পর্দা সরালেই টুংটাং বেজে উঠবে একটা মৃদু মিষ্টি ঘণ্টা। পরমুহূর্তে চোখ পড়বে একটা মিষ্টি হাসিমুখের উপর। সালমা। রানার সেক্রেটারি। সুদৃশ্য একটা টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসে ডুবে আছে ফাইলে, দু'পাশে দুটো দুটো চারটে ফাইল ক্যাবিনেট, কোনটার ড্রয়ার খোলা কোনটার আধখোলা। একটু দূরে মাঝারি একটা টেবিলের উপর একখানা আঠারো ইঞ্চির রেমিংটন টাইপ রাইটার আরেকটা বাংলা অপটিমা। ঘরটা বেশ বড়। একপাশে দর্শনার্থীদের বসবার জন্যে সুন্দর করে সাজানো রয়েছে দুই সেট ফোমের সোফা, অন্যপাশে সালমা কবিরের ডেস্ক। ডানপাশের দেয়ালে দুটো দরজায় নেমপ্লেট লাগানো—একটা রানার, একটা গিলটি মিঞার।

বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থা এটা। এরই আড়ালে কাজ করছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা। নানান ধরনের লোকের নানান ধরনের সমস্যার সমাধান করে চলেছে সে একটার পর একটা। এতই সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে যে হুড়মুড় করে আসতে আরম্ভ করেছে কেস, বিভিন্ন রকমের ফন্দি ফিকির করেও ঠেকাতে পারছে না সালমা আর গিলটি মিঞা। ফলে সমস্ত চাপ এসে পড়েছে আসলে ওদের দু'জনেরই উপর। কারণ সপ্তাহের মধ্যে চারদিনই অনুপস্থিত থাকে রানা। কোথায় যায়, কি করে জিজ্ঞেস করবার নিয়ম নেই।

প্রথামত আজও অনুপস্থিত মাসুদ রানা। যার যার ঘরে ব্যস্ত রয়েছে সালমা ও গিলটি মিঞা।

টুংটাং বেজে উঠল বেল।

চোখ তুলেই ঝিক করে হেসে উঠল সালমা। পর্দার ফাঁকে একটা পরিচিত মুখ দেখা যাচ্ছে।

'আজ কোন্ দিকে সূর্য উঠল?' জিজ্ঞেস করল সালমা। 'হঠাৎ এদিকে কি মনে করে? বাড়িতে মন টিকছিল না বুঝি?'

'ঠিক ধরেছ!' এগিয়ে এল রানা। 'তোমাকে ক'দিন না দেখে মনটা এমন আকুলি বিকুলি শুরু করল...'

'হয়েছে, হয়েছে।' গম্ভীর হয়ে গেল সালমা। 'এখন সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ঢোকো। আটটা মোস্ট ইম্পরট্যান্ট কেস পেনডিং পড়ে আছে তোমার জন্যে।'

'ওহ্!' বুকে হাত চেপে বসে পড়ল রানা সালমার সামনের চেয়ারে। যেন ভয়ানক চোট পেয়েছে কলজেতে। 'আটটা! ওরেব্বাপরে বাপ! মরে যাব,

সালমা…দুটো দাও।'

'ওসব কোন কথা শুনতে চাই না! লজ্জা করে না নিজের অফিসে চোরের মত ঢুকতে? এগুলো শেষ না করলে উঠতে দেব না আজ। কি খাবে বলো, চা না কফি?'

'কফি!' জবাব দিল গিলটি মিঞা। আকর্ণবিস্তৃত হাসি মুখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে সে ঘর থেকে। 'তোমার কফির তুলনা হয় না, সালমা দি। কিন্তুক মানুষটা বড্ড কড়া, এই যা একটুকুন অসুবিদে।'

'মানুষ, না পিশাচ!' বলল রানা। 'দেখো তো, গিলটি মিঞা, এলাম অফিসের কাজকর্ম একটু তদারক করতে, মিনিট দশেক হম্বি-তম্বি করে চলে যাব–তা না, আট-দশটা কেস চাপাচ্ছে আমার কাঁধে। যেন উনিই এই কোম্পানীর মালিক, আমি ওঁর কর্মচারী।'

'আলবৎ মালিক!' চোখ পাকাল সালমা। 'আমাকে ছাড়া চলবে তোমার এই কোম্পানী? চালাও দেখি! কে খাটবে এই ভূতের বেগার খাটনি? আমরা দুইজন খেটে খেটে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলছি, আর যার জন্যে এত খাটনি, তার একটু অফিসে এসে দেখবারও সময় হয় না এরা বেঁচে আছে না মরে গেছে! তোমার তো আর জবাবদিহি করতে হয় না মক্কেলদের কাছে, হলে বুঝতে।'

গজগজ করতে করতে কফি কর্নারে চলে গেল সালমা।

'ওনাকে দোষ দেয়া যায় না, স্যার,' নরম গলায় বলল গিলটি মিঞা। ঠিক যেন পরামর্শ দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু মনটা খুব লরম। দুই মিলিটেই ঠাণ্ডা। মুকটা ভার করে নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকুন, দেকবেন ছটা কেস উঠিয়ে লিয়েচে।'

নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল রানা। নিজে হাতে ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রেখেছে সালমা প্রত্যেকটা জিনিস। ফুলদানীতে তাজা ফুলের তোড়া। প্রত্যেকটা জিনিস যেখানে যেটা থাকা দরকার ঠিক সেইখানে সেটা সাজানো। রানার নয়, অফিসটার প্রেমে পড়েছে আসলে সালমা। এই ঘরটা খালি থাকলে ওর মনে হয় সারাটা অফিস খাঁ খাঁ করছে, শূন্য। কাজ থাকুক আর নাই থাকুক, রানার ঘরে রানা থাকলে ওর মনে হয় পরিপূর্ণতা এল, কোথাও আর কোন ত্রুটি নেই। হয়তো মনের গোপন গভীরে রানার জন্যে একটা অনিশ্চয়তায় ভোগে মেয়েটা। স্পষ্ট করে বোঝা যায় না রানাকে। পরিষ্কার জানে না, কিন্তু অনুভব করতে পারে সে, রানার আসল পরিচয় প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়, আরও কিছু পরিচয় আছে, সেটা ঢাকবার জন্যেই ওর এই গোয়েন্দাগিরির ছল। আসল কাজটা ভয়ঙ্কর ধরনের কিছু অনুভব করতে পারে সে। প্রথম দিকে সন্দেহ হয়েছিল কাজটা হয়তো বে-আইনী, কিন্তু এখন আর সে সন্দেহ নেই; ক্রমে মানুষটাকে যতই চিনেছে ততই নিঃসন্দেহ হয়েছে সে–এই লোকের পক্ষে বে-আইনী বা অনাচার কিছু করা সম্ভব নয়। হাজার ভেবেও বের করতে পারেনি ওর আসল কাজটা কি, জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হয়নি। কেবল মনের কোণে একটা আবছা

অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে, যদি কোনদিন এ খেলার পাট চুকিয়ে দেয় রানা! তাহলে কি উপায় হবে ওর? এই পরিবেশ, এতখানি দায়িত্ব, সম্মান, এমন আশ্চর্য ভদ্র ও সংযত মনিব, সহকর্মীর স্নেহ কোথায় পাবে সে আর?

এক কাপ কফি, সেই সাথে গোটা আষ্টেক মোটাসোটা ফাইল রেখে গেল সালমা। মুখ ভার করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ওর গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেলল রানা।

'হাসছ যে?'

'কাজ ছাড়া দুনিয়াতে কিছুই নেই, তাই না, সালমা?'

'এই কাজ থেকেই আমাদের বেতন আসে, তাই না, বস্?'

'তা ঠিক।' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ফাইলগুলোর দিকে চেয়ে চোখমুখ কুঁচকাল একবার, তারপর যেন চিরতার জল খাচ্ছে এমনি ভাবে বলল,'কোনটা মোস্ট আর্জেন্ট?'

'সবগুলোই আর্জেন্ট। কিন্তু পর পর সাজিয়ে দিয়েছি, একটার পর একটা দেখলেই চলবে। শেষের তিনটেতে কেবল সই করলেই চলবে, বাকি কাজ আমি করে দিয়েছি।'

'গুড! এই তো লক্ষ্মী মেয়ে!' বলেই ঝপাৎ করে ফাইলগুলো উল্টে নিল রানা। শুরু করল শেষটা থেকে।

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল সালমা। ফিরে এল পনেরো মিনিট পরেই।

'মিসেস রাবেয়া হক দেখা করতে চান।'

'কোন্ রাবেয়া হক? জহিরুল হকের স্ত্রী?'

'জিজ্ঞেস করিনি। মনে হচ্ছে তাই হবে। দামী পোশাক-পরিচ্ছদ। পাঠিয়ে দেব?'

'দাও।' বলেই চতুর্থ ফাইলটায় সই করে বন্ধ করল সেটা।

টেবিলের নিচ দিয়ে পা দুটো লম্বা করে দিয়ে শরীরটা টান করে আড়মোড়া ভাঙল রানা। ভাল করেই চেনে সে জহিরুল হক ও তার স্ত্রীকে। যেমন ধনী, তেমনি কট্টর আদর্শবাদী লোকটা। কয়েক বছর আগে একটা ছোটখাট গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিল, কৌশলে জট খুলে দিয়েছিল রানা। তারপর থেকে প্রায় বন্ধুর মত হয়ে গেছে ওরা। পারিবারিক প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ডাক পড়ে রানার। সব সময় রানা যে উপস্থিত থাকতে পারে তা নয়, কিন্তু নিমন্ত্রণের কামাই নেই। টেলিফোনে কথাবার্তা হয় সাধারণত, আজ একেবারে নিজেই এসে হাজির। ব্যাপার কি? কোন বিপদ আপদ ঘটল নাকি আবার?

'এই যে আসুন, ভাবী।' সোজা হয়ে বসল রানা। 'বসুন। মুখটা এরকম লাগছে কেন? ঝগড়া হয়েছে, না জহির ভাই ভেগেছে কোন সপ্তদশীকে নিয়ে?'

হাসল রাবেয়া হক। বলল, 'ইস্ ভেগে দেখুক তো একবার? পিষে ফেলব না!'

পিষে ফেলার ভঙ্গি দেখে আঁতকে উঠল রানা। বলল, 'ওরেব্বাপরে বাপ!

তাহলে নিশ্চয়ই ভাগেনি, ঝগড়া করেছে।'

মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'তা-ও করেনি? তাহলে তো খুব সিরিয়াস ব্যাপার মনে হচ্ছে। বলে ফেলুন।'

বিমর্ষ মুখে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে রইল রাবেয়া হক, তারপর বলল, 'ভয়ানক এক দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি, ভাই। কোন পথ না দেখে তোমার কাছে ছুটে এলাম। তোমার জহির ভাইয়ের কাছে বিচ্ছিরি একটা চিঠি এসেছে।'

'টাকা চায়?'

'হ্যাঁ। আজ রাত ন'টার সময় দশ লাখ টাকা দিতে হবে, নইলে...' গলাটা কেঁপে গেল রাবেয়া হকের, 'নইলে ও বলছে খুন করবে জহিরকে। ব্যাপারটাকে হেসে...'

'ঠিক বলেছেন!' বলল রানা। 'হেসে উড়িয়ে দেয়াই উচিত।'

'পারছি না সেটা।' ব্যাকুল চোখে চাইল রাবেয়া হক রানার মুখের দিকে। 'আমার মনে হচ্ছে যা বলেছে ঠিক তাই করবে লোকটা। খুবই গুরুগম্ভীর চিঠি, একটা ফালতু কথা নেই সে চিঠিতে।'

'দশ লাখ!' আপন মনে বলল রানা। 'বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক বলে মনে হচ্ছে!' হাত বাড়াল সামনে। 'এনেছেন চিঠিটা? দেখি?'

'ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওটা তোমার জহির ভাই। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না ও কিছুতেই। কিছুতেই পুলিসে খবর দিল না। তুমি তো জানো কি রকম গোঁয়ার। ওর বদ্ধমূল ধারণা, হয় এটা পাগল-ছাগলের চিঠি, নয়তো কেউ ঠাট্টা করেছে।'

'এসব চিঠি সাধারণত তাই হয়,' বলল রানা। 'কত রকমের মানুষ আছে দুনিয়ায়–দিল ছেড়ে একটা উড়ো চিঠি, তারপর দূর থেকে চিঠির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবে, আর পেট চেপে ধরে হাসবে। এসব এত বেশি পাত্তা দিলে চলে না।'

'কিন্তু ব্ল্যাক স্পাইডারের এই চিঠি...'

'ব্ল্যাক স্পাইডার! সেটা আবার কি?'

'চিঠির নিচে নাম নেই, লেখা রয়েছে–ব্ল্যাক স্পাইডার।'

এবার হো হো করে হেসে উঠল রানা।

'বোঝা গেছে। আস্ত গাছ-পাগল। ব্যস, এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, ভাবী। হয় পাগল, নয় রসিকতা করেছে কোন বন্ধু-বান্ধব।'

'জহির বলে এটা বিরোধী দলের কাজ। আগামী ইলেকশনে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ও এখন থেকেই। এটা টের পেয়ে এখন থেকে লেগে গেছে কয়েকজন ওর পেছনে। ক'দিন আগে কাগজে বেরিয়েছে একটা হারানো বিজ্ঞপ্তি–জহিরুল হক নামে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি, গায়ের রঙ শ্যামলা, তাহার মাথায় ছিট আছে, কেহ তাহার কোন সংবাদ পাইলে... তার আগে তো ছবিই ছেপে দিয়েছিল–এই ব্যক্তি কোম্পানীর ক্যাশ হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া, ইত্যাদি, কেহ ইহার কোন খোঁজ দিতে পারিলে, বা

ধরাইয়া দিতে পারিলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

'এসব করে কি লাভ?' অবাক হয়ে গেল রানা।

'সবার কাছে হাস্যাস্পদ করে দেয়া আর কি। সহ্য না করেও উপায় নেই। কেস করতে গেলে পত্রিকার বিরুদ্ধে কেস করতে হয়, সেটা করলে ওর বক্তৃতা, বিবৃতি কিছুই আর ছাপা হবে না কোন পেপারে, তাছাড়া আরও হাসাহাসি হবে এ নিয়ে–তাই সহ্য করতেই হয়। পেপারকে চটিয়ে তো আর পলিটিক্স্ হয় না। যাই হোক, জহির মনে করছে এটা ওই জাতীয় একটা কিছু। আমার তা মনে হয় না। মঙ্গলবার পেয়েছিলাম প্রথম চিঠি, আজ রাতে টাকা দেয়ার কথা লেখা ছিল। কিন্তু আজ সকালে...' থেমে গেল রাবেয়া হক। নিজেকে সামলে নেয়ার জন্যে চেয়ারের হাতলটা আঁকড়ে ধরেছে জোরে।

'আজ সকালে আরেকটা চিঠি এসেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। আজ সকালে নাস্তার টেবিলে খাঁচাটা তুলেই দেখি প্লেটের উপর সাজানো রয়েছে প্রকাণ্ড একটা কালো মরা মাকড়সা।' শিউরে উঠল রাবেয়া হক। 'ওটার নিচে চার ভাঁজ করা একটা চিঠি। তাতে লেখা, রাত ঠিক নয়টার সময় টাকা নিতে লোক আসবে। টাকা না দিলে কিংবা পুলিসে খবর দিলে মারা পড়বে জহির।'

'নাহ্, আর তো রসিকতা মনে হচ্ছে না এখন!' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'একটু যেন বেশি বাড়াবাড়ি বলে বোধ হচ্ছে। মাকড়সাটা ওখানে এল কি করে?'

'কি করে এল জানি না। এত করে বললাম জহিরকে পুলিসে খবর দিতে, কিছুতেই শুনল না আমার কথা। ওর ওই এক কথা, খবরটা জানাজানি হলে কাগজে উঠবে, আবার একচোট হাসাহাসি হবে ওকে নিয়ে, নষ্ট হবে ওর ইমেজ। এসব বিরোধী পার্টির চাল।'

সালমা ঢুকল ঘরের দরজায় দুটো টোকা দিয়ে।

'কি দেব, স্যার? কফি না কোল্ড ড্রিংক?'

লোকজনের সামনে অফিশিয়াল ফরমালিটি রক্ষা করে চলে সব সময় সালমা। 'আপনি' করে বলে, আর প্রায় প্রতিটা বাক্যের শেষে একবার করে 'স্যার'। রাবেয়া হকের দিকে ফিরল রানা।

'কি খাবেন, ভাবী?'

সালমাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে রাবেয়া হক বলল, 'আপনার যা খুশি দিন।'

'আর আপনাকে কি দেব, স্যার?'

'কফি দাও। আর শোনো, এখনি বলে দিই, নইলে পরে ভুলে যাব। চারশো তেপ্পান্ন নম্বর কেসে তোমার কংক্লুশনটা ভুল। আমার নোটটা ভাল করে পড়ে দেখো। অন্য লাইনে ভাবতে হবে তোমাকে। যেটাকে তুমি এভিডেন্স বলছ সেটা এভিডেন্স নয়।' হাসল রানা। 'আর সব কিছু খুব ব্রিলিয়ান্টলি করেছ। কিন্তু একটু ক্লাম্যি।'

'ইয়েস, স্যার।'
সালমা বেরিয়ে যেতেই মিসেস রাবেয়া হকের দিকে ফিরল রানা।
'আজ রাতে আপনাদের প্রোগ্রাম কি?'
'কোথাও যাওয়ার প্রোগ্রাম নেই। কি একটা ভাল ছবি নাকি দেখাবে আজ টেলিভিশনে, তাই দেখবে ও।'
'আপনি দেখবেন না?'
'নাহ্। ইংরেজি ছবি আমার ভাল লাগে না। বাংলা ছবি হলেও দেখি না। রাগ লেগে যায়। পোনে দশটায় দেখাব বলে এমন নাকে দড়ি দিয়ে খেলাতে শুরু করে টেলিভিশনওয়ালারা, শুরু করতে করতে সেই রাত সাড়ে দশটা, কি এগারোটা! এই বুঝি শুরু হলো, এই বুঝি শুরু হলো মনে করে ওঠাও যায় না, আর মাঝের পচা প্রোগ্রামগুলো সহ্যও করা যায় না। ওরা মনে করে ওদের কৌশল কেউ টের পাচ্ছে না, খুব একটা চালাকি হচ্ছে। বিরক্তির একশেষ! যাই হোক, তুমি কি পরামর্শ দাও? পুলিসকে জানাব?'
চোখ বুজে দশ সেকেন্ড ভাবল রানা। তারপর মাথা নাড়ল।
'জহির ভাইয়ের মতের বিরুদ্ধে কাজটা ঠিক হবে না। তাছাড়া ব্যাপারটা জানাজানি হলে, এবং কাগজে বেরোলে ওঁর ইমেজের জন্যে সত্যিই ক্ষতিকর হবে। এটাকে পাবলিসিটি স্টান্ট হিসেবে নিতে পারে মানুষ। তাছাড়া ধরুন আমরা পুলিসকে জানালাম। কি হবে তাহলে? বড়জোর একটা সেপাইকে পাহারায় বসিয়ে দেয়া হবে বাড়িতে। যদি এই ব্ল্যাকমেলার সত্যিই সিরিয়াস হয়, তাহলে একজন সেপাই তার আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে যথেষ্ট নয়। যদিও আমি বিশ্বাস করি না এ লোক পাগল ছাড়া কিছু, তবু আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। বিপদ হোক বা না হোক, সাবধান হতে তো কোন ক্ষতি নেই। আমার এক সহকারীকে নিয়ে আমি হঠাৎ হাজির হয়ে যাব আজ রাতে। ওই পথেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ভাবলাম দেখে যাই ভাই-ভাবী কেমন আছে। ঠিক আছে? আমার বিশ্বাস কিছুই ঘটবে না, কিন্তু যদি দেখা যায় ঘটতে চলেছে, তাহলে জহির ভাই, আমি আর আমার সহকারী—এই তিনজনের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না, সে যত বড় মস্তানই হোক না কেন। কি বলেন?'
বিরাট একটা বোঝা যেন নেমে গেল রাবেয়া হকের মাথা থেকে। রানার চোখের উপর কৃতজ্ঞ দৃষ্টি মেলে ধরে হাসল।
'তুমি এলে খুবই ভাল হয়, ভাই। বাড়িতে শুধু তোমার জহির ভাই, আমি, মিমি, আর বাবুর্চি রহমান। আশেপাশে কোন বাড়ি নেই যে চিৎকার করলে সাহায্য পাওয়া যাবে। তুমি যদি আসো...'
'আমি আসছি। আটটার দিকে পৌঁছে যাব আমি। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান। ওসব বাজে ভয় দূর করে দিন মনের মধ্যে থেকে। এবার মিমির গল্প শোনা যাক। স্কুলে যাচ্ছে ঠিক মত? কাঁদে না?'
'রোজই কাঁদে, কিন্তু আগের মত অত গোলমাল করে না। নার্সারির টীচারটা ভাল, আদর-টাদর করে বেশ ভজিয়ে এনেছে। মনটা বসছে আস্তে

আস্তে। সেদিন বলছে, এ বি সি ডি আমি সব পারি। জিজ্ঞেস করলাম, একেবারে যেড পর্যন্ত? বলে, হ্যাঁ বলব? বললাম, বল্ দেখি? মেয়ে জিজ্ঞেস করে কি, কোন্‌টা বলব, ছোট হাতের না বড় হাতের?'

কফি নিয়ে ঘরে ঢুকছিল সালমা, রানার সাথে সাথে সে-ও হেসে উঠল হো হো করে। তিন মিনিটে হেসে হাসিয়ে মনটা হালকা করে নিয়ে চলে গেল রাবেয়া হক।

সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইল রানা কয়েক সেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে।

ব্ল্যাক স্পাইডার।

কতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত ব্যাপারটাকে? ঠাট্টা-মস্করা বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না ব্যাপারটাকে রানা কেন জানি। এটাকে বিরোধী দলের কাজ ভেবেও হালকা করতে পারছে না মন। কোন ক্র্যাক পট?

খানিক ইতস্তত করে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। ইন্টেলিজেন্সের জামানের সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করলে কোন ক্ষতি হবে না। ব্ল্যাক স্পাইডার বলে কোন লোকের কথা ও জানে কিনা জিজ্ঞেস করবে শুধু। আধ মিনিট পর লাইন পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু আখতারুজ্জামানের পি.এ. জানাল, এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন ডি.আই.জি. সাহেব, চারটের আগে ফিরবেন না, রানার কোন মেসেজ থাকলে...

কোন মেসেজ নেই জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

চার

প্রকাণ্ড চেহারার রহমান এসে দাঁড়াল শরবতের ট্রে হাতে। দুই হাতের থোকা থোকা মাস্‌ল্ যে কোন বডি বিল্ডারের ঈর্ষা জন্মাবার জন্যে যথেষ্ট। মুখটা কঠোর, যেন পাথর কেটে তৈরি, কিন্তু চেহারার সাথে সম্পূর্ণ বেমানান একজোড়া মায়াময় চোখে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অন্তরের সরলতা।

সোফা ছেড়ে উঠে নিজ হাতে গ্লাসগুলো নামাতে শুরু করল জহিরুল হক। রানার সামনে একটা গ্লাস নামিয়ে দিয়ে স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল। রানা একটা সিগারেট বের করে নিতেই নিজে একটা ঠোঁটে লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল দুটোতেই। তারপর চশমাটা খুলে কটমট করে চাইল রানার মুখের দিকে।

'চালবাজি রাখ, রানা। ওসব চাল আমার জানা আছে। এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলে, হঠাৎ মনে হলো একগ্লাস শরবৎ না খেলে কলজেটা ফেটে যাবে...বাহ্, নাক টিপলে দুধ পড়ে আমার, তাই না? নিশ্চয়ই তোমাকে ডেকে এনেছে রাবেয়া। টু গার্ড মি এগেইনস্ট এনি মিস্‌হ্যাপ্। টেল মি, ডিড্‌নট্ শি?'

হাসল রানা। রাবেয়া হকের দিকে চেয়ে বলল, 'তিন মাস ম্যানচেস্টারে কাটিয়ে এসে জহির ভাইয়ের ইংরেজি উচ্চারণটা দারুণ হয়েছে, তাই না, ভাবী?'

'হ্যাঁ। মেজাজটাও।' বলল রাবেয়া হক। 'সেদিন...'

স্ত্রীর দিকে বাঁকা করে চেয়ে হাসল জহিরুল হক। মাথা নাড়ল।

'অত সহজে পার পাবে না।' বলেই রানার দিকে ফিরল শিল্পপতি। 'বিষয়বস্তুটা আমার ইংরেজি উচ্চারণ নয়, রানা, তোমার অতর্কিত আবির্ভাব। স্বীকার করে ফেলো। রাবেয়াই ধরে নিয়ে এসেছে তোমাকে, তাই না? ভাগ্যি ভাল, পুলিসে খবর না দিয়ে বুদ্ধি করে তোমার কাছে গিয়েছিল। তুমি এসেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'আমিও।' তোতাপাখির মত বলে উঠল রানার হাঁটুর উপর বসা মিমি।

ওর কথাটা লক্ষ না করে বলে চলল জহিরুল হক, 'বিপদ হোক বা না হোক, হতে পারে মনে করে কোন বন্ধুকে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখলে মনটা মস্ত বড় হয়ে যায়। নিজেকে বেশ ইম্পরট্যান্ট মনে হয়। হ্যাঁ, আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যদি বলো তুমিও রাবেয়ার মত ব্যাপারটাকে অনর্থক গুরুত্ব দিচ্ছ, তাহলে কিন্তু সত্যিই চটে যাব। পাগলামিরও একটা সীমা থাকে। কি মনে করেছে এই লোকটা আমাকে? ননীর পুতুল?'

'এসবকে গুরুত্ব না দেয়াই ভাল,' বলল রানা। 'কিন্তু এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, লোকটা ঠাট্টা বা মস্করা যাই করে থাক, মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে। ভাল কথা, সকালে মাকড়সার সাথে যে চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল, ওটা কোথায়?'

'আছে। দেখবে?' উঠে দাঁড়াল জহিরুল হক। 'ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। মাকড়সাটাও রেখেছি একটা খামে পুরে।' ডেস্কের দিকে এগোল জহিরুল হক।

তুলতুলে নরম হাতে রানার থুতনি ধরে মনোযোগ আকর্ষণ করল মিমি। হাতে লজেন্সের চটচটে আঠা। একটা লজেন্স তুলে ধরল রানার চোখের সামনে।

'এটাকে ন্যাংটো করে দাও না, চাচা?'

অবাক হয়ে লজেন্সটার দিকে চাইল রানা, তারপর বুঝতে পারল। হেসে উঠল।

'ওহ্-হো! কাপড়টা খোলা য়াচ্ছে না বুঝি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! দাও, খুলে দিচ্ছি।' লজেন্সের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে কাকে, মিমি? আব্বাকে, না আম্মাকে?'

'আব্বাকে, আর আম্মাকে।' একটু ভেবে বলল, 'আর তোমাকে।'

'বেশি কাকে? আব্বা ভাল, না আম্মা?'

'সবাই ভাল্লু।'

হেসে উঠল রাবেয়া হক। 'ওই পাজির পেট থেকে কথা বের করতে পারবে মনে করেছ? সবার মন রাখা কথা শিখে গেছে। জিগেস করে দেখো না, কার পাশে শুয়ে রোজ বিছানা ভাসায়?'

'আব্বা।' জিজ্ঞেস করবার আগেই উত্তর এসে গেল।

'আর কে মারে?'

'আম্মা। আম্মা পচা।'

এমনি সময়ে জহিরুল হকের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আরে! গেল কোথায় ওগুলো? ড্রয়ারেই তো রেখেছিলাম! তুমি সরিয়েছ এখান থেকে, রাবেয়া?'

'না তো!' বলেই উঠে দাঁড়াল রাবেয়া হক। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে। চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'আমি ছুঁইওনি ওগুলো। দেখি, সর তো, ভাল করে খুঁজে দেখি।'

কিন্তু পাওয়া গেল না তন্ন তন্ন করে খুঁজেও।

ঘরের পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠল। ফিরে এসে সোফায় বসেছে জহিরুল হক, রাবেয়া হক আবার শুরু থেকে খুঁজতে যাচ্ছিল, বারণ করল সে।

'আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই, রাবেয়া। আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম ড্রয়ারটাতেই রেখেছিলাম।' কথাটা হালকা গলায় বলবার চেষ্টা করল জহিরুল হক, কিন্তু রানা বুঝতে পারল হঠাৎ বেশ খানিকটা দমে গেছে সে।

'নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছিল এ বাড়িতে!' চাপা গলায় বলল রাবেয়া।

'এবং বলতে চাও প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে ওগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে?' হাসির চেষ্টা করল জহিরুল হক, কিন্তু প্রাণবন্ত হলো না হাসিটা। 'তোমার কি মনে হচ্ছে, রানা?'

'রহমানের উপর নির্ভর করা যায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একশো বার! ওকে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই। দশ বছর ধরে...'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। নির্ভর করা যায় কিনা দায়িত্ব দিয়ে?'

'তা যায়। কেন? কি ভাবছ তুমি?'

'আমি কিছু ভাবছি না। তথ্য জেনে নিলাম একটা। ভাবনা-চিন্তা আপনিই করুন। এইবেলা পুলিসে একটা খবর দিলে কেমন হয়?'

খানিক ভেবে মন স্থির করে ফেলল জহিরুল হক! মাথা নাড়ল।

'নাহ্। দুটো উড়ো চিঠি আর একটা মরা মাকড়সার জন্যে পুলিস ডাকা যায় না। খবরটা লিক আউট হবে। এই ধরনের পাবলিসিটি হলে...অসম্ভব!'

'এখনও জেদ করছ তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রাবেয়া হক। 'প্রথম দিনই তোমার জানানো উচিত ছিল পুলিসকে। কত বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পারছ না এখনও? বাজে হুমকি নয়, হাজার বার করে...'

'উত্তেজিত হবেন না, ভাবী,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'জহির ভাইয়ের কথাটা নেহাত অযৌক্তিক নয়। প্রোভোকেশনের নমুনা দেখে মনে হচ্ছে ওরা মনেপ্রাণে চাইছে উনি পুলিসকে ডাকুন এবং ব্যাপারটা ফলাও করে প্রচারিত হোক। ঠাণ্ডা মাথায় আর একবার ভেবে দেখা যাক। জহির ভাই একা নেই। আমি আছি, প্রয়োজন হলে রহমানকেও ডেকে আনা যাবে। আমরা তিন জন রয়েছি ঘরের মধ্যে। বাইরে গিলটি মিঞা রয়েছে পাহারায়, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সাবধান করে দেবে আমাদের প্যাঁচার ডাক ডেকে। কাজেই আমাদের ভয় কি? পুলিসে খবর দিলে থানা থেকে একজন বা দুজন সেপাই

এসে কি এমন...'

থেমে গেল রানা। ঢং ঢং করে বেজে উঠল দেয়াল ঘড়িটা।

রাত ন'টা।

চাপা একটা আতঙ্ক নেমে এসেছে যেন ঘরটায়। পরস্পরের চোখের দিকে চাইল ওরা। উৎকণ্ঠিত।

সোফার এক পাশে কার্পেটের উপর বসে মিমি বিভোর হয়ে আদর করছে ওর প্লাস্টিকের মেয়েটাকে। কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন! কান্না থামিয়ে বাচ্চাটাকে কোলের উপর শুইয়ে দিয়ে এক পা নাচিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে এখন।

'ন'টার সময় টাকা নিতে আসার কথা!' ফিস ফিস করে বলল রাবেয়া হক।

'কোন ভয় নেই, রাবেয়া।' স্ত্রীর কাঁধের উপর একটা হাত রাখল জহিরুল হক। 'নিশ্চিন্ত থাকো, কেউ আসবে না টাকা...'

কথাটা শেষ করবার আগেই তীক্ষ্ণ সুরে বেজে উঠল কলিংবেল।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল তিনজনই। ফুঁপিয়ে উঠল রাবেয়া। অস্ফুট গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল কান্নার ভঙ্গিতে। স্থির দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চেয়ে রয়েছে জহিরুল হক।

রহমানের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খোলার আওয়াজ এল। নিচু গলায় কি যেন কথা বলল, তারপর এ ঘরে এসে ঢুকল রহমান।

'করিমের আহনের কথা আছিল নি, স্যার?'

'কোন্ করিম? আমাদের পিওন?' অবাক হয়ে বলল জহিরুল হক।

'হ, স্যার। একখান্ প্যাকেট নিকি পৌছায়া দেওনের কতা কুনহানে? আইছে নিতাম বইলা।'

এগোতে যাচ্ছিল জহিরুল হক, খামচে ধরল ওকে রাবেয়া।

সবাইকে উঠে দাঁড়াতে দেখে পুতুল কোলে উঠে দাঁড়াল মিমিও। অবাক হয়ে দেখছে সবার মুখ।

'আপনি ভাবীর সাথে থাকুন, আমি দেখছি,' বলেই কাউকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে এগিয়ে গেল রানা। পিছনে চলল রহমান। নিচু গলায় রহমানকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'পিওনটাকে চেনো তুমি? তোমার সাহেবের অফিসের?'

'হ, স্যার।'

দরজার কাছে উজ্জ্বল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদা ইউনিফরম পরা পিওন। কোমরে বেল্টের বাক্‌লে কোম্পানীর পিতলের মনোগ্রাম আঁটা, বাম বগলের নিচে পিওন-বুক। অল্প বয়সী সপ্রতিভ চেহারা।

'এখান থেকে প্যাকেট নিয়ে যেতে কে বলেছে তোমাকে?'

'পারচেজ আসিস্টান মোক্তার সাব কইছে, হাজুর। বড়া সাবের মাকান থেকে একটো পাকিট যাবো সিরাজ হোটেলে। পিওন-বুকে দাসখত লিয়ে

ডেলিভ্রি হোব।'

এক নিমেষে বুঝে নিল রানা, আসল ব্যাপারের কিছুই জানে না এই লোক। খোঁজ করলে হয়তো জানা যাবে সেই মোক্তার সাহেবও জানে না কিছুই, টেলিফোনে আদেশ পেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে করিমকে। সেই আদেশকারীর কাছে খোঁজ নিলে জানা যাবে, সে ফোন করেনি। অর্থাৎ এই লাইনে কোন হদিস পাওয়া যাবে না।

'সিরাজ হোটেলে কার কাছে ডেলিভারি দিতে হবে প্যাকেটটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মোহাম্মদ আলাউদ্দিন সাবের কাছে।' বলেই পিওন-বুক খুলে দেখে নিল নামটা আবার। বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাকে চিনবে কি করে?'

'রিসিপশান মোদে পুছ করলেই জানা যাবো।' এত প্রশ্নে একটু ভড়কে গেল পিওনটা। 'কাছু গোলমাল হইছে, হাজুর?'

'না, না। তুমি এখানে দাঁড়াও একটু, প্যাকেটটা নিয়ে আসছি আমি।' রহমানের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এসো আমার সাথে।'

রানার এই উদ্ভট ব্যবহারে কেমন একটু ঘাবড়ে গেছে রহমানও। রানার পিছন পিছন রান্নাঘরের পাশের স্টোররুমে এসে হাজির হলো, রানার ইঙ্গিতে বন্ধ করে দিল দরজা।

'গোটা কয়েক খবরের কাগজ ভাঁজ করে একটা প্যাকেট বানাও তো, রহমান। ঝটপট।' তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে মাপ দেখাল। 'এতটা হলেই হবে। একটা বইয়ের মত। মোটা কোন কাগজ দিয়ে মুড়ে দিতে হবে প্যাকেটটা।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল রহমানের চোখ, কিন্তু একটি প্রশ্ন না করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে প্যাকেট তৈরিতে। সুন্দর একটা প্যাকেট তৈরি করে লাল-সাদা সুতো দিয়ে বেঁধে দিল।

'ভেরি গুড।' ওর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে চলে এল রানা দরজার কাছে অপেক্ষমাণ করিমের কাছে।

'শোনো। দশটার আগে আলাউদ্দিন সাহেবকে পাবে না সিরাজ হোটেলে। কিসে করে এসেছ?'

'সাইকিল, হাজুর,' বলল পিওন।

'সোয়া দশটা নাগাদ যাবে তুমি ওই হোটেলে, প্যাকেটটা ডেলিভারি দিয়ে সোজা চলে আসবে এখানে। কেমন?'

'বহুত আচ্ছা, হাজুর।'

হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল করিম। সেই সাথে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল রানা ওর হাতে।

'খানাপিনা হয়নি মনে হচ্ছে? এটা দিয়ে কিছু খেয়ে নাও কোন হোটেলে।'

টাকা পেয়ে একগাল হাসল করিম, মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে বলল,

'বহুত আচ্ছা, হাজুর।'

দরজা লাগিয়ে ফিরে এল রানা প্রকাণ্ড বৈঠকখানায়। ডিভানের উপর পাশাপাশি বসে আছে স্বামী-স্ত্রী। একটা সোফায় কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে গেছে মিমি জুতো-মোজা পরা অবস্থাতেই, আঁকড়ে ধরে আছে পুতুলটাকে বুকের কাছে। রাবেয়া হকের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকটা সামলে নিয়েছে, কিন্তু বাম হাতে শক্ত করে ধরে আছে স্বামীর একটা হাত।

'এতক্ষণে ব্যাপারটাকে একটু গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে, জহির ভাই,' বলল রানা। 'আপনার টাকার অপেক্ষায় সিরাজ হোটেলে বসে আছে মাকড়সা বাবাজি মোহাম্মদ আলাউদ্দির নাম নিয়ে। কার হুকুমে পিওন করিম এল সেসব দেখা যাবে কাল, আমি একটা বাজে কাগজের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছি ওর হাতে। সোয়া দশটার দিকে ওটা ডেলিভারি দিতে যাবে ওখানে করিম। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা পুলিসকে জানাতেই হচ্ছে। একে একটু শায়েস্তা করে না দিলে আরও অনেককে জ্বালাতন করবে। আমি ডি.আই.জি. আখতারুজ্জামানকে জানিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা, যা করবার ও-ই করবে। আর হ্যাঁ, পাবলিসিটি যেন না হয় সে অনুরোধও করব।'

নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জহিরুল হক।

'ঠিক আছে। যা ভাল বোঝো করো।'

রিসিভারটা কানে তুলে নিল রানা, দুই সেকেন্ড কানে চেপে রেখে ভুরু কুঁচকাল, বার কয়েক টোকা দিল ক্রেডলে, শুনল, তারপর নামিয়ে রেখে দিল রিসিভার।

ব্যাপারটা টের পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠেছে রানার বুকের ভিতরটা। হালকা ভাবে নিয়েছিল সে এসব এই অল্প কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত।

'ক্রমেই আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে, জহির ভাই,' বলল রানা। 'টেলিফোনটা ডেড।'

'কেন? এই খানিক আগেও তো...' বলতে বলতে থেমে গেল জহিরুল হক।

'তার কেটে দিয়েছে কেউ!' ককিয়ে উঠল রাবেয়া। উঠে দাঁড়াল দিশেহারার মত।

পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে রানার হোলস্টার থেকে। এগিয়ে দিল জহিরুল হকের দিকে।

'এটা ধরুন।'

'ওটা তোমার কাছেই রাখো, রানা। আমার কাছে একটা।' প্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা নাকবোঁচা থ্রী-টু ক্যালিবারের রিভলভার বের করল জহিরুল হক।

'কাছে কোথাও টেলিফোন আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আধ মাইল দূরে আছে। গুলশান থানায়।' জবাব দিল জহিরুল হক। 'তুমি যাবে, না রহমানকে পাঠাব?'

তিন সেকেন্ড ভাবল রানা। তারপর বলল, 'তাড়াহুড়োর কিছুই নেই।

আপনি আমি দু'জনেই ভুল করেছি ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে। এবার দেখতে হবে আর কোন ভুল যেন না করে বসি।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল রাবেয়া হক।

'এটা যে সত্যিকারের বিপদ, বুঝতে পারছ এবার?'

'স্পষ্ট করে বোঝার মত কিছুই এখনও ঘটেনি, ভাবী। টেলিফোনটা নিজে নিজেই ডেড হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এখন থেকে আমাদের ধরে নিতে হবে চিঠিতে যে হুমকি দেয়া হয়েছে সেটা কার্যকরী করবার চেষ্টা করবে ব্ল্যাক স্পাইডার। একে সিরাজ হোটেলে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না আমার। পথেই সংগ্রহ করবে সে প্যাকেটটা। কথাটা আগে মাথায় আসেনি আমার। এখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে, ভয় পেলে কোন লাভ হবে না, মোকাবিলা করতে হবে সাহসের সাথে। কোন ভাবে আমাদের শক্তি কমালে চলবে না এখন। লোকটা কি চায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না বলে ওর মতিগতির ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে আমাদের। এই এলাকাটা নির্জন, আশেপাশে কোন বাড়িঘর নেই, রাস্তাতেও আলো নেই। লোকটা কতখানি সিরিয়াস জানা নেই আমাদের। যদি সত্যিই সিরিয়াস হয় তাহলে আমরা কেউ রওনা হলেও থানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারব, এমন সম্ভাবনা কম। কাজেই লোকবল কমানো চলবে না এখন। করিমের কাছ থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়ার পর কি করবে লোকটা?' যেন আপন মনে কথা বলছে, এমনি ভাবে বলে চলল রানা। 'খুলে দেখবে ভেতরে খবরের কাগজ ঠাসা। তখন? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে যাবে, না তেড়ে আসবে এখানে নিজের হুমকিটা কাজে পরিণত করতে?'

একটা সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে প্যাকেটটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল জহিরুল হক।

'টেলিফোনের লাইন কাটার কষ্ট স্বীকার করত না ও বাড়ি ফিরে যাওয়ার মতলব থাকলে,' বলল সে।

'ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কাজেই তৈরি হয়ে যেতে হবে আমাদের।' রাবেয়া হকের দিকে ফিরল সে। 'অত ঘাবড়াবার কিছুই নেই, ভাবী। টেক ইট ইজি।' হাসল। 'তিন তিনজন পালোয়ান রয়েছি বাড়িতে, বাইরে রয়েছে একজন।'

হাসির চেষ্টা করে বিফল হলো রাবেয়া হক। শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

'মিমির আয়াটা কোথায়? ঘুমিয়ে পড়েছে, ওকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে হত না?'

'আয়াটা ছুটি নিয়েছে দু'দিনের। আমি যাচ্ছি।'

'তাহলে থাক যেখানে আছে সেখানেই। রহমানকে ডাকুন। ওকে সব জানিয়ে রাখা ভাল। গিলটি মিঞাকেও সব বলতে পারলে ভাল হত, কিন্তু এখন ওর কাছে গেলে ওর পজিশনটা জানা হয়ে যাবে শত্রুপক্ষের। গা ঢাকা দিয়ে ঘুরছে ও বাড়ির চারপাশে। অবশ্য ওর জন্যে ভাবনা নেই, ঠিক সময় মত ঠিক কাজটাই করবে ও। রহমানকে জানিয়ে রাখা যাক।'

বেল টিপতেই শান্ত পদক্ষেপে ঘরে এসে ঢুকল রহমান। অল্প কথায় সব কিছু বুঝিয়ে দিল ওকে জহিরুল হক। শান্তভাবেই গ্রহণ করল সে ব্যাপারটা। সব শুনে বলল, 'আইয়ুক না হ্যাভারা কতজন আইব। আমগোর তিনজনেরে কাহিল করন সহজ অইব না। আমনে কইলে লাঠিটা লইয়া থানাথন ফুলিশ ভাইক্যা আনতাম ফারি।'

'তার দরকার নেই,' বলল রানা। 'একসাথে থাকব আমরা। প্রথম কাজ হচ্ছে বাড়িটা ভাল করে সার্চ করে দেখা। কারও পক্ষে ঢোকা সম্ভব কিনা, কিংবা কেউ আগে থেকে ঢুকে বসে আছে কিনা দেখতে হবে। তুমি এখানেই থাকো, আমি ঘুরে দেখে আসছি।'

'আমিও যাই তোমার সাথে।' উঠে দাঁড়াতে গেল জহিরুল হক।

'না।' দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'আপনি বসে থাকুন এখানে ভাবীর সাথে। আর রহমান, তুমিও থাকো এখানেই। এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের আড়াল করবে না জহির ভাইকে।'

'আইচ্চা, স্যার।'

কাঁধ শ্রাগ করল জহিরুল হক।

'ঠিক আছে। আজকে তোমার দিন, রানা। তুমি যা বলবে তাই হবে। কিন্তু কাল সকালে আমার টিটকারির ঠেলা সামলাতে জান বেরিয়ে যাবে তোমার, সেটা আগে থেকেই বলে রাখছি।'

দরজার কোণ থেকে কাঠের মোটা হুঁড়কোটা তুলে নিয়েছে রহমান। ওটা কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের মত দাঁড়াল দরজা জুড়ে।

'আমার লগে বুজাফরা না কইরা এইহানদা ঢোহন নাই।'

'ঠিক বলেছ।' হাসল রানা। 'দরজাটা বন্ধ করে দাও। বেশিক্ষণ লাগবে না আমার। ঢোকার আগে তোমার নাম ধরে ডাক দিয়ে ঢুকব।'

হলঘরে বেরিয়ে এল রানা ড্রইংরুমের দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে। কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল কোথাও কোন আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। খুব আবছা ভাবে শোনা গেল দোতলার একটা ঘড়ির টিক টিক শব্দ, ডাইনিং রুমে রেফ্রিজারেটারের মৃদু গুঞ্জন। আর কোন আওয়াজ নেই। নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা দোতলায়।

দোতলায় মোট পাঁচটা ঘর। প্রত্যেকটা ঘর ভাল মত পরীক্ষা করে এক এক করে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। পুব ও দক্ষিণের ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজায় বল্টু লাগিয়ে দিল। বাথরুম তিনটেও দেখতে ভুল করল না। কেউ নেই। রানা যে কাউকে আশা করেছিল তা নয়, তবু আর একটু নিশ্চিন্ত হওয়া। এবার নিচ তলাটা দেখে নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে আক্রমণের। কেমন একটা অস্বস্তিতে ছেয়ে গেছে ওর মনটা। উইন্ডমিলের সাথে যুদ্ধ করছে ওরা? এত সাবধান হওয়ার সত্যিই কি কোন দরকার ছিল? নাকি রাবেয়া হকের ভয়টা সংক্রমিত হয়েছে ওর মধ্যে?

সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিল রানা, ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ দপ করে নিভে গেল সব বাতি। ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। তিন সেকেন্ড সে

দাঁড়িয়ে রইল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। কেমন যেন দম বন্ধ করা অন্ধকার। সাথে টর্চ আনেনি বলে নিজেকে গাল দিল। পকেট থেকে গ্যাস লাইটারটা বের করে জ্বালল। ফ্রেমটা দ্বিগুণ করে দিয়ে লাইটারের মৃদু নীলচে আলোয় পথ দেখে পৌঁছে গেল রানা সিঁড়ির মাথায়।

একহাতে লাইটার, অপর হাতে রেলিং ধরে দ্রুত পায়ে সিঁড়ির অর্ধেকটা নামতেই শুনতে পেল রানা প্যাঁচার ডাক। পাঁচ সেকেন্ড পর শোনা গেল রাবেয়া হকের অন্ধকার চেরা আতঙ্কিত তীক্ষ্ণ চিৎকার।

ড্রইংরুমের জানালার দশ ফুট দূরে বাগানের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল আলিবাবা রাত আটটা থেকে। সিকি মাইল দূরে রাস্তার পাশের একটা ইলেকট্রিক পোস্টের কাছে একখানা লম্বা ইনসুলেটেড পোল হাতে অপেক্ষা করছে মোস্তাক–দুটো তার স্পর্শ করলেই নিভে যাবে এদিকের সব বাতি।

বাইরে বেশ বাতাস আছে, কিন্তু তবু দরদর করে ঘামছিল আলিবাবা। সময় যেন কাটতেই চায় না। ডান হাতে ধরা আছে আরতি লাহিড়ীর দেয়া সেই ছুরিটা, বাম হাতে জবজবে ঘামে ভেজা রুমাল। জানালার দিকে চেয়ে বসে ছিল সে, আর চেষ্টা করছিল নিজের হৃৎকম্পনকে শাসন করতে। হঠাৎ ভারী কার্টেনের ওপাশে মৃদু আলোটা নিভে গেল। ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভিতর। সময় উপস্থিত।

উঠে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে খুলে ফেলল জানালার ছিটকিনি। এবার নেটের জানালা। হুকটা ভেঙে দিয়ে গেছে সে আজ দুপুরে, কাজেই কোন অসুবিধে হলো না, নিচে আঙুল ভরে উপর দিকে চাপ দিতেই নিঃশব্দে উঠে গেল সেটা উপরে। এবার কাঁচের জানালা। ছিটকিনি লাগাবার গর্তে পুটিন ভরে দিয়ে গেছে সে, টান দিতেই দুপাট হাঁ হয়ে খুলে গেল। দ্রুতপায়ে ফিরে এসে পনেরো ফুট দূরে একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের আড়ালে দাঁড়াল সে জানালার দিকে মুখ করে।

বাতাসে দুলছে জানালার পর্দা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, সেকেন্ডের মধ্যেই দু'ফাঁক হয়ে সরে গেল ভারী কার্টেন।

লম্বা একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে জানালার সামনে। মেঘে ঢাকা চাঁদের মত আবছা আলোতে চকচক করে উঠল চশমার কাঁচ। মোস্তাক ঠিক যেমন বলেছিল তেমনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজছে লোকটা, হাতে রিভলভার। হঠাৎ প্যাচা ডেকে উঠল কাছেই কোথাও।

ডানহাতটা উঁচু করল আলিবাবা, পরমুহূর্তে সাঁৎ করে ছুটে গেল ছুরিটা জানালার দিকে। এত সহজ টার্গেটের দিকে জীবনে কখনও ছুরি মারেনি সে আগে।

ঘ্যাঁচ করে ঠিক জায়গা মত ঢুকে গেল ছুরিটা, বাঁটটা গিয়ে ঠেকল বুকের হাড়ে–সেই শব্দটাও শুনতে পেল আলিবাবা। এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, বিচিত্র একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরোল লোকটার মুখ দিয়ে। ঘুরেই দৌড় দিল আলিবাবা উঁচু দেয়ালের দিকে। দেয়াল পেরিয়ে একশো গজ গেলেই পৌঁছে

যাবে গাড়ির কাছে।

একটা তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের চিৎকার কানে গেল ওর।

পাঁচ

'মাসুদ ভাই, আপনি!' অবাক হয়ে গেল মাহবুব। 'আপনি থাকতে ঘটে গেল ব্যাপারটা?'

কিছুদিন আগে গুলশান থানার ও.সি. হয়েছে মাহবুব, শুনেছিল রানা কার কাছে। সামনের সোফায় বসতে ইঙ্গিত করল।

'বসো, মাহবুব। হ্যাঁ। আমি থাকতেও ঘটল। ঠেকাতে পারলাম না।' মিমির দিকে চাইল রানা। এত কাণ্ড কিছুই টের পায়নি মেয়েটা। এখনও বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সোফার উপর পুতুলটাকে বুকে জড়িয়ে। বেকায়দা ভঙ্গিতে কাত হয়ে থাকায় হালকা ভাবে নাক ডাকছে। ঘুম থেকে উঠেই যখন আব্বাকে খুঁজবে তখন কি জবাব দেবে ভাবতেই কেঁপে উঠল রানার বুকের ভিতরটা।

আগাগোড়া সব ব্যাপার বলে গেল রানা, নোট করে নিল মাহবুব। গিলটি মিঞার প্রসঙ্গ আসতেই জিজ্ঞেস করল ওকে দেখা যাচ্ছে না কেন।

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, মাহবুর। আশেপাশে কোথাও নেই। আমার মনে হয় খুনীকে দেখতে পেয়ে তার পিছু নিয়েছে গিলটি মিঞা।' একটু ভেবে বলল, 'আমার বোধহয় এখন বাসায় ফিরে যাওয়া দরকার। ও হয়তো আমাকে কনট্যাক্ট করবার চেষ্টা করবে।'

'ঠিক আছে, আপনাকে আর বেশি দেরি করাব না, মাসুদ ভাই। আর একটা প্রশ্ন, হত্যাকারীকে দেখতে পেয়েছিলেন আপনি?'

'না। জহির ভাইয়ের এখানে রহমানকে রেখে আমি গিয়েছিলাম বাড়িটা সার্চ করে দেখতে। লাইট যখন নিভল আমি তখন দোতলায়। সিঁড়ির মাঝামাঝি আসতেই ভাবীর চিৎকার শুনতে পেলাম। হুড়মুড় করে নেমে এলাম। রহমানকে বলেছিলাম, ড্রইংরুমে ঢোকার আগে আমি ওর নাম ধরে ডাক দেব। কিন্তু তাড়াহুড়োর সময় ভুলে গিয়েছিলাম ওকে ডাকতে। ঘরে ঢুকতেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও আমার ওপর। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি, মারামারির পর যখন বুঝতে পারলাম যে ও রহমান তখন কথা বলে উঠলাম আমি। হারিকেন, ল্যাম্প বা টর্চ নিয়ে আসতে বললাম ওকে। দৌড়ে গিয়ে আন্ধকারের মধ্যে কোনমতে হাতড়ে একটা টর্চ নিয়ে এল ও। সেই আলোয় দেখলাম খোলা জানালার ধারে মেঝেতে পড়ে আছে জহির ভাই, ডিভানের উপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে ভাবী। এমনি সময় হাজির হলো টহল পুলিসের গাড়ি। বাকিটা তুমি তো জানোই।'

ঘরে ঢুকল রহমান। কপালের একপাশ ফুলে আছে উঁচু হয়ে, একটা চোখ ফুলে গেছে, চোয়ালের খানিকটা ছড়ে গেছে, থুতনিতে জখম।

'কিছু মনে কোরো না, রহমান,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার দোষ।'

'আমনের কুনো দুষ নাই, স্যার। মাইর খাইছি নিজের দুষে। আমার বুজা উচিত আছিল্।' গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল রহমান চোখ মুছে মাহবুবের দিকে ফিরে বলল, 'আমারে ডাকছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ। মাসুদ রানা সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কি কি ঘটল বল তো?'

গুছিয়ে কথা বলবার সাধ্য নেই এখন রহমানের। যা বলল, সেটা সাজালে দাঁড়ায় : মিমিকে সোজা করে শুইয়ে দেয়ার জন্যে ডিভান ছেড়ে উঠেছিল জহিরুল হক, এমনি সময় লাইট অফ হয়ে গেল। জানালার কাছে সামান্য খড়মড় আওয়াজ হতেই কে ওখানে বলে এগিয়ে গেল জহিরুল হক। রাবেয়া হক বলল, জানালাটা খোলা মনে হচ্ছে, যেও না ওদিকে। কিন্তু তার আগেই পর্দা সরিয়ে খোলা জানালা দিয়ে মুখ বের করল জহিরুল হক। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায়নি রহমান, হঠাৎ প্রায়-অস্ফুট একটা গোঙানি শুনতে পেল, ধড়াস করে পড়ে গেল জহিরুল হক মেঝের উপর, চিৎকার করে উঠল রাবেয়া হক, পাঁচ সেকেন্ড যেতে না যেতে দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল রানা। তার এক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল টহল পুলিস।

'ওরা কি চিৎকার শুনতে পেয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছল কি করে?'

'রাস্তা দিয়ে একটা পিওনকে পাগলের মত দৌড়াতে দেখে গাড়ি থামিয়েছিল ওরা। এখান থেকে বেরিয়ে সিকি মাইলও যায়নি, এমন সময় একজন ভয়ঙ্করদর্শন লোক নাকি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর উপর। ডাণ্ডা চালিয়েছিল, কিন্তু মাথা সরিয়ে নেয়ায় পিঠের উপর পড়েছিল বাড়ি। সাইকেল ফেলে দৌড় দিয়েছিল প্রাণপণে, ধরতে পারেনি ওকে। ওর গল্প বিশ্বাস হয়নি বলে ওকে ধরে আনা হয়েছিল এই বাড়িতে। কয়েক মিনিট আগে এলে হয়তো...'

উঠে দাঁড়াল রানা।

'আমার সেক্রেটারি সালমা কবিরকে খবর দেয়া হয়েছে তোমার লোক মারফত। খুব সম্ভব এসে পড়বে এখুনি। ওর হাতে মিসেস হকের ভার ছেড়ে দিতে পারো নিশ্চিন্তে। ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন আছে কিনা বুঝতে পারবে ও। আমি চলি। কোন খবর পেলে জানাব তোমাকে। থানাতেই থাকবে তো?'

'হ্যাঁ। কিছু একটা খবর পেলেই জানাবেন কিন্তু। নিজে ঝুঁকি নিতে যাবেন না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

বাসায় ফিরে জানা গেল আধঘণ্টা আগে ফোন এসেছিল গিলটি মিঞার। মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডে যেতে হবে এক্ষুণি। খুব জরুরী দরকার। ভোঁ করে বেরিয়ে গেল রানার করোনা মার্ক টু।

আসাদ গেট দিয়ে ঢুকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে বড় রাস্তার উপরই গাড়ি

ছেড়ে নেমে পড়ল রানা। একটা রুটি কিনবার পয়সার জন্যে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল একজন বিহারী বৃদ্ধা। ওর হাতে চার আনা পয়সা ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত এগোল রানা গলি পথে।

বেশ দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্ট, কোথাও ছায়া, কোথাও আলো। রাত এগারোটা। অসংখ্য কাচ্চাবাচ্চা ভর্তি রাস্তাগুলো এখন বেশ নির্জন। এখানে ওখানে গরু আর ঘেয়ো কুকুর শুয়ে আছে। বাঁয়ে মোড় নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে দেখতে পেল রানা গিলটি মিঞাকে। একটা বাড়ির পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে এল রানা।

'ওফ্, হক সাহেবের বাসায় ফোন করে করে একবারে হদ্দ হয়ে গেলাম। কেউ ধরে না।'

'কি খবর, গিলটি মিঞা? কি করছ এখানে?'

'চারদিকে নজর রেকেছিলুম, কি করে ঢুকল বুজতে পারচি না, এক শালা বাগানের মদ্যে বসে ছিল, বাতি নিবে যাওয়ার একটুকুন বাদেই উটে মারলে দৌড়। বোধায় আমরা পৌঁচবার আগে থেকেই বসে ছিল শালা ওইখানে। ওকে প্রথম দেকি একটা গাছের গায়ে ঢেলান দিয়ে ডেঁড়িয়ে আচে। প্যাঁচার ডাক ডেকে আপনাদের সাবদান করে দিয়েছিলাম, শুনতে পেয়েছিলেন, স্যার?'

'তোমার বাজে গাল গল্প রাখো তো, গিলটি মিঞা!' ধমক দিল রানা। 'এখানে কি করছ? এলেই বা কি করে?'

জমিয়ে গল্প বলবার সুযোগ হারিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ হলো গিলটি মিঞা। মুখটা কালো করে বলল, 'গাড়ির পেচনে করে।' টের পেল, এত সংক্ষেপ করা ঠিক হচ্ছে না, রেগে যেতে পারে রানা, তাই চট করে যোগ করল, 'অত তাড়াহুড়ো করচেন কেন, স্যার? ও শালা ভাগবে না। এক্ষুণি একটা মেয়েলোক ঢুকেছে ঐ বাড়িতে, তবেই না সরে এসে এইখানে ডেঁড়িয়েচি। নাহালে কোতায় খুঁজবেন আপনি আবার...'

'তোমার কথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না, গিলটি মিঞা। দয়া করে আর একটু পরিষ্কার করে বলবে?'

গিলটি মিঞা বুঝল রানা সত্যিই চটেছে। হাসল একগাল।

'শুদু শুদু রাগ করচেন, স্যার। অত ঘটনা কি ছোট করে বলা যায়? আর বললেই কি বোজা যায়?' মাথার পিছনটা চুলকে নিয়ে বলল, 'ঠিক আচে যতটা পারা যায় ছোট করে বলচি। আসুন আমার পিচু পিচু।' হাঁটতে শুরু করল গিলটি মিঞা একটা পা একটু টেনে টেনে। 'লোকটাকে দেয়াল টপকাতে দেকে আমিও টপকালাম। উহ্, সে প্রকাণ্ড দেয়াল-সাত-আট হাত হবে। দেয়ালের ওপরে আবার কাঁচের...'

'দেয়াল টপকে কি দেখলে?'

'দেকলুম দৌড়াচ্চে শালা। আম্মো ছুটলাম। ও-ও ছোটে, আমিও ছুটি। তীরের বেগে ছুটছে একটা গাড়ির দিকে। রাস্তায় একটাও বাত্তি নেই...'

'সেই গাড়ির পিছনে করে এখানে এসেছ? লাগেজ বুটে ঢুকে

পড়েছিলে?'

'হ্যাঁ। গাড়ি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। বহুকষ্টে উটে পড়েচি। কিন্তুক গাড়িতে করে এখানে আসিনি। সেকেন ক্যাপিট্যালের লেকের ধারে গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটা ধরলে শালা। শুদু হাঁটলে এক কতা ছিল, এ শালার আজব হাঁটা। পাঁচ কদম ফেলে আর চমকে চমকে চায় এইদিক উদিক। বহুকষ্টে ওর নজর বাঁচিয়ে, কখনও বসে, কখনও গাচের আড়ালে, বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে, ওর পিছু পিছু এসে পৌচলাম এখানে। ওই যে, স্যার। ওই সব-শেষের বাড়িটায় ঢুকে গেল ব্যাটা।'

গিলটি মিঞার আঙুল অনুসরণ করে দেখল রানা একটা দোতলা বাড়ি। অন্ধকার। দরজা দেখা যাচ্ছে একটা। রাস্তার দিকে মুখ করা সব ক'টা জানালা বন্ধ।

'এ বাড়ি থেকে বেরোবার আর কোন রাস্তা আছে?'

'না, স্যার। পরীক্ষা করে দেকেছি।' একগাল হেসে বলল, 'চিন্তা করবেন না, স্যার বাড়ি ছেড়ে পালায়নি। খানটেক আগে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে একটা সুন্দর মেয়েছেলে গিয়ে কড়া নাড়ল, দরজা খুলে দিল ওই লোকটা। ওদের দু'জনকেই পাবেন একোন ওই বাড়িতে।'

'ভেরি গুড,' বলল রানা। 'আমি এখন ঢুকব ওই বাড়িতে। তুমি চোখ কান খোলা রাখবে। যদি পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে না আসি, গুলশান থানায় ফোন করবে। আর ইতিমধ্যে যদি লোকটা বেরিয়ে আসে, ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করবে না। দূর থেকে অনুসরণ করবে। লোকটা ভয়ঙ্কর। জহির ভাইকে খুন করে এসেছে লোকটা একটু আগে।'

'অ্যাঁ!' আঁৎকে উঠল গিলটি মিঞা। 'হক সায়েব মারা গেচেন?'

'হ্যাঁ। কেমন করে মারা গেল বলব তোমাকে পরে। এখন সাবধানে দাঁড়িয়ে থাকো লুকিয়ে।'

রানার পাশাপাশি এগোল গিলটি মিঞাও। বাড়িটার একপাশে একটা একতলা ঘরের মাথায় টালির ছাত। খুব সম্ভব রান্নাঘর। এই ঘরের ছাতে উঠে লাফ দিলে দোতলার একটা খোলা জানালার চৌকাঠ ধরা যাবে। রানাকে প্রস্তুত হতে দেখে ওর বাহুতে একটা হাত রাখল গিলটি মিঞা।

'না।' গিলটি মিঞাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই উত্তর দিল রানা ওর প্রশ্নের। 'আমিই যাব। তোমাকে যা বলেছি তুমি তাই করবে। প্রয়োজন হলে তোমার মেশিনগানটা ব্যবহার করবে। বুঝেছ?'

রানাকে চেনে গিলটি মিঞা, তাই আর কোন কথা না বলে তৈরি হলো ঠেলা দেয়ার জন্যে। রানা লাফ দিয়ে দু'হাতে একটা টালি ধরতেই ওর পা ধরে উপর দিকে ঠেলা দিল সে। হালকা মানুষ, গায়ে জোর নেই, কিন্তু এই সাহায্যটুকু কাজে লাগল রানার। বিড়ালের মত নিঃশব্দে উঠে পড়ল সে টালির ছাতে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে এখন চুড়োর দিকে। পছন্দসই একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে ওর খেলনা পিস্তল হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়াল গিলটি মিঞা।

দেয়ালের গায়ে শরীরটা আছড়ে যেন বাড়ির কাউকে হুঁশিয়ার করে না দেয় সেজন্যে খানিকটা ঝুঁকি নেয়াই স্থির করল রানা। লাফিয়ে জানালার চৌকাঠ ধরে ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত, কিন্তু সেটা করতে গেলে শরীরের নিচের অংশটা ধড়াস করে পড়বে দেয়ালের গায়ে, টের পেয়ে যেতে পারে বাড়ির লোক। জোরে একটা লাফ দিয়ে চৌকাঠ ধরেই দুই হাতের চাপে জানালা টপকে একেবারে ঘরের ভিতর চলে এল সে। ঘরের মেঝেতে পা দেয়ার সাথে সাথেই পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে।

সদ্য চুনকাম করা ছোট্ট একটা খালি ঘর। নিঃশব্দে চলে এল রানা দরজার কাছে। কান পাতল দরজায়। নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা প্যাসেজে। বাড়িটা হোয়াইট ওয়াশ করা হচ্ছে। চুনের বালতি, বুরুশ, বাঁশ দিয়ে তৈরি ভারা, নীলের প্যাকেট আর নারকেলের রশি দেখতে পেল সে একপাশে। বাম দিকে নিচে নামার সিঁড়ি। নিচ থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পেল রানা। দোতলার তিনটে ঘর পরীক্ষা করল সে খুব দ্রুত। কেউ নেই।

কয়েক ধাপ নেমেই পরিষ্কার শুনতে পেল সে একটা পুরুষকণ্ঠ। নিচতলায়।

'এক্কেরে পানির ল্যাহান। জেনালায় আইয়া খারোইল, মাইরা দিলাম চাক্কু। তারবাদে দিলাম খিচ্চা লৌর।'

সিঁড়ির পাশের ঘরটায় কথা বলছে লোকটা। ঘরের দরজা একপাট খোলা, মৃদু আলো এসে পড়েছে সিঁড়ির গোড়ায়। নিঃশব্দ পায়ে নামছে রানা।

'তাহলে মারা গেছে জহিরুল হক?' মেয়েটার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পরিষ্কার, স্পষ্ট উচ্চারণ।

তিন-চার ধাপ বাকি থাকতেই দেখতে পেল রানা মেয়েটাকে। নীল একটা ক্যালিসিথের শাড়ি, লাল ব্লাউজ। চমৎকার দেখতে। একটা খটখটে কাঠের চেয়ারে বসে আছে সোজা হয়ে। কোলের উপর ভ্যানিটি ব্যাগ। বাম হাতের অনামিকায় ছোট্ট একটা লাল পাথর বসানো আংটি ঝিকঝিক করছে।

'আলবৎ!' বলল লোকটা। 'কি কন! কইলজার বিরতে হান্দায়া দিলাম চাক্কুটা, মরব না! খবর লোয়া দেহেন গা, অহন বেহেস্তে বোইয়া সরাবন তহুরা ডিরিং করতাছে। যাউগ্যা, আমার ট্যাকাটা দিয়া দেন, কাইটা পরি। মিছা কমু না, ডরাইছি। আইজই ভাগুম ঢাকা থেইকা।'

আরও দুই ধাপ নামতেই আলিবাবাকেও দেখতে পেল রানা। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে তেল, সাবান, টুথব্রাশ, ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস ভরছে।

'কিন্তু ও যে সত্যিই মরেছে তার কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

অবাক হয়ে আরতির মুখের দিকে চাইল আলিবাবা।

'পরমাণ! ইটা কি কন্? পরমাণ কিয়ের? বিস্সাস্ না অইলে দেইখা আহেন না গিয়া!'

'বাজে বকবেন না।' ধমক দিল আরতি। 'কাল সকালে খবরটা দেখব আমি কাগজে, তারপর দেব টাকা।'

চৌকির উপর রেখে ব্যাগ গুছাচ্ছিল আলিবাবা, এই কথায় ঘুরে দাঁড়াল। চোখ গরম করে চাইল আরতির চোখে। 'কি কইলেন? আবোর কন।'

'কাজ শেষ হলে টাকা দেয়ার নির্দেশ আছে আমার ওপর। যদি জহিরুল হক মারা গিয়ে থাকে তাহলে কাল পুরো টাকা বুঝে পাবেন আপনি।'

'অক্ষণ দিবা আমার ট্যাকা!' মেঝেতে পা ঠুকে গর্জন করে উঠল আলিবাবা। 'বিটলামির আর জাগা পাও নাই! গ্যারান্টি দেহাইবার আইছে! আমার লগে টালুটি-বালুটি চলব না কোলাম!'

'কাল সকাল আটটায় টাকা পাবেন আপনি।' উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল আরতি লাহিড়ী।

'খাবাদার!' গর্জে উঠল আলিবাবা। আরতি এবং ওর মাঝখানে চেয়ার ছিল একটা, এক লাথি মেরে সরিয়ে দিল চেয়ারটা। 'ওই সব বুজিউজি না। ট্যাকা দিয়া তারপর যাইবা। তোমার মথন বহুত খাপসুরাত মায়ালোক টাইট দিয়া ছাইড়া দিছি আমি। বাইর কর ট্যাকা!'

'ঠিক আছে।' ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল আরতি। হাতে বেরিয়ে এল একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ বেরেটা অটোমেটিক। যন্ত্রটা দেখামাত্র ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল আলিবাবা। পিস্তলটা সোজা ওর কপালের দিকে তাক করে ধরে বলল, 'টাকাটা মোস্তাকের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে কাল। এবং এই অসভ্যতারও জবাবদিহি করবে। এখন সরে যাও সামনে থেকে।'

আর কিছু শোনার জন্যে দাঁড়াল না রানা। যে পথে এসেছিল সেই পথে বেরিয়ে এল বাইরে। চকচকে চোখ নিয়ে এগিয়ে এল গিলটি মিঞা।

'মেয়েটা বেরিয়ে আসবে এখুনি,' বলল রানা। 'তুমি এখানেই পাহারায় থাকো, আমি পিছু নিচ্ছি মেয়েটার। লোকটা আজ আর বেরোবে বলে মনে হয় না। যদি বেরোয় লেগে থাকবে পিছনে।'

'ঠিক আছে, স্যার।' বলল গিলটি মিঞা। 'কিন্তুক এভাবে ছেড়ে দিচ্চি কেন? এখনই তো অ্যারেস করতে পারি আমরা ওদের?'

'না। এরা আসল লোক নয়। এদের পেছনে আরও লোক আছে। দেখতে হবে কোথায় যায় মেয়েটা।'

কথাটা বলতে না বলতেই বেরিয়ে এল মেয়েটা বাড়ি থেকে। হাঁটতে শুরু করল বড় রাস্তার দিকে। ক্ষিপ্র পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে মেয়েটা।

বেশ কিছুটা পিছনে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল রানা নিঃশব্দ পায়ে।

ছয়

ডি.আই.টি. এভিনিউ থেকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে উত্তর দিকে সেই রাস্তার এক ডাক্তারখানা থেকে ফোন করছে রানা গুলশান থানায়।

'কে, মাহবুব বলছ?...হ্যাঁ। গিলটি মিঞা খুনীকে ফলো করেছিল। তেপান্নর ডি, তাজমহল রোডে ঢুকেছে লোকটা। ওখানেই আছে। বাইরে

পাহারা দিচ্ছে গিলটি মিঞা। এর সাথে একটা মেয়ে আছে, আমি ওকে ফলো করে এসে অপেক্ষা করছি ডি.আই.টি. এভিনিউয়ের পানির ট্যাংক ছেড়ে কিছুদূর উত্তরে এসে, হাতের ডাইনে।'

'আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি, মাসুদ ভাই। আর একদল রওনা করে দিচ্ছি মোহাম্মদপুর। দশ মিনিটে পৌঁছে যাব। রাখলাম।'

ফিরে এসে একটা অন্ধকার বাড়ির আড়ালে দাঁড়াল রানা। গলিটার ওপাশে একটা জেনারেল স্টোর। এইখানেই ঢুকেছে মেয়েটা।

তাজমহল রোড থেকে বড় রাস্তায় পড়েই একটা বেবিট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হওয়ার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল রানা নিজের গাড়ির কাছে। কিন্তু অনুসরণ করা সহজ হয়নি। নিউ মার্কেটের দিকে রওনা হয়ে হঠাৎ বাঁয়ে গলিতে ঢুকে স্টাফ কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে এসে পড়ল বেবিট্যাক্সি গ্রীন রোডে। আবার বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলল রাজা বাজারের দিকে। পুল পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ হামিদুল হক চৌধুরীর প্রাক্তন বাড়ির পাশ দিয়ে ডান দিকের গলিতে ঢুকে গেল। রানার জানা আছে এ গলি মেহের ইন্ডাস্ট্রিজের পাশ দিয়ে গিয়ে এয়ারপোর্ট রোডে পড়েছে, কাজেই পিছু পিছু ধাওয়া না করে সোজা আনন্দ সিনেমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে ফার্মগেটের মোড় ঘুরে ফিরে এল গলিমুখের কাছে। গলিটার ভয়ানক এবড়োখেবড়ো রাস্তার কথাটা স্মরণ ছিল না বলে একটু বেশি আগে চলে এল রানা। ইন্টারকন পর্যন্ত বেবিট্যাক্সির আগে আগে এল রানা, তারপর সাঁই করে ঢুকে গেল হোটেলে। ওখানে গাড়িটা ছেড়ে একটা ট্যাক্সি নিল সে। বেবিট্যাক্সি তখন বেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু জোনাকী সিনেমার কাছে এসে নেমে পড়ল মেয়েটা, মসজিদের পাশ দিয়ে রওনা হলো নয়া পল্টনের দিকে পায়ে হেঁটে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে নানান গলিঘুঁচি পেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছেচে। অনেকখানি দূরত্ব বজায় রেখে অতি সাবধানে পিছু পিছু এসেছে রানা। জেনারেল স্টোরের উপরের ঘরে বাতি জ্বলে উঠতে দেখে বুঝতে পেরেছে ঠিক কোন্ ঘরে ঢুকেছে মেয়েটা। বাড়িটা চারপাশ থেকে ঘুরে দেখে নিয়েছে সে ইতোমধ্যেই। মিনিট দশেক পর বাতিটা নিভে যেতেই খবর দিয়েছে থানায়। কারণ রানা যে আশায় পিছু নিয়েছিল, সেটা পূরণ হবে না। দলের সন্ধান চাইছিল রানা, কিন্তু দল এখানে নেই। মেয়েটা একা।

জীপটা দূরে কোথাও রেখে পায়ে হেঁটে এল মাহবুব। সাথে জনা চারেক স্টেনগানধারী সেপাই।

সংক্ষেপে সব শুনে নিল আগে মাহবুব। তারপর বলল, 'আগে এটাকে ধরে নিই, তারপর ধরা যাবে খুনীকে। লোক পাঠিয়ে দিয়েছি আগেই, কিন্তু আমরা না পৌঁছোনো পর্যন্ত ওরা শুধু ঘিরে রাখবে বাড়িটা।'

দোকানের পিছনেই ভিতরে ঢোকার সাইড ডোর। জোরে কয়েকটা টোকা দিল মাহবুব। কোন সাড়া নেই। আরও বার কয়েক টোকা দেয়ার পর দরজা ভাঙার হুকুম দিল সে।

দু'জন সেপাই একসাথে ধাক্কা দিল কাঁধ দিয়ে। তৃতীয় ধাক্কায় হুড়মুড় করে দরজা খুলে আঙিনায় গিয়ে পড়ল ওরা। দু'জনকে বাইরে পাহারায় রেখে বাকি সবাই ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। সরু-সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে দু'জন সেপাই স্টেন হাতে, পিছনে চলেছে রানা ও মাহবুব।

কেউ নেই। দোতলার দুটো ঘর আর বাথরূম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না মেয়েটাকে। ছাতে এসে দেখা গেল সেখানেও কেউ নেই।

হঠাৎ পাশের একটা অসমাপ্ত বাড়ির ছাতে টর্চ ফেলেই বুঝতে পারল রানা ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই তৈরি ছিল মেয়েটা এরকম একটা অবস্থার জন্যে। পাশের বাড়ির ছাতের উপর অনর্থক পড়ে আছে একটা বাঁশের মই। এরই সাহায্যে পালিয়ে গেছে। মই দিয়ে পার হয়ে গেছে পাশের বাড়ির ছাতে, তারপর টেনে সরিয়ে নিয়েছে মই। কতক্ষণ আগে?

ছুটে নেমে এল ওরা। চারপাশটা খোঁজ করা হলো ভাল মত। পাওয়া গেল না মেয়েটাকে।

'মোহাম্মদপুরের লোকটাকে সাবধান করে দেবে মেয়েটা এবার!' বলল মাহবুব। 'নিশ্চয়ই টের পেয়ে গিয়েছিল ও যে আপনি অনুসরণ করছেন। ওই লোকটাকে ধরতে না পারলে সব ভেস্তে যাবে। চলুন, জলদি!'

দৌড়ে গিয়ে উঠল ওরা জীপে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে তুফান বেগে ছুটল জীপ।

'কিন্তু যাবে কোথায়?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মাহবুব। 'আপনি চেহারার বর্ণনাটা দিন, আমি শর্টহ্যান্ডে লিখে নিচ্ছি। ধরা ওকে পড়তেই হবে।'

বাড়িটা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে ছয়জন পুলিস। গিলটি মিঞাও রয়েছে ওদের সাথে। মাহবুবকে দেখে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল একজন সাব-ইন্সপেক্টর।

'কি খবর, মতিন?' জিজ্ঞেস করল মাহবুব।

'কেউ ঢোকেনি, স্যার, কেউ বেরোয়ওনি। ভেতর থেকেও কোনরকম সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত।'

'কিভাবে ধরবে? কিছু ভেবেছ? দরজাটা কেমন?'

'দরজায় ডবল বল্টু, তার ওপর কাঠের হুড়কো লাগানো।' উপর দিকে চাইল সে। 'আমার মনে হয় ওই জানালা দিয়ে ঢুকলে বিনা গোলমালে পাকড়ানো যাবে।'

'ঠিক আছে, রেডি, স্টেডি, গো! কিন্তু সাবধান! খুব হুঁশিয়ার! লোকটা ডেঞ্জারাস।'

হাসল মতিন। একজন সেপাইকে ডাকল হাতছানি দিয়ে।

'চলো, উলফত। তুমি আর আমি।'

প্রকাণ্ড চেহারা উলফতের। প্রথমে ঠেলে তুলে দিল মতিনকে টালির ছাতে, তারপর আছড়ে পাছড়ে উঠে পড়ল নিজেও। তরতর করে উঠে যাচ্ছে মতিন কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে।

হঠাৎ অন্ধকার জানালার ওপারে নড়াচড়া টের পেল রানা।

'মতিন সাহেব!' চিৎকার করে বলল রানা। 'সাবধান! দেখে ফেলেছে!'

মতিনও টের পেয়েছে। চট করে রিভলভারটা বের করল হোলস্টার থেকে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে।

জানালার কাছে আগুনের ঝলক দেখা গেল। সাথে সাথেই টাশ্‌শ্‌ করে আওয়াজ এল গুলির।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল মতিন টালির ছাতে। গড়িয়ে নেমে আসছে এখন। ধরে ফেলল উলফত, ধরতে গিয়ে নিজেও পা পিছলে নেমে এল কয়েক হাত।

দৌড়ে এগিয়ে গেল রানা ও মাহবুব একসাথে।

'ছেড়ে দাও, উলফত!' চিৎকার করে উঠল মাহবুব। 'ছেড়ে দাও; আমরা ধরছি। তুমিও নেমে এসো!'

আবার গর্জে উঠল পিস্তল। উলফতের পায়ের কয়েক ইঞ্চি দূরে টালির চল্‌টা তুলে চলে গেল গুলিটা। মতিনের হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুতবেগে নেমে এল উলফত বাকি কয়েক ফুট, তড়াক করে লাফিয়ে নামল নিচে। মতিনের এলানো শরীরটা নেমে এল গড়িয়ে, ধরে ফেলল রানা ও মাহবুব।

মাটিতে নামিয়েই টর্চ জ্বেলে সংক্ষিপ্ত ভাবে পরীক্ষা করল মাহবুব মতিনের জখম। গুলিটা গলা দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেছে ঘাড় ফুঁড়ে। পালস্‌ দেখেই মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল মাহবুব। দৌড়ে চলে গেল জীপের কাছে। অয়্যারলেস সেটে কয়েকটা কথা বলে ফিরে এল।

'আপনারা এবার আসুন, মাসুদ ভাই।'

'কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বুঝতেই পারছেন–' হাসির চেষ্টা করল মাহবুব, কিন্তু ওর কঠোর মুখে বিদঘুটে লাগল হাসিটা। 'এটা এখন পুলিস-ম্যাটার। আমার চোখের সামনে খুন হয়েছে আমার সহকর্মী। আপনার যতটা করার করেছেন, মাসুদ ভাই. এবার বাকিটুকু আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নামিয়ে আনব আমরা ওকে। তখন ওর চেহারাটা দেখার যোগ্য থাকবে না। কাল ঐকটু সুস্থ হয়ে উঠলে দেখে যাবেন একবার থানায় এসে।'

'আমার থাকায় অসুবিধে কি?'

'অনেক গোলাগুলি হবে এখন। পুলিসের কাজ পুলিস করবে। আপনার করবার কিছুই নেই। সোজা বাড়ি চলে যান, ফলাফলটা টেলিফোনে আপনাকে জানিয়ে দেব আমি।'

রানা বুঝল, খেপে গেছে মাহবুব। তর্ক করে লাভ নেই। গিলটি মিঞাকে নিয়ে এগোল সে বড় রাস্তার দিকে। একটা বেবিট্যাক্সিতে করে আসাদ গেটের কাছে আসতেই দেখতে পেল ওরা দুই লরী ভর্তি সশস্ত্র পুলিস। মৃদু হাসল রানা।

'কপালে দুঃখ আছে ব্যাটার।'

হ্যাঁ, স্যার। কিন্তুক এদিক কোতায় চললেন? আমাকে এগিয়ে দোয়ার দরকার নেই, আমি একোন তো বাসায় ফিরব না। আপনার বাসায় দাওয়াত আচে আজ, না গেলে রেগে যাবে বুড়ি মা।'

'ঠিক আছে। রাঙার মা দাওয়াত করেছে বুঝি? তাহলে তো জমবে আজ খাওয়াটা। চলো, ইন্টারকন থেকে গাড়িটা নিয়ে বাসায় যাব।'

খাওয়া ছেড়ে উঠতে হলো রানাকে। টেলিফোন এসেছে।

রিসিভারটা কয়েক সেকেন্ড কানে ধরেই চমকে উঠল রানা।

'কি বললে! পালিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে,' ভাঙা গলায় বলল মাহবুব। 'দরজা ভেঙে ঢুকে সারা বাড়ি খুঁজে কোথাও ওকে পাওয়া গেল না। শেষে ভাঁড়ার ঘরে একটা গর্ত পাওয়া গেল। টানেল। যুদ্ধের সময় তৈরি করেছিল বিহারীরা। দেড়শো গজ দূরে পার্কে গিয়ে বেরিয়েছে আরেক মুখ। ওই পথেই বেরিয়ে গেছে ও।'

'হায়, হায়!' নিরতিশয় হতাশ হলো রানা। 'এ তো বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হলো। দুটোর একটাও ধরা গেল না।'

ফোন ছেড়ে খাওয়ার টেবিলে ফিরে এল রানা। খানিকক্ষণ চুপচাপ খাওয়ার পর মুখ তুলল।

'মোস্তাক বলে কাউকে চেনো তুমি, গিলটি মিঞা?'

'কয়েকটা মোস্তাককে চিনি, স্যার। আপনি কোন্ মোস্তাকের কতা বলচেন?'

'এমন এক মোস্তাক, যাকে ওই খুনীটা ভয় পেতে পারে। টাকা নিতে যাবে কাল লোকটা এই মোস্তাকের কাছে।'

ছাতের দিকে চেয়ে চিন্তা করল গিলটি মিঞা। তারপর বলল, 'মনে তো পড়চে না। ভেবে দেকতে হবে। আর না চিনলেই বা কি? চিনে লিতে কতক্ষুণ?'

'কালকের মধ্যে চিনে বের করতে হবে তোমার এই মোস্তাককে।'

রাত সোয়া একটা।

নিশ্চিন্তে নাক ডাকছিল ব্যাম্বিনো হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক তায়জুল ইসলাম, কর্কশ কণ্ঠস্বরে ধড়মড়িয়ে উঠে সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। দেখল কটমট করে এক চোখে চেয়ে রয়েছে মোস্তাক ওর দিকে।

'চাবিটা দাও।' বলল মোস্তাক। 'জ্বালাতন!'

'জ্বী, স্যার? দিচ্ছি, স্যার।' তাড়াতাড়ি আংটা থেকে খুলে আটাশ নম্বর চাবিটা বাড়িয়ে দিল সে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল মোস্তাক। তেতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে এক সেকেন্ডের জন্যে থমকে গেল সে। নেমে আসছে একটা মেয়ে।

মুখের দিকে চাইতেই ফিক করে হাসল মেয়েটা। কুৎসিত দু'সারি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বড় বড়, পান খেয়ে কালো করে ফেলা। কপালে একটা বেঢপ সাইজের আব, বাম চোখের নিচে কালো একটা আঁচিল। সাদামাটা কাপড় পরনে। পেটের উচ্চতা দেখে বোঝা যায় তিন মাসের পোয়াতি। ঠোঁটে গালে রুজ-লিপস্টিক-পাউডারের আধিক্য দেখে এর পরিচয় টের পেতে

সময় লাগে না! বারবণিতা। আশ্চর্য বেহায়া একটা গায়েপড়া ভাব ঘেন্না ধরায়।

পাশ কাটিয়ে উঠে যাচ্ছিল মোস্তাক, কিন্তু চমকে উঠল প্রশ্ন শুনে।

'আলিবাবার কোন খবর পেয়েছেন?'

হোঁচট খেল মোস্তাক, সোজা হয়ে যখন চাইল মেয়েটার মুখের দিকে তখন নকল দাঁতগুলো খুলছে সে।

'মিস আরতি! এ কী অবস্থা? চিনতেই পারিনি আপনাকে।'

'আমি জিজ্ঞেস করছি আলিবাবার কোন খবর পেয়েছেন?'

উপরে উঠতে শুরু করেছে আরতি। পিছু পিছু চলল মোস্তাক।

'পেয়েছি। চলুন ঘরে গিয়ে বলছি সব।'

সোজা এসে আটাশ নম্বর দরজায় চাবি লাগাল মোস্তাক। আরতি ঢুকল প্রথম, তারপর ভিতরে এসে এদিক থেকে চাবি লাগিয়ে দিল সে। আরতিকে বেশ কিছুটা বিচলিত মনে হলো ওর। গাম্ভীর্যের অন্তরালে যেন একটা ভীতির ভাব টের পাচ্ছে সে ওর চোখেমুখে। নিজেও সে কম বিচলিত হয়নি। ওয়াইন ক্যাবিনেট থেকে এক পেগ হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এসে বসল আরতির মুখোমুখি সোফায়।

'ধরা পড়ে গিয়েছিল প্রায়। ওর বাসাটা ঘিরে ফেলেছিল পুলিস। একটা পুলিসকে নাকি মেরে ফেলেছে ও গুলি করে। তারপর পালিয়ে গেছে মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে।' সিগারেট ধরাল সে একটা। 'কিছু একটা ভজঘট হয়েছে কোথাও। কিন্তু স্বীকার যাচ্ছে না। কোন্‌খানটায় গুবলেট করল বুঝতে পারছি না।'

'খুব সহজ ব্যাপার,' বলল আরতি। 'ওকে ফলো করা হয়েছিল, টের পায়নি গর্দভ। ওর জন্যে আমিও ধরা পড়তে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। ওর বাসা থেকে বেরিয়ে আসতেই লোক লেগে গিয়েছিল আমার পেছনেও।' কথাটা বলতে গিয়ে কেঁপে গেল আরতির কণ্ঠস্বর। চট করে একবার মোস্তাকের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে গলা পরিষ্কার করল আরতি—যেন গলা কেঁপেছে শ্লেষ্মার জন্যে। 'ছিপছিপে একহারা লম্বা একটা লোক। মুখটা দেখতে পাইনি, কিন্তু পুলিসের লোক না এটুকু নিশ্চয় করে বলা যায়। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ওকে খসাতে পারলাম না। শেষে যে বাসাটা ভাড়া নিয়েছিলাম সেখানে ফিরে গেলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে লোকটা। বুঝলাম পুলিসে ফোন করতে যাচ্ছে। তক্ষুণি এই ছদ্মবেশ পরে নিয়ে ছাত টপকে সরে গেলাম। দেখলাম দশ মিনিটের মধ্যে পুলিস এসে হাজির। এই লোকটা কে হতে পারে বলতে পারেন?'

মাথা নাড়ল মোস্তাক। পারে না। ছাতের দিকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'একরাতে দু'দুটো খুন করে, বিশেষ করে পুলিস খুন করে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে আলিবাবা। খেপে উঠেছে টাকার জন্যে।'

'হ্যাঁ। আমাকেও ছিঁড়ে খাওয়ার দশা করেছিল। নার্ভাস ব্রেকডাউনের মত অবস্থা হয়ে গেছে ওর। বলছিল আজই ঢাকা ছেড়ে সরে পড়তে চায়।'

'কিন্তু এই অবস্থায় ঢাকা থেকে বের হওয়া ওর জন্যে দারুণ রিস্কি। ওর চেহারার বর্ণনা রয়েছে পুলিসের কাছে। বাস, ট্রেন, প্লেন, স্টীমার, লঞ্চ, এমন কি নৌকোতে পর্যন্ত খোঁজা হবে ওকে, সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ওর চেহারার বর্ণনা। ধরা ওকে পড়তেই হবে।'

'ও ধরা পড়লেই আপনার নাম বলে দেবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মোস্তাক। 'তা ঠিক। অতএব ধরা পড়লে চলবে না। ধরা পড়ার আগেই মুক্তি দিতে হবে ওকে দেহ-পিঞ্জর থেকে।' উঠে দাঁড়াল মোস্তাক। 'এখুনি বেরোব আমি। আপনি কি করবেন?'

'আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করব।' কথাটা বলতে বলতে এক বান্ডিল নোট বের করল আরতি পেটের সাথে বাঁধা একটা থলে থেকে। 'এই যে আলিবাবার টাকা।'

হাত বাড়িয়ে নোটগুলো নিল মোস্তাক, তারপর একটা বীভৎস হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। 'কিন্তু যে দেশে যাচ্ছে আলিবাবা, সেখানে ওর টাকার দরকার পড়বে না যে কোন দিন?'

'তাহলে ওর উত্তরাধিকারীকে দেবেন। আমি চলে যাচ্ছি কাল বিকেলের ফ্লাইটে।'

'কাজটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে না? আপনার চেহারার বর্ণনাও রয়েছে পুলিসের কাছে।'

'অন্য চেহারায়, অন্য নামে, অন্য পাসপোর্টে যাচ্ছি। আপনার কোন ভয় নেই, ধরা পড়লেও আপনার নাম বলব না। আর ভাল কথা, পাশের রুমটা বুক করুন আমার জন্যে। আমার নাম নিভারাণী দাশ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল মোস্তাক। মনে মনে ভাবল, আমার কি দোষ, নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মেরেছে আলিবাবা, আগেই ওকে বলেছে সে, যদি গোলমাল কিছু করে তাহলে··· কিন্তু আশ্চর্য! ব্ল্যাক স্পাইডারের কাজকর্মের ধারাই আলাদা। আগে থেকেই অন্য নামে অন্য চেহারায় পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছে আরতি লাহিড়ীকে! কোন ফাঁক নেই কাজে!

উঠে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে এল আরতি। মুহূর্তে সংযমের বাঁধ ভাঙল ওর। এতক্ষণ যে নির্মম, কঠোর, অকুতোভয়, বেপরোয়া ভাব নিয়েছিল সে খোলস খসে গেল। ভীতা, সন্ত্রস্তা এক যুবতী নারী বেরিয়ে এসেছে খোলস ছেড়ে। দারুণ ভয় পেয়েছে আরতি। জীবনে কখনও এত ভয় পায়নি সে আর। চিরঞ্জীবের হাত ধরে যেদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, সেদিনও নয়। ধরা পড়লে কি অবস্থা হত তার?

ছায়াছবির মত গত দু'ঘণ্টার ঘটনাগুলো ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়—আক্রমণোদ্যত আলিবাবা, পথে সেই লোকটার অনুসরণ, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন, বুকের মধ্যে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে চেনা অচেনা গলি ধরে এঁকেবেঁকে হাঁটা, তারপর কম্পিত হাতে ছদ্মবেশ ধারণ, চোখ বুজে মইয়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এ ছাত থেকে ও পাশের ছাতে যাওয়া, সেখান থেকে

রাজমিস্ত্রীদের বাঁশ বেয়ে অতি কষ্টে নিচে নেমে আসা, তারপর চোরের মত সন্তর্পণে–উহু, ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে সে!

কোথায় নেমেছে সে আজ!

চোখের সামনে ভেসে উঠল শুভ্রকেশ অধ্যাপক পিতার শান্ত, সৌম্য মুখটা, মার সজল চোখ দুটো…লাল পাড়ের শাড়িটা, সিঁথির সিঁদুর; ইভার বেণী; অমলের উঠতি গোঁফ। কোন্ ক্লাসে উঠল যেন অমল? এইট…না, নাইন। চুনকালি মেখে দিয়ে এসেছে সে ওদের মুখে। এখন চোরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে এই বিদেশে পুলিসের তাড়া খেয়ে।

দু'হাতে চোখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল আরতি লাহিড়ী।

বোম্বের হিরোইন হবে বলে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে এ কোথায় এসে ঠেকেছে সে!

এখন আর কোন পথ নেই ওর মুক্তির।

চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে বিপদ।

সাত

পরদিন সকাল দশটা।

রানার অফিস।

সবার আগে পৌঁছেছে আজ রানা।

ডেস্কের উপর পা তুলে দিয়ে সুইভেল চেয়ারে আরাম করে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছিল সে। ভাবছিল, এমন নির্মম ভাবে খুন করা হলো কেন খুনীকে? ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে শেষ করে দেয়া হলো লোকটাকে?

সালমা এসে ঢুকল ঘরে। একটা চোখ সামান্য ফাঁক করল রানা।

'কিছু বলবে?'

রানার চিন্তায় বিঘ্ন ঘটাবে না মনে করে বেরিয়ে যাচ্ছিল সালমা, থমকে দাঁড়াল।

'আখতারুজ্জামান সাহেব এসেছেন। আপনার সাথে কি যেন জরুরী আলাপ আছে। পাঠিয়ে দেব?'

'দাও। কাল রাতে কখন জ্ঞান ফিরল ভাবীর?'

'ভোর রাতে। ডাক্তার সিড্যাটিভ প্রেসক্রাইব করেছে। শকটা কাটিয়ে মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে। কিন্তু বাচ্চাটাকে সামলানো মুশকিল হবে।'

'খুব কাঁদছে বুঝি?'

'না। সকাল থেকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওর ধারণা লুকোচুরি খেলছে ওর বাবা ওর সাথে, কোথাও লুকিয়ে আছে, এক্ষুণি "হাউ" করে ভয় দেখাবে ওকে।' বলতে বলতে দু'ফোঁটা পানি বেরিয়ে পড়ল সালমার চোখ

থেকে। চোখ মুছে নিয়ে বলল, 'বেচারী জানেই না কি হয়েছে। রহমানকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে রহমান চাচা, আব্বা মেরেছে? দাঁড়াও, তুমি কেঁদো না, আব্বাকে এমন মার মারব না!'

প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল সালমা। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা ওর গমন পথের দিকে। সারারাত জেগে সেবা করেছে মেয়েটা রাবেয়া হকের, বাচ্চাটাকে মুখ ধুইয়ে, খাইয়ে রহমানের হাতে সোপর্দ করে বাড়ি ফিরেছে। আর কেউ হলে হয়তো বিরক্ত হত। নালিশ বা বিরক্তি দূরে থাক, ক্লান্তির একবিন্দু রেশও নেই মেয়েটার মধ্যে; দিব্যি গোসল করে চারটে মুখে দিয়ে অফিসে এসে হাজির হয়েছে ঠিক সময় মত। একটা সুখের সংসার ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ায় সমবেদনায় চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে জল। এরকম মেয়ে আছে বলেই পৃথিবী থেকে 'মঙ্গল' শব্দটা উঠে যায়নি এখনও। নারীকে নিয়ে সাধে বাড়াবাড়ি করে না কবি সাহিত্যিকেরা।

আখতারুজ্জামান এসে ঢুকল ঘরে।

'হ্যালো, জামান? কেমন আছ? হঠাৎ কি মনে করে?'

'বহুদিন দেখা নেই, এই পথেই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।' সামনের চেয়ারে বসে পড়ল দশাসই ডাকসেটে ধুরন্ধর ডি.আই. জি. জামান।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়াল রানা। 'মতলব ছাড়া একপা ফেলো না তুমি। বলে ফেলো কি বক্তব্য। একটা ফোনের অপেক্ষা করছি, যে কোন মুহূর্তে বেরোতে হতে পারে।'

'গত রাতের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ।'

'যাক, বাঁচলাম?' স্বস্তি ফুটে উঠল জামানের মুখে। 'ধরেছ যখন শেষ না দেখে ছাড়বে না তুমি। ভালই হলো। তোমার নামটা কাগজে না ওঠায় ভাল হয়েছে। ওটার জন্যে অনায়াসে আমাকে ক্রেডিট দিতে পারো। তোমার নাম যাচ্ছিল, চেপে দিয়েছি আমি।'

'কারণ?'

'কারণ কাল দুপুরে তুমি আমার খোঁজ করেছিলে। আমি ছিলাম না। তোমার ফোন এসেছিল জেনে আমি বার কয়েক চেষ্টা করেছিলাম তোমার বাসায়, অফিসে—পাইনি। শুধু আমরা কেউ কাউকে পেলাম না বলে খুন হয়ে গেল জহিরুল হক।'

'তার মানে? একটু পরিষ্কার করে বলো।' সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল রানা জামানের দিকে।

'তুমি নিশ্চয়ই ব্ল্যাক স্পাইডার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলে আমাকে?' রানাকে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'ওর সম্পর্কে আমার যা জানা আছে সেটা শুনলে আর একজন সাগরেদ নিয়ে ওকে পাহারা দেয়ার চেষ্টা করতে না। আমিও দুশো পুলিস দিয়ে সারা বাড়ি ঘিরে রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না, নিজে উপস্থিত থাকতাম সপারিষদ। কতবড় ভয়ঙ্কর একটা দলের বিরুদ্ধে কত সামান্য শক্তি নিয়ে তুমি প্রতিরোধ গড়তে গিয়েছিলে

বুঝতে পারলে লজ্জা পাবে তুমি।'

'আমি কোন গুরুত্বই দিইনি ব্যাপারটাকে, কোন পাগলের খ্যাপামি বলে মনে করেছিলাম। যখন গুরুত্ব দিলাম, তখন এমন অতর্কিতে এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা...'

'শুধু জহিরুল হক বা তুমি নও, পৃথিবীর যে দেশেই কাজ শুরু করেছে ব্ল্যাক স্পাইডার সেখানেই প্রাণ দিতে হয়েছে প্রথম জনকে। টাকার দাবি আর চিঠির হুমকিকে পাগলের পাগলামি বলে মনে করেছে সবাই। এটাই ওর কাজ শুরু করবার টেকনিক। দুঃখ এই, আমার জানা ছিল এ টেকনিকের কথা, বিভিন্ন দেশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে রুটিন কশনারি রিপোর্ট পেয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমারই দেশে যখন কাজ আরম্ভ করল ব্ল্যাক স্পাইডার, আমার জ্ঞানটা আমি কাজে লাগাতে পারলাম না।' হঠাৎ অন্য সুরে বলল, 'ভাল কথা, খুনীকে পাওয়া গেছে শুনেছ? মানে ওর লাশটা?' রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'পরিচয়ও জানা গেছে। সার্কাসের নাইফ থ্রোয়ার ছিল লোকটা। নাম আলিবাবা।'

'যে মরে গেছে তার কথা বাদ দাও এখন। আসল কথা বলো।' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা: 'কে এই ব্ল্যাক স্পাইডার?'

'জানি না, রানা। জানলে তোমার অফিসে বসে আঙুল চুষতাম না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, ও হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের ভয়ঙ্করতম ব্ল্যাকমেলার। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশে রয়েছে ওর নেট-ওয়র্ক। প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রত্যেকটা বড়লোককে জ্বালিয়ে মেরেছে ও গত তিন বছর ধরে, এখনও মারছে। অতিষ্ঠ করে তুলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন।'

'কিন্তু ব্ল্যাকমেলিং যদি ওর উদ্দেশ্য হবে তাহলে খুন করবে কেন? টাকা আদায় করা এক জিনিস, আর খুন করা আরেক জিনিস। ব্ল্যাকমেলাররা সাধারণত...'

'আসল পয়েন্টটা তুমি মিস্ করে গেছ, রানা। প্রথমেই একটা খুন আর প্রচুর পাবলিসিটি না হলে আর সবাই ওকে ভয় পাবে কেন? তাই প্রথমেই এমন একজনকে ও বাছাই করে যে কিছুতেই টাকা দেবে না। আজ প্রত্যেকটা কাগজে বেরিয়েছে জহিরুল হকের মৃত্যু-সংবাদ। শুধু তাই নয়, ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ। ফলে কি লাভ হলো ওর? আজকে সারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আলোচনা হচ্ছে ব্ল্যাক স্পাইডারকে নিয়ে। একজন অপ্রতিরোধ্য ভয়ঙ্কর দস্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল সে আজ বাংলাদেশে শুধু একটিমাত্র খুনের দৌলতে। এরপর যার কাছে চিঠি আর মরা মাকড়সা পৌঁছবে তার মনের অবস্থাটা চিন্তা করে দেখো। টাকা না দেয়ার বা পুলিসের সাহায্য নেয়ার দুঃসাহস হবে আর কারও? মুশকিলটা হচ্ছে এখানে। সারা পৃথিবী জুড়ে কত লক্ষ লোক যে গোপনে ব্ল্যাক স্পাইডারের দাবি পূরণ করে চলেছে জানার উপায় নেই।'

'এত যখন জানো, তখন খবরটা পত্রিকায় ছাপাতে দিলে কেন? চেপে গেলেই পারতে? সম্পাদকদের বুঝিয়ে বললে তারা কি ব্যাপারটার গুরুত্ব

বুঝতে পেরে পুলিসের কাজে সহযোগিতা করত না?'

'করত। কিন্তু তাহলে খুন হত আরেক জন।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেল রানার।

'তুমিও কি ওকে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করছ? একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসারের মুখে কথাটা কিন্তু সাজে না, জামান।'

কফি দিয়ে গেল সালমা। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার আক্রমণ করতে যাচ্ছিল রানা, হাত তুলে বাধা দিল আখতারুজ্জামান।

'ইন্টেলিজেন্স অফিসারও তো একজন মানুষ, রানা! মানুষ হিসেবে আমি চাই না আমার দেশের আর একজন মানুষ একটা অর্থলোলুপ পিশাচের হাতে প্রাণ দিক। খবরটা চেপে দিলে আমি জানি কয়েকদিনের মধ্যে খুন হত আর একজন। কারণ, প্রচার চাই ওদের। খবরটা প্রচার হয়ে যাওয়ার ফলে অনেকের হয়তো টাকা যাবে, কিন্তু প্রাণ যাবে না আর একটিও। পুলিসী চাল খাটাতাম আমি, যদি জানতাম ওকে ঠেকাবার ক্ষমতা আছে আমার। ক্ষমতা নেই, তাই পুলিস হওয়ার চেয়ে মানুষ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলাম।'

'তার মানে তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ, তোমার নাগরিককে ব্ল্যাক স্পাইডারের হাত থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তোমার নেই?'

'হ্যাঁ। স্বীকার করছি। একটু তলিয়ে দেখলে তুমিও স্বীকার করবে, রানা। পুলিসের সংখ্যা সীমিত। কেবল ভি.আই.পি. ছাড়া আর কাউকে সর্বক্ষণ গার্ড দেয়ার মত বাড়তি পুলিস আমাদের হাতে নেই। জহিরুল হক সাধারণ লোক। তার জন্যে আমরা বড়জোর এক সপ্তাহ গার্ডের ব্যবস্থা করতে পারতাম হয়তো, কিন্তু তাতে কোন লাভ হত না। ধৈর্যের সাথে খাপ পেতে বসে থাকত ব্ল্যাক স্পাইডার। মরতে ওকে হতই। তাছাড়া ওর কাজের নমুনা তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। তোমরা তিনজন তো চেষ্টা করেছিলে, পারলে বাঁচাতে? তোমরা না হয়ে তিনজন সেপাই পাহারা দিলে কি তোমাদের চেয়ে ভাল পাহারা দিত? আসল কথা ব্ল্যাক স্পাইডার জানে, হুমকি দিয়ে সে হুমকি কাজে পরিণত না করলে কেউ আর টাকা দিতে চাইবে না ওকে। হয় টাকা দাও, নয় মরো—এই হচ্ছে ওর সাফ কথা। লোকে জানে টাকা না দিলে বাঁচার উপায় নেই, তাই দেয়। জহিরুল হকের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের আর কোন বড়লোক ওর চিঠিকে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেবে না।'

আধ মিনিট চুপচাপ কফি পান করল ওরা। রানার এগিয়ে দেয়া প্যাকেট থেকে এতক্ষণে একটা সিগারেট বের করে ধরাল আখতারুজ্জামান। রানাও ধরাল একটা। আবার কথা শুরু করল ডি.আই.জি.।

'তোমার মনের অবস্থাটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, রানা। তোমার উপস্থিতিতে তোমার বন্ধুকে খুন করা হলো, এটা তোমার কতখানি লেগেছে আমি জানি। তার ওপর খুনীকে অনুসরণ করলে তোমরা, তার সহযোগী একটা মেয়েকেও আবিষ্কার করলে, অথচ দু'জনের কাউকে ধরতে পারল না পুলিস—এ জন্যে হয়তো একটা ক্ষোভ জমেছে তোমার মনে। আমাদের

অপদার্থ মনে করে রেগে আছ আমাদের ওপর। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো। খুনী ধরা পড়লে কোন লাভ ছিল না আসলে। ওকে ধরলে দেখা যেত ও ব্ল্যাক স্পাইডার নয়। মেয়েটাকে ধরলে দেখা যেত সে-ও ব্ল্যাক স্পাইডার নয়। নিউ ইয়র্কে ধরা পড়েছিল একজন ছোরাসহ, কথা বলতেও বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু সে কথার কোন মূল্য নেই। জানা গেল এক অন্ধকার রাস্তায় ওর সাথে দেখা করেছিল একজন লোক, সেখানেই কাজের ভার পেয়েছিল সে, লোকটার মুখ দেখতে পায়নি, কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়েছিল গাড়ি করে। গাড়ির নম্বর নিয়ে, অনেক মাথা খাটিয়ে এই দ্বিতীয় লোকটাকেও ধরেছিল নিউ ইয়র্ক পুলিস। জানা গেল এই লোকটাও ব্ল্যাক স্পাইডার নয়, ব্ল্যাক স্পাইডারের এক সহকারী, যাকে সে জীবনে কখনও দেখেনি, টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছিল ওকে। বুঝতে পারছ? এই ভাঙা চেন ধরে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। আশ্চর্য কৌশলে নির্বিবাদে কাজ করে যাচ্ছে লোকটা।'

'বুঝলাম,' এতক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিয়ে বসল রানা। 'এবার আসল কথাটা বলে ফেলো, জামান। তুমি এই কাহিনী শোনবার জন্যে নিশ্চয়ই অফিস কামাই করে এখানে বসে নেই?'

'না। তোমার সাহায্য চাই, রানা।' কথাটা বলেই চট করে যোগ করল, 'আমি জানি, তোমার সাধ্যমত তুমি করবে নিজের গরজেই। কিন্তু সরকারীভাবে তোমার ওপর দায়িত্ব দিলে বেশ কিছু সুবিধে আছে, ভেবে দেখো। যে কোন দেশের পুলিস সবরকম সাহায্য করবে তোমাকে যদি প্রয়োজন হয়। তুমি যদি...'

টেলিফোন এল। রিসিভার কানে তুলে নিল রানা।

'ব্যাম্বিনো হোটেলে আছে, স্যার লোকটা। আটাশ নম্বর রুমে।'

'তুমি কোথা থেকে বলছ, গিলটি মিঞা?'

'ইন্টারকন থেকে। এই কিচুক্ষণ আগে বোম্বের একটা টিকিট কাটল মোস্তাক।'

'নিজের নামে?'

'না, স্যার। একটা মেয়েছেলের নামে। নিভারাণী দাশ।'

'নিভারাণী দাশ?' অবাক হলো রানা। সেই মেয়েটা নয় তো?'

'না, স্যার। আমারও সেই রকমই সন্দো হয়েচিল প্রথম। কিন্তুক চেহারাটা দেকে সব সন্দো দূর হয়ে গেচে। কুচ্ছিৎ এক মেয়েছেলে। কাল রাতে আমরা যাকে দেকেছিলাম তার সাতে একেবারেই মেলে না।'

'কোথায় দেখলে ওকে?'

'ব্যাম্বিনো হোটেলেই তো আচে মেয়েছেলেটা। সাতাশ নম্বরে। আজকে চলে যাচ্চে বোম্বে।'

'এয়ার ইন্ডিয়ার টিকেট?'

'হ্যাঁ। পাঁচটার পেলেনে।'

'ঠিক আছে, গিলটি মিঞা, তুমি ফিরে এসো। অফিসে। আসবার আগে

আর একবার ব্যাম্বিনো হোটেলটা হয়ে এসো। ওখানে তোমার জানতে হবে কবে এই রুম নিল নিভারাণী দাশ। বুঝেছ?'

'নিশ্চয়।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে জামানের দিকে চেয়ে হাসল রানা।

'কি বুঝলে?'

'বুঝলাম ব্যাম্বিনো হোটেলে নিভারাণী দাশ বলে একজন মহিলা আছে, সে আজ এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে কোথাও চলে যাচ্ছে। তোমার সন্দেহ হচ্ছে এই মেয়েটাই কাল রাতের সেই মেয়ে। ব্যস, এইটুকুই বুঝেছি। এবার বাকিটুকু বুঝিয়ে দাও। কাউকে অ্যারেস্ট করবার দরকার মনে করলে বলে ফেলো, এক্ষুণি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'কাউকে অ্যারেস্ট করবার দরকার নেই এখন। এখন কিছু করতে গেলেই ছিঁড়ে যাবে সূত্র। যেটুকু তথ্য আমার হাতে আছে তার সুতো ধরে ধরে মূলে পৌঁছবার ইচ্ছে আছে আমার। এখন কাউকে অ্যারেস্ট করলেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব।'

'ঠিক আছে, রানা, তুমি যেমন ভাবে ভাল মনে করো সেভাবেই এগোবে। কিন্তু কি কি তথ্য পেলে আমাকে জানাতে আপত্তি আছে তোমার?'

'জানাতে পারি শুধু এক শর্তে। তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমার পরামর্শ ছাড়া এ ব্যাপারে কোন কিছু করে বসবে না।'

ক্ষুরধার চোখ দুটো টিপে বন্ধ করে রাখল জামান তিন সেকেন্ড, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। রাজি।'

'কাল রাতে টাকার জন্যে মেয়েটার ওপর চাপ দিচ্ছিল খুনী। শারীরিক বল প্রয়োগ করবার উপক্রম করেছিল। সেই সময় মোস্তাকের নাম উচ্চারণ করেছিল মেয়েটা। বলেছিল, টাকাটা মোস্তাকের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে কাল। এবং এই অসভ্যতারও জবাবদিহি করবে। বোঝা গেল এরা ছাড়াও মোস্তাক বলে আর একজন লোক আছে এদের দলে, যাকে ভয় করে খুনীটা। কাল রাতে আমি আর গিলটি মিঞা যত মোস্তাককে চিনি তাদের একটা লিস্ট তৈরি করে ভাবতে শুরু করলাম কার সাথে এই ব্যাপারের যোগ থাকতে পারে। রাতে কিছুই বোঝা গেল না। আজ সকালে গিলটি মিঞার মোস্তাকগুলোর চেহারার বর্ণনা শুনতে শুনতে হঠাৎ একখানে একটু খটকা লেগে গেল। ভয়ঙ্কর চেহারার একটা মোস্তাকের কথা শুনেই মনে পড়ে গেল জহিরুল হকের পিওন করিমের কথা। নকল টাকার প্যাকেট নিয়ে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে আক্রমণ করেছিল ভয়ঙ্করদর্শন এক লোক। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম। খোঁজ নিতে পাঠালাম গিলটি মিঞাকে।'

'ঢিলটা ঠিক জায়গাতে গিয়েই পড়েছে মনে হচ্ছে,' বলল আখতারুজ্জামান।

'সেটা বোঝা যাবে গিলটি মিঞা ফিরে এলে। আর এক কাপ কফি খাবে?'

'মন্দ হয় না খেলে।'

আবার এক দফা কফি এল। মাঝে অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিল আখতারুজ্জামান জরুরী কোন সংবাদ থাকলে যেন তাকে এখানে ফোন করা হয়। আরও আধ ঘণ্টা থাকবে সে এখানে।

টুকিটাকি নানান ধরনের গল্পের পর আগের কথার খেই ধরল জামান।

'এই নিভারাণী দাশ বিকেলের ফ্লাইটে চলেছে কোথায়?'

'বোম্বে। গিলটি মিঞার কনফার্মেশন পেলে আমাকেও ছুটতে হবে ওখানে।'

'কিন্তু তোমাকে তো চিনে ফেলবে মেয়েটা। তোমাকে অনুসরণ করতে দেখেছিল ও। নইলে পালাত না বাড়ি ছেড়ে।'

'ঠিকই বলেছ। ভাল কথা, মোটামুটি আমার মত ফিগার এমন কোন বিরাট বড়লোক বন্ধু আছে তোমার?'

'আছে,' বলল জামান। 'কিন্তু কেন বলো তো?'

'তাকে এক সপ্তাহের জন্য কক্সবাজারে পাঠাতে পারবে? কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আসুক সমুদ্রের ধার থেকে।'

'ওর ছদ্মবেশে যেতে চাইছ?' হাসল জামান। 'ঠিক আছে, কোন অসুবিধে হবে না। আজই জঙ্গলে পাঠিয়ে দিতে পারি আমি আসফ খানকে। শুধু মুখ থেকে একটা কথা খসালেই হবে।'

'কি রকম?'

'ঘোর শিকারী। যদি বলি রামুর দশ মাইল উত্তর-পুবে বাঘ দেখা গেছে, আজই ছুটবে তল্পিতল্পা গুটিয়ে।'

'খবরটা মিথ্যে হলে ফিরে আসবে পরশুদিন।'

'মিথ্যা না, সত্যিই বাঘ এসেছে। আমাদের চারটে ছাগল মেরেছে, খবর এসেছে আজ।'

গিলটি মিঞা এসে ঢুকল এমন সময়। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সে। ওকে ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দিলে বিরাট এক ভূমিকা দিয়ে প্রকাণ্ড এক গল্প ফেঁদে বসবে বুঝতে পেরে মনে মনে হাসল রানা।

'কতাটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল, স্যার, কিন্তুক প্রথম বার জিগেসই করিনি। ফোনে আপনার সাতে কতা বলে...'

'কবে কখন রূম নিয়েছে মেয়েটা?' ওকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'কাল। রাত দেড়টায়।' ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল গিলটি মিঞা, তিনটে শব্দে সব কথা বলে ফেলতে হলো দেখে। কিন্তু পরমুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল আবার। 'দরজায় কান পেতেছিলুম, স্যার।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'কার দরজায়?'

'ওই নিভারাণী দাশের। ভেতরে কতা বলছিল মোস্তাক ওর সাতে।'

'কি কথা বলছিল?'

'বলছিল, আপনার দারুণ সাহস, মিস আরতি। আমি হলে আরও ক'দিন ডুব মেরে থেকে...'

'মিস আরতি!' অবাক হয়ে গেল রানা। 'ওর নাম নিভারাণী নয়

তাহলে?'

'সেই তো মজা, স্যার। আর মিস আরতিই যদি হবে, পেটে তিন মাসের বাচ্চা কেন?'

আখতারুজ্জামানের দিকে ফিরল রানা।

'ব্যাপারটা বুঝতেই পারছ। এবার কিছু অ্যাকশন দেখাও, দোস্ত। আসফ খানের পাসপোর্টটা চাই আমার এক ঘণ্টার মধ্যে। ভিসার ব্যবস্থা চাই। এয়ার ইন্ডিয়ার টিকিট চাই ঢাকা-টু-বোম্বে। আজই রওনা হব আমি।'

'ও.কে.। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' উঠে দাঁড়াল জামান বিশাল বপু নিয়ে। 'কিন্তু এই মোস্তাকটার ব্যাপারে কি করতে হবে?'

'কিছুই করতে হবে না। ওর ওপর নজর পর্যন্ত রাখার দরকার নেই। ক'দিন ঘুরে বেড়াক ও খোদাই ষাঁড়ের মত। যা করার আমি ফিরে এসে করব।'

'ঠিক আছে। ইন্ডিয়ান পুলিসকে তোমার কথা জানিয়ে দেব? ওদের সব রকমের সহযোগিতা...'

'আপাতত ওসব কিছু দরকার নেই। সময় হলে আমি তোমাকে ট্রাংকল করব।'

'ও.কে.। সী ইউ। বাই বাই।'

ব্যস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ইন্টেলিজেন্সের ডি.আই.জি. আখতারুজ্জামান।

'কি বললে?' আঁৎকে উঠল আরতি লাহিড়ী। রিসিভারটা শক্ত করে ধরে চেপে রেখেছে সে কানের সাথে। 'আর কি জিজ্ঞেস করছিল লোকটা?'

'শুধু এইটুকুই জিজ্ঞেস করল।' ভেসে এল তায়জুল ইসলামের কণ্ঠস্বর। 'আপনি কবে কখন এই হোটেলে উঠেছেন। ব্যস, আর কিছু না।'

'কেমন দেখতে লোকটা?' আরতির চোখের সামনে রানার একহারা লম্বা ফিগারটা ভেসে উঠল।

গিলটি মিএর বর্ণনার সাথে গত রাতের অনুসরণকারীর চেহারার কোন মিল না পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করল আরতি লাহিড়ী, কিন্তু মন থেকে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দূর করতে পারল না কিছুতেই।

আশ্চর্য একটা ভয় চেপে ধরতে চাইছে ওকে চারপাশ থেকে।

আট

আধঘণ্টার জন্যে দিল্লীতে নামল প্লেনটা। যাত্রীদের অর্ধেকের বেশি নেমে গেল, খানিক বাদে হুড়মুড় করে ঢুকবে বোম্বের যাত্রীরা। আরতিকে নামতে দেখে একটু অবাক হলো রানা। চট করে চোখ গেল র‍্যাকের উপর রাখা ওর

ব্যাগটার দিকে। না, আছে। বোধহয় টুকিটাকি কিছু কিনবার জন্যে নেমেছে।

মিনিট খানেক ইতস্তত করে নেমে এল রানাও।

ঢাকা এয়ারপোর্টের ডিপারচার লাউঞ্জে মেয়েটির দিকে এক নজর চেয়েই কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল রানা। কোথাও কোন ভুল হয়নি তো? এ তো সেই মেয়ে নয়! পাশের ভদ্রলোক বোধহয় জিজ্ঞেস করেছিল সিগারেট খেলে ওর কোন অসুবিধে আছে কিনা, নোংরা কালো দাঁত বের করে কুৎসিত হেসে মাথা নেড়ে অভয় দিল সে। নিভারাণী দাশ। রানা জানে ছদ্মবেশে আছে আরতি, আশা করেছিল এক নজর দেখেই চিনে ফেলতে পারবে সে, ছদ্মবেশ ভেদ করে আবিষ্কার করতে পারবে আলিবাবার ঘরে দেখা সেই সুন্দরী মেয়েটাকে। কিন্তু প্রথম দর্শনেই ভড়কে গেল সে। শুধু দৈহিক উচ্চতা ছাড়া আর কোন মিলই নেই এর তার সাথে। গায়ের রঙ পর্যন্ত গাঢ় হয়ে গেছে দুই পোঁচে। এত নিখুঁত ছদ্মবেশের কথা কল্পনাও করেনি রানা।

সত্যিই এটা সেই মেয়েই, নাকি মস্ত কোন ভুল করেছে গিলটি মিঞা, ভাবছিল রানা, এমনি সময় ওর দিকে চাইল মেয়েটা। মুহূর্তে ঘুচে গেল রানার সন্দেহ। এক পলকের জন্যে নগ্ন ভীতি দেখা গেল মেয়েটার চোখে, কাঁধে ঝোলানো এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগের স্ট্র্যাপটা শক্ত করে চেপে ধরল সে। কিন্তু সামলে নিল পরমুহূর্তে। চট করে চোখ সরাল অন্যদিকে।

রানা বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কাল রাতে একবারও স্পষ্ট করে দেখতে পায়নি মেয়েটা ওকে, ওর মুখ চিনে রাখবার সুযোগ পায়নি, কিন্তু ওর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আর ফিগার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে ওর। মেয়েটা ভয় পেয়েছে ওর ফিগার দেখে, চেহারা দেখে নয়। তাই যদি হয়, তাহলে আসফ খানের ছদ্মবেশ নিয়ে চশমা, কাঁচাপাকা জুলফি আর একজোড়া কড়া গোঁফ লাগিয়ে তেমন কোন সুবিধে হবে না ওর। অবশ্য সুবিধে-অসুবিধে বিচার করবার সময় আসেনি এখনও। তাছাড়া মেয়েটা যে ওকে চিনে ফেলেছে, এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই। এতগুলো বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন চেহারায়, বিভিন্ন জাতের নারী পুরুষের মধ্যে এক-আধজনকে গত রাত্রির অনুসরণকারীর মত দেখতে মনে হলে খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তবু চোরের মন বোঁচকার দিকে—কাজেই খানিকটা ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা। ওর তরফ থেকে কোন রকম সন্দেহজনক ব্যবহার না দেখলে ধীরে ধীরে কেটে যাবে ভয়।

কাছাকাছিই একটা চেয়ারে বসল রানা ব্রীফকেসটা হাঁটুর উপর রেখে। সিগারেট ধরাল একটা।

এমনি সময় অমায়িক হাসি হেসে রানার দিকে এগিয়ে এল একজন ইউনিফরম পরা উচ্চপদস্থ কাস্টমস অফিসার। প্রমাদ গুণল রানা।

'আরে, স্লামালাইকুম। আসফ খান সাহেব যে!' ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এল অফিসার।

'বলি ব্যাপারখানা কি? অ্যাঁ? সকাল দশটার ফ্লাইটে ফিরলেন প্যারিস থেকে, সাত ঘণ্টাও হলো না, আবার ছুটেছেন বোম্বে।' রানার হাত ধরে

আন্তরিক ভাবে ঝাঁকাল অফিসার যতক্ষণ খুশি। কথা বলেই চলেছে, 'কত টাকা করবেন? একটু বিশ্রামও তো দরকার এক-আধ সময়'?'

কি করবে বুঝতে না পেরে মৃদু হাসল রানা। এখন ব্যাটা যদি কোনভাবে আবিষ্কার করে বসে যে ও আসফ খান নয়, তাহলেই সর্বনাশ।

'বোম্বে কি জন্যে? বিজনেস?' আবার জিজ্ঞেস করল অফিসার। রানাকে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে দেখে বলল, 'এতই যদি খাটবেন, তাহলে আর শিল্পপতি হয়ে লাভটা কি হলো শুনি?' রানাকে হঠাৎ চোখ টিপল অফিসার। বলল, 'করুন, করুন, যত খুশি টাকা করুন। আমার হিংসে হয় না। ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে শ্রম, আর বিজনেস হচ্ছে ব্যস্ততা—এ ছাড়া তো আর টাকা হয় না। আর একটা লাইন আছে—চুরি! ওদিকে যাননি যখন, খাটুন। আমার ওতে লোভ নেই।'

রানাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল অফিসার আর একজন পরিচিত লোকের দিকে হৈ-হৈ করে। হাঁপ ছেড়ে বসে পড়ল রানা। নিখুঁত ছদ্মবেশের জন্যে নিজের পিঠ চাপড়াতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় দূর থেকে এক ঝলক দেখতে পেল সে ডি.আই.জি. জামানকে। চট করে মেয়েটার মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়েই বুঝতে পারল সে ব্যাপারটা। ভীতির লেশমাত্র নেই মেয়েটার মধ্যে, দূর হয়ে গেছে আড়ষ্টতা, সহজ ভঙ্গিতে অন্যান্য যাত্রীদের লক্ষ করছে এখন। সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে রানাকে আজই সকাল দশটায় সে প্যারিস থেকে ফিরেছে জানতে পেরে।

মেয়েটা রানাকে চিনে ফেলতে পারে সন্দেহ করে নিশ্চয়ই শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছিল আখতারুজ্জামান এই কাস্টমস অফিসারকে।

প্লেনে উঠবার সময় তিনটে জিনিস লক্ষ করেছে রানা। প্রথম, নিভারাণী দাশের চলার ভঙ্গিতে অন্তঃসত্ত্বার সাবধানতা নেই। দ্বিতীয়, যদিও ঘড়ি বা আংটি নেই এখন, বাম হাতের কব্জিতে বহুদিন ঘড়ি পরার ফলে যে ফ্যাকাসে দাগ পড়ে সেটা আছে। গায়ের রঙ গাঢ় করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কব্জিতে কিছুটা জায়গা অপেক্ষাকৃত হালকা থেকে গেছে। আর তৃতীয় কাজটা করা রানার উচিত হয়নি, তবু কৌতূহলবশে করেছে সে—প্লেনে উঠবার সিঁড়ি দিয়ে মেয়েটা যখন শেষ ধাপ ডিঙাচ্ছে, সিঁড়ির গোড়ায় পা পিছলে হোঁচট খাওয়ার ভান করে শাড়ির নিচ দিয়ে দেখে নিয়েছে সে মেয়েটার পা যতদূর সম্ভব। হাঁটু পর্যন্ত কালো, তারপর ফর্সা।

আর কোন সন্দেহ নেই রানার মনে।

তাই দিল্লীতে ওকে নামতে দেখে নেমে এসে বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়েছে রানা। এখান থেকেই পালাবার মতলব আছে কিনা দেখতে হবে।

না। একটা মেসেজ দিয়েই ফিরে গেল মেয়েটা প্লেনে। এয়ার ইন্ডিয়া এই মেসেজ পাঠাবে ওদের বোম্বে অফিসে, সেখান থেকে টেলিফোনে জানিয়ে দেয়া হবে নির্দিষ্ট নম্বরে। নিখরচার এই সুবিধেটা গ্রহণ করছে মেয়েটা। সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে কাউকে আসতে বলছে হয়তো, কিংবা হয়তো...নাহ্, ঠিক কি মেসেজ পাঠানো হলো জানবার উপায় নেই যখন, খামোকা ভেবে

লাভ নেই। নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে রানার গতিবিধি লক্ষ করছে মেয়েটা এখন। কাজেই মেসেজের প্রতি কোনরকম কৌতূহল না দেখিয়ে বুকস্টল থেকে একটা ফিল্যাফ্রেয়ার এবং পাশের দোকান থেকে গলা-কাটা দামে একজোড়া হাতির দাঁতের কাফ-লিংক কিনে ফিরে এল প্লেনে। আবার উড়াল দিল উড়োজাহাজ।

সান্তাক্রুজে পৌঁছে বোকা বনে গেল রানা।

কাস্টমস চেকিঙের সময় চারজনের পিছনে পড়ে গেল সে। নিভারাণী দাশের লাগেজ নেই, শুধু একটা এয়ারব্যাগ। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করেই চক দিয়ে দাগ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে পরের জনের চারটে প্রকাণ্ড সুটকেস নিয়ে পড়ল কাস্টমস অফিসার। রানার পিছনে এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা তার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের ছটফটে চঞ্চল ছোট ভাইয়ের হাত চেপে ধরে আছে কখন কোন্‌দিকে হারিয়ে যায় সেই ভয়ে। ভাইটি রানার গায়ের কাছে সেঁটে এল।

'ভাগচে, স্যার। আমি পিছু নোব?'

'না!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। আলগোছে ল্যাগেজট্যাগটা ধরিয়ে দিল সালমার হাতে। 'এটা নিয়ে সোজা চলে যাও অ্যামব্যাসাডার হোটেলে। আমি দেখা করব পরে।'

লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এল রানা।

ট্যাক্সিতে উঠছে নিভারাণী।

দ্রুততর হলো রানার পদক্ষেপ।

গাড়ি বারান্দার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল রানা। হঠাৎ কোত্থেকে প্রকাণ্ড চেহারার এক নিগ্রো পাহাড়ের মত পথ আগলে দাঁড়াল। প্রায় সাত ফুট মত লম্বা হবে, প্রস্থেও প্রকাণ্ড, তেমনি পেটা শরীর। পাশ কাটাবার চেষ্টা করল রানা, সে-ও চট করে সরে সামনে দাঁড়াল।

'ম্যাচ হবে আপনার কাছে, মিস্টার?'

ভয়ানক কর্কশ গলা, কিন্তু পরিষ্কার হিন্দী উচ্চারণ।

রানা ভেবে দেখল, হয় আগুন দিতে হবে, নয় তো একটা সীন ক্রিয়েট করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই দেরি হয়ে যাবে। মেয়েটার ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কদ্দূর যাবে? শহর এখান থেকে বারো-চোদ্দ মাইল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দশটা টাকা বকশিশ দিলে কোন অসুবিধে হবে না আগের ট্যাক্সিকে ধরতে।

পকেট থেকে লাইটার বের করে নিগ্রোটার পুরু ঠোঁটে ধরা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিল রানা।

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' সরে দাঁড়াল পাহাড়। 'আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

কোন জবাব না দিয়ে দ্রুত পায়ে গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াল রানা। একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এল। শিখ ড্রাইভার। ঝট করে দরজা খুলে উঠে বসল রানা পিছনের সীটে।

'চালাও। জলদি!'

একবার পিছন ফিরে রানাকে দেখে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

এয়ারপোর্ট এরিয়া থেকে বেরিয়ে এসেই একটা দশ টাকার নোট ধরল রানা ড্রাইভারের নাকের সামনে।

'বকশিশ। আরও জোরে চালাও।'

টাকাটা বুক পকেটে পুরে স্পীড বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। কিন্তু ঠিক তিন মাইল গিয়েই গাড়ির গতি কমতে শুরু করল। বার কয়েক ঝাঁকি খেল গাড়িটা, তারপর থেমে দাঁড়াল রাস্তার উপর বেকায়দা ভঙ্গিতে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইঞ্জিনে গোলমাল,' বলে নেমে গিয়ে বনেট খুলল ড্রাইভার।

একটুকরো তিক্ত হাসি খেলে গেল রানার ঠোঁটে। রানা নিজে পাকা ড্রাইভার না হলে এ কথা মেনে নিতে পারত। কোন্‌টা ইঞ্জিনের ঝাঁকুনি, আর কোন্‌টা সুইচ অফ করে ইঞ্জিন থামিয়ে ক্লাচ টিপে গিয়ার ডাউন করে ক্লাচ ছাড়ার ঝাঁকুনি, বুঝবার মত জ্ঞান রানার আছে। কিন্তু একটি কথাও বলল না সে।

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, জামানের চালাকিতে কোন কাজ হয়নি, ঠিকই চিনেছিল মেয়েটা ওকে। নিগ্রোটার আগুন চাওয়ার উদ্দেশ্য ওকে দেরি করিয়ে দেয়া নয়, চিনিয়ে দেয়া। নির্ধারিত ট্যাক্সি ড্রাইভারকে চিনিয়ে দেয়া হলো কোন্‌ আরোহীকে তুলতে হবে। সালমা এবং গিলটি মিঞাকেও কি চিনে ফেলেছে ওরা?

চার-পাঁচটা ট্যাক্সি চলে গেল পাশ কাটিয়ে। এখনও কুঁজো হয়ে এটা ওটা ঘাঁটাঘাঁটি করছে ড্রাইভার ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে এল আরেকটা ট্যাক্সি। তাতে ঘাড় গুঁজে বসে আছে সেই নিগ্রোটা। সোজা করলে ছাতে গিয়ে ঠেকত ওর মাথা। রানার দিকে চেয়ে ঝকঝকে দাঁত বের করে একটু হাসল লোকটা, চলে গেল পাশ কাটিয়ে। পাঁচ মিনিট পর সালমাদের গাড়িটাও পার হয়ে গেল। গাড়ি থেকে মুখ বের করেছিল গিলটি মিঞা, হয়তো থামত, কিন্তু রানার আবছা ইঙ্গিতে ঝট করে সোজা হয়ে বসল, সাঁ করে চলে গেল গাড়িটা।

আর আধ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল গাড়ি। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে শিখ ড্রাইভার চালু করল ইঞ্জিন। আবার ছুটল গাড়ি।

গাড়ির চেয়ে তিনগুণ বেশি স্পীডে চিন্তা চলেছে রানার মাথায়।

তাজমহল হোটেলে নামল রানা। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল ম্যানেজারের ঘরে। বিলেত থেকে গোল্ড মেডেল নিয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাস করা ডাকসেটে অজয় বড়াল।

'আমার নাম আসফ খান। গোঁফ আর চশমা খুললে আমি মাসুদ রানা।' হাসল রানা। 'ঘাবড়াস্‌ না, ছদ্মবেশে আছি।'

পরিচয় জেনেই হৈ-চৈ বাধাবার চেষ্টা করেছিল ম্যানেজার বড়াল, রানার মুখ থেকে জঘন্য একটা গালি বেরোতেই একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আরও গোটা বিশেক গালি মুখস্থ বলে গেল রানা। অবাক হয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত

দেখল রানাকে সে।

'কি রে শালা, হয়েছেটা কি? ঢুকেই মেশিনগান চালু করে দিলি কেন?' জিজ্ঞেস করল বড়াল।

'করব না,' বসে পড়ল রানা সামনের চেয়ারে। 'কেন এসেছি, কি চাই, কিছু না শুনেই হাঁকডাক শুরু করেছিস কিসের জন্যে?' সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল রানা। 'নে, সিগারেট খা।'

'এইমাত্র পৌঁছলি?' জিজ্ঞেস করল বড়াল। 'লাগেজ কোথায়?'

'তোদের এই পচা হোটেলে উঠছি না।'

'আঙ্গুর ফল টক, না?' হাসল বড়াল। 'তোর কাছে ভাড়া চাইছে কে? খাই খরচাও ফ্রী। যতদিন খুশি বেড়িয়ে যা, দেশে গিয়ে গল্প করতে পারবি বোম্বের সেরা হোটেলে উঠেছিলি।'

'হয়েছে, আর বড়াই করতে হবে না। এখন চুপ করে শোন। জরুরী কথা।'

'বল্। প্রথম শোনা যাক কি খাবি। হুইস্কি, না…' রানা চোখ পাকাতেই থেমে গেল।

'একটা ব্ল্যাকমেইলিং র‍্যাকেটের পিছু ধাওয়া করে এসেছি এখানে। কিন্তু পৌঁছেই টের পাচ্ছি লোক লেগে গেছে আমারই পিছনে।'

'ব্ল্যাকমেইলিং র‍্যাকেট?' কয়েকটা ভাঁজ পড়ল বড়ালের কপালে।

'হ্যাঁ। ব্ল্যাক স্পাইডার।' অবাক হয়ে গেল রানা ম্যানেজারের মুখ দেখে। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ।

'নামটা জানিস দেখা যাচ্ছে? তোদের উপার্জনেও কিছু ভাগ বসিয়েছে নাকি?'

কালো হয়ে গেল বড়ালের মুখটা। এক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল চোখ বন্ধ করে। ভাবল। তারপর চোখ রাখল রানার মুখে।

'কি সাহায্য চাই, দোস্ত?'

'আমি দু'চারদিন গা ঢাকা দিতে চাই। তোদের হোটেলে রুম নেব, খাতায় নাম থাকবে আমার, কিন্তু আমি থাকব অন্যখানে। সম্ভব?'

'সম্ভব। তবে একটা ফর্মে তোর একখানা সিগনেচার লাগবে।'

'তুই সই করে দিলেও চলবে। আসফ খানের নামে সই করে দিস। আমার একটু তাড়া আছে, আমি উঠি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'কি রে? ও রকম বাঁদরচড়ানো চেহারা হয়েছে কেন? ভয় পেয়েছিস?'

'যে নামটা উচ্চারণ করেছিস তাকে ভয় না পাওয়াটা বোকার কাজ। তার পিছু ধাওয়া করাটা উন্মাদের কাজ। আমাদের মত সাধারণ মানুষের ভাগ্য ভাল, দু'একজন বদ্ধ পাগল আছে এখনও দুনিয়ায়। গো অ্যাহেড, মাই ফ্রেন্ড। এনিথিং মোর? তুই জানিস, আমার সাধ্যমত সাহায্য করব আমি। কিন্তু গোপনে।'

'আপাতত আর কোন সাহায্য লাগবে না। থ্যাংক ইউ। চলি, দেখা হবে।'

ফারবেস স্ট্রীটের মারকারী ট্রাভেলস্ থেকে একখানা সাদামাটা চেহারার সিক্সটি-নাইন মডেল ইসুযু বেলেট আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে ভাড়া নিয়ে ছুটল রানা অ্যামব্যাসাডার হোটেলের দিকে। রানার অপেক্ষায় বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল গিলটি মিঞা।

'তোমাদের কেউ অনুসরণ করেছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, স্যার।' বলল গিলটি মিঞা। 'সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'ঠিক আছে, তাহলে এই হোটেলেই থাকো তোমরা। আমি জুহু বীচে একটা বাংলো ভাড়া করতে যাচ্ছি। আজ রাতে আর কোন কাজ নয়। কাল সকাল থেকে শুরু হবে আমাদের কাজ। আমি টেলিফোন করব।'

সুটকেসটা গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। শহর থেকে চব্বিশ কিলোমিটার উত্তরে পাম গাছে ছাওয়া অপূর্ব জুহু বীচ। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা আড়ালে একটা টিলার মাথায় ছোট এক বাংলো ভাড়া করল রানা। দুটো বেড রুম, একটা ড্রইং কাম ডাইনিং রুম—ফার্নিশ্‌ড্। বাড়িটার চারপাশে বেশ অনেকটা জায়গা। নানান জাতের ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে এক-আধটা ফলের গাছ সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বাংলোটার।

এত রাতেও জমজমাট জুহু বীচ। অসংখ্য হোটেল রেস্তোরাঁয় ব্যস্ততা, ভিড়। বাংলোতে সুটকেস রেখে মিনিট বিশেক পায়ে হেঁটে চলে এল রানা বীচে। দেশী-বিদেশী হরেক রকম মানুষ শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে, জোড়ায় জোড়ায়। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে সাপার সেরে নিল রানা। ইচ্ছে ছিল খানিক সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বাংলোয় ফিরে লম্বা ঘুম দেবে, কিন্তু পাঁচ মিনিটেই মত পরিবর্তন করল সুন্দরী মেয়ে এবং দালালদের অত্যাচারে। রানার একাকীত্ব সহ্য হচ্ছে না ওদের, কানের কাছে ফিস ফিস করে মন্ত্রণা দিচ্ছে।

বাংলোতে ফিরে ফোন করল রানা অ্যামব্যাসাডার হোটেলে। নিজের ঠিকানা দিল সালমাকে। ঠিক হলো কাল সকাল আটটায় দেখা হবে ওদের গ্র্যান্ট আর ডানক্যান রোডের ক্রসিং-এ। ওখানেই ঠিক হবে পরবর্তী প্ল্যান।

ঝড়ের আগে যেমন হয়, তেমনি একটা থমথমে ভাব নিয়ে চোখ বুজল রানা বিছানায়।

নিজেদের মধ্যে তিন ভাগে ভাগ করে নিল ওরা বোম্বে শহরটাকে।

পঞ্চাশ লক্ষ লোকের বাস এই প্রকাণ্ড কসমোপলিটান শহরে। এখানে কাউকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এই অসাধ্যই সাধন করতে হবে ওদের। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তিনজন তিনদিকে খুঁজবে। রানা খুঁজবে সেই আরতি আর নিগ্রোটাকে, গিলটি মিঞা আর সালমা খুঁজবে শুধু নিগ্রোকে।

সালমা শুরু করল ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস থেকে। চিড়িয়াখানা দেখল, মহানন্দে উটের পিঠে চড়ে বাচ্চারা মজা করছে; আরও খানিক হেঁটে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়াম দেখল, যাদুঘরের পুবে এলিফ্যান্টা কেভ থেকে তুলে আনা প্রকাণ্ড পাথরের হাতিটা দেখল; তারপর পারেল রোড ধরে

ছুটল গেট অভ ইন্ডিয়ার দিকে। মহাত্মা গান্ধী রোডে ভিড় বেশি। সবার দিকে ভালমত নজর করে দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু যতদূর-সম্ভব চারদিকে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে সে। অ্যাপোলো বান্দারের মার্বল আর্চ দেখে মুগ্ধ হলো সালমা। বইয়ে পড়েছিল ১৯১১ সালে তৈরি হয়েছিল এটা সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরির সম্মানে। খানিক হেঁটে চলে এল সে প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌ মিউজিয়ামে। নীল আর হলুদ ব্যাসাল্টের রাজকীয় কারুকাজ। টাটার কল্যাণে মুঘল স্কুলের কিছু অপূর্ব পেইন্টিং স্থানে পেয়েছে এখানে, চায়নিজ জেড ও পোরসেলিনের কিছু চমৎকার নমুনা রয়েছে। জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিটাও একপাক ঘুরে দেখল সালমা। একটা ফটোগ্রাফিক একজিবিশন চলছে এখন ওখানে। বোম্বে ইউনিভারসিটি, রাজাবাই টাওয়ার, এলফিনস্টোন কলেজ আর ইনসটিটিউট অভ সায়েন্স বিল্ডিং-এ এক পাক ঘুরে রওনা হলো দক্ষিণ-পুব দিকে। বিখ্যাত কেভ দেখতে যাবে ও এখন। ছোট্ট একটা দ্বীপে এলিফ্যান্টা কেভ, তীর থেকে সাড়ে নয় কিলোমিটার দূরে। নিয়মিত লঞ্চ সার্ভিস রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আশ্চর্য শিল্প নিদর্শন। একে একে পাঁচটা গুহা দেখল সালমা, শুধু মূর্তি আর প্যানেলই নয়, দর্শনার্থীদের প্রত্যেককে দেখল সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। উনিশ ফুট উঁচু তিন মাথাওয়ালা প্রকাণ্ড ত্রিমূর্তি তৈরি করা হয়েছে আস্ত একটা পাথর কেটে। অবাক হয়ে দেখল সেটা।

বেলা পড়ে আসছে। ফিরে চলল সালমা। সন্ধের সময় তিনজনের মিলিত হওয়ার কথা পারসি টাওয়ার অভ সাইলেন্সের কাছে। লঞ্চে করে ফিরে এল সে ডাঙায়। ট্যাক্সিতে বসে আজকের সারাটা দিন কি কি করেছে তার একটা হিসেব করতে গিয়ে হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল সালমা। কি করেছে ও সারাটা দিন? একটার পর একটা দর্শনীয় বস্তু দেখেছে সে বোম্বের, আসল কাজের কিছুই হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। স্পষ্ট বুঝতে পারল সালমা, কাজের ভার দেয়ার ছলে রানা ওকে বেড়াবার সুযোগ দিয়েছে আসলে। ওসব জায়গায় মরতে যাবে কেন নিগ্রো ব্যাটা? অথচ সারাটা দিন যেন কত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে, এমনি ভঙ্গিতে ব্যস্তপায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে সে।

হঠাৎ কান্না পেল ওর। ভয়ানক রাগ হলো রানার উপর।

গিলটি মিঞার কপালে পড়েছে ক্রফোর্ড মার্কেট আর জাভেরি বাজার।

ফুল থেকে শুরু করে মাংস, মাছ, শুঁটকী, ফল, তরিতরকারি এবং আলপিন থেকে শুরু করে আনকোরা নতুন ট্রাকটর পর্যন্ত পাওয়া যায় ক্রফোর্ড মার্কেটে। চরকির মত ঘুরেছে বেচারা সারাটা দিন। সারাটা বাজার লোকে লোকারণ্য। এ গলি থেকে ও গলি, ও গলি থেকে সে গলি খুঁজেছে সে নিগ্রোটাকে, ঠিক যেমন ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর। হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে জুয়েলারি মার্কেট জাভেরি বাজারে। ঝকঝকে সব দোকান, তেমনি ভিড় ক্রেতার। আর একটু এগোলে টেক্সটাইলের হোলসেল আর রিটেল মার্কেট। এই পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেছে সে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেইখানে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল—সাঁঝ হয় হয়।

ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠল গিলটি মিঞা। হ্যাৎতেরি বলে উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে।

কুইনস রোড ধরে ছুটছিল ট্যাক্সি, খানিক বাদে পড়বে ম্যারিন ড্রাইভে, তারপর ছুটবে পারসি টাওয়ার অভ সাইলেন্সের দিকে—এমনি সময়ে ভয়ানক ভাবে চমকে গেল গিলটি মিঞা। একটা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসেছে কালকের সেই নিগ্রোটা। লম্বা পা ফেলে হাঁটছে সোজা উত্তর দিকে।

'থামাও! রোকো ট্যাক্সি। এইখানেই নামেগা।' চিৎকার করে উঠল গিলটি মিঞা।

ব্যস্ত রাজপথে সিগন্যাল দেখিয়ে গাড়ি সাইড করে রাখতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল। নেমেই ছুটতে যাচ্ছিল গিলটি মিঞা। নিগ্রোটা যে পথে গেছে সেই পথে, কিন্তু খপ করে ধরে ফেলল ওকে ট্যাক্সি ড্রাইভার।

'ওহ্-হো! ভাড়া নাহি দিয়া? নেও বাবা, ভাঙতিটা তুমারা বকশিশ।' ঝট করে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোল গিলটি মিঞা।

কয়েক সেকেন্ড আগেও রাস্তার আর সব লোকের মাথার উপরে নিগ্রোটার কাঁধ আর মাথা দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না। আশেপাশের কোন গলিতে ঢুকেছে মনে করে এগোল গিলটি মিঞা। পর পর ডাইনে আর বাঁয়ে ছ'টা গলি এবং সেসব গলির উপগলি পরীক্ষা করল সে। রাস্তার পাশের প্রত্যেকটা দোকান দেখল ভাল মত নজর করে। লাভ হলো না কিছুই। ঠিক যেন কর্পূরের মত উবে গেছে নিগ্রোটা।

তবু হাল ছাড়ল না গিলটি মিঞা। ফিরে এল আবার কুইনস রোডে। যে রেস্তোরাঁ থেকে নিগ্রোটাকে বেরোতে দেখেছে তার সামনে এসে হাজির হলো। এক চোখ বন্ধ করে চিন্তা করল দুই সেকেন্ড, তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে। কাউন্টারের ওপাশে বসা লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, আপনি বলতে পারতা হ্যায়, এক নিগ্রো সায়েবকা এখেনে আসার কতা ছিল। আমার একটু লেট হো গিয়া। তিনি কোতায় থাকতা হ্যায়?'

কথার মানে ঠিকই বুঝে নিল লোকটা। মৃদু হেসে বলল, 'কাল আইয়ে। ছও বাজে।'

'একোন ওকে কাঁহা পায়ে গা?'

'মালুম ন্যহি, বাবু।' ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে পর পর তিন বেয়ারার কাছ থেকে বিল সংগ্রহ করতে।

দ্রুত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল গিলটি মিঞা, এখানে আর কিছু জানা যাবে না, কাজেই সময় নষ্ট না করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পৌছনো দরকার পারসি টাওয়ারে। তবু আর একটু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'কাল ছ'টার সোমায় পাওয়া যায়গা? ঠিক?'

'হ্যাঁ জ্বি, ঠিক।' বিরক্ত দৃষ্টিতে একবার গিলটি মিঞার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল লোকটা নিজের কাজে।

লঘু পদক্ষেপে বেরিয়ে এল গিলটি মিঞা রাস্তায়।
কিছুটা তো এগিয়েছে কাজ!

দুপুর দুটো পর্যন্ত চষে ফেলল রানা বোম্বের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলটা।

ডানক্যান রোড থেকে গিয়ে পড়ল রিপন স্ট্রীটে, সেখান থেকে হাইনস্ রোড, তারপর হর্নবি ভেলার্ড, পেডার রোড, গোভালিয়া ট্যাংক রোড, হাফস্ রোড, সর্দার প্যাটেল রোড, মোহাম্মদ আলী রোড, আবার ডানদিকে ঘুরে গিরগাউম রোড, ল্যামিংটন রোড, ফকল্যান্ড রোড, ফোরাস রোড, বেলাসিস রোড, রিজ রোড, তারপর আবার পশ্চিমে এগিয়ে নেপিয়ান সি রোড, সেখান থেকে ওয়ার্ডেন রোড।

কম করে হলেও লাখ পাঁচেক লোক দেখেছে রানা রাস্তায়, মহিলাও দেখেছে লাখখানেক। কিন্তু সেই নিগ্রো বা মেয়েটার ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়েনি। মহালক্ষ্মী মন্দিরের কাছে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে লাঞ্চ সেরে মিনিট বিশেক জিরিয়ে নিল সে। বুঝতে পারল নেহাত কাজের ঠেকা না থাকলে ওরা বেরোবে না এই দুপুরে ঘর ছেড়ে। তবু চেষ্টার ক্রটি রাখলে চলবে না। কোন কাজে হয়তো বেরোতেও পারে।

বিখ্যাত মহালক্ষ্মী মন্দিরটা দেখল রানা ঘুরে ফিরে। অর্থ ও প্রাচুর্যের আশায় হন্যে হয়ে ছুটে আসছে হাজার হাজার নারী-পুরুষ এই মন্দিরে। আবার গাড়িতে উঠল রানা। হাজী আলির মাযার দেখল, একটা ছোট্ট দ্বীপের মত মসজিদ দেখল—জোয়ারের সময় প্রবেশপথ ডুবে যায় পানির নিচে, রেসকোর্সে খানিকক্ষণ রেস দেখল, তারপর কাম্বালা এবং মালাবার হিলের গায়ে বোম্বের ধনী চূড়ামণিদের মনোরম বাড়িগুলো দেখতে দেখতে এসে হাজির হলো ফিরোজ শাহ মেহ্তা (হ্যাংগিং) গার্ডেনে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চৌপাতি বীচ, তার ওদিকে ম্যারিন ড্রাইভের জনারণ্য।

সন্ধে হয়ে আসতেই প্রায় একসাথে জ্বলে উঠল ম্যারিন ড্রাইভের সব ক'টা বাতি। অবাক হয়ে রানা ভাবল, খামোকা রাত্রির ম্যারিন ড্রাইভকে 'দা কুইন্‌স্ নেকলেস' বলে না। প্রকাণ্ড এক মালা তৈরি হয়েছে আলো দিয়ে।

গাড়িটা পাহাড়ের নিচে রেখে এসেছে রানা, অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে নিচে। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল সে। কিছুদূর নেমেই থমকে দাঁড়াল রানা। সেই মেয়েটা!

ল্যাম্পপোস্টের আলো গোল হয়ে রাস্তার কিছুটা অংশ আলোকিত করেছে, বাকি অংশ অন্ধকার। পঞ্চাশ ফুট নিচে আলোকিত অংশ মাড়িয়ে চলে গেল মেয়েটা। নিচে নামছে সে-ও। দ্রুতপায়ে নামতে শুরু করল রানা। আরেকটা ল্যাম্পপোস্টের নিচু দিয়ে পেরিয়ে গেল মেয়েটা। আরও দ্রুত নামছে রানা এখন। তৃতীয়বার যখন দেখা গেল মেয়েটাকে তখন ওর চলার গতিও দ্রুততর হয়েছে, লক্ষ করল রানা। দেখে ফেলেছে ওকে?

নিশ্চয়ই তাই। নিচে নামতে হলে ল্যাম্পপোস্টের নিচ দিয়ে যেতেই হবে। দেখে ফেলেছে। প্রায় ছুটতে শুরু করল রানা এবার। আবছা ভাবে একটা

গাড়ি দেখতে পেল সে দূরে। মেয়েটা ওই দিকেই এগোচ্ছে। দৌড় শুরু করতে যাবে, এমনি সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন গুণ্ডা কিসিমের লোক। রানার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল একজন, 'ম্যাচ হবে আপনার কাছে, মিস্টার?'

পাশ কাটাবার চেষ্টা করে বিফল হলো রানা। রানা যেদিকে সরে, লোকটাও সেদিকেই সরে। থুতনি সই করে দ্রামসে একটা লাগিয়ে দেবে কিনা ভাবল রানা। নাহ্, তাতে লাভ হবে বলে মনে হলো না ওর। দু'জনকে সামলে উঠতে সময় লাগবে। ওদিকে গাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মেয়েটা।

তিন সেকেন্ডের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো রানাকে। বর্তমান অবস্থায় হাল ছেড়ে দেয়াই স্থির করল সে। পকেট থেকে লাইটারটা বের করে ক্লিক করে জ্বালল। মাথাটা নিচু করে ধরিয়ে নিল লোকটা সিগারেট। দ্রাভিড়িয়ান তামাটে মুখে ওর চোখ দুটো অতিরিক্ত সাদা মনে হলো রানার লাইটারের কাঁপা আলোয়।

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' সরে দাঁড়াল লোকটা পথ ছেড়ে। 'আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল লোক দু'জন।

পুনরাবৃত্তি!—ভাবল রানা। ঠিক একই ঘটনা ঘটল পর পর দু'বার। খেলানো হচ্ছে ওকে? ওরা কি চায় অনুসরণ করুক রানা? কাকে অনুসরণ করবে? ওদের পিছু নিয়ে লাভ আছে বলে মনে হলো না ওর। আর···আরতির গাড়িটাকে অনুসরণ করা বৃথা—বুঝে নিয়েছে সে। ধীরপায়ে নেমে এল সে নিচে। গাড়িতে উঠে রওনা হলো পারসি টাওয়ার অভ সাইলেন্সের দিকে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে সালমা ও গিলটি মিঞা।

নয়

হোটেল ছেড়ে জুহু বীচের বাংলোয় উঠে এসেছে সালমা ও গিলটি মিঞা।

সালমা পৌঁছবার আধঘণ্টার মধ্যে ভোল পাল্টে গেল বাংলোটার। কর্কশ পুরুষালী ভাবটা দূর হয়ে গিয়ে মোলায়েম এক শান্তির নীড় হয়ে উঠল যেন বাড়িটা। কিছু না, কয়েকটা জিনিসের সামান্য স্থান পরিবর্তন, কিচেন থেকে কফির গন্ধ, চুড়ির রিনঠিন, আর ঝাড়ুর খড়খড়ে আওয়াজ, সেই সঙ্গে গিলটি মিঞার অনর্গল গল্প আর হাসি, সে হাসির সাথে যোগ দিচ্ছে মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের হাসি আর ধমক। ব্যস, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে পুরো বাংলো।

রাতে বাইরে খেয়ে নিয়েছে ওরা, কিন্তু সকালে আর নাস্তার জন্যে বাইরে যেতে রাজি হলো না সালমা। গিলটি মিঞাকে দিয়ে পাঁউরুটি, মাখন, ডিম, ইত্যাদি আনিয়ে নিয়ে বাড়িতেই ব্যবস্থা করল সব। নাস্তার পর গোটা দুই

সিগারেট ধ্বংস করে হাঁক ছেড়ে ডাকল রানা ওদের দু'জনকে।
কফির কাপ হাতে এসে দাঁড়াল সালমা।
'ডাকছেন, স্যার?'
'এখানে আবার "স্যার" কেন, সালমা? বাইরের কেউ তো নেই। নিজেকে খামোকা কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বকাঝকা না করলে তোমার পেটের ভাত হজম হবে কি করে?'
হাসল সালমা, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'এখানে আমরা সবাই কাজের উপলক্ষ্যে এসেছি, স্যার। লীডারের ওপর ভক্তি না থাকলে ডুবব সবাই।' কাপটা রানার সামনে নামিয়ে দিল সালমা।
'ঠিক আছে, কাজের কথাই হোক তাহলে। বস। গিলটি মিঞা কোথায়?'
'আসচি, স্যার। এক মিলিট।' রান্নাঘর থেকে ভেসে এল গিলটি মিঞার কণ্ঠস্বর।
এক মিনিট পর বসল কনফারেন্স।
ঠিক হলো, সারাদিন আর কোথাও খুঁজবে না ওরা। বিকেল পাঁচটায় রানা যাবে কুইনস্ রোডের সেই রেস্তোরাঁয়, নিগ্রোটা সম্পর্কে যতখানি পারা যায় তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে। তারপর কমলা নেহেরু পার্ক আর হ্যাংগিং গার্ডেনে ঘুরঘুর করবে সেই মেয়েটার সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার আশায়। সালমা আর গিলটি মিঞা পোনে ছ'টার দিকে হাজির হবে ওই রেস্তোরাঁয়। ভিতরে গিয়ে চা বা আইসক্রীম, যা হোক কিছু নিয়ে অপেক্ষা করবে সালমা, আর গিলটি মিঞা নজর রাখবে বাইরে থেকে। ওখান থেকে বেরিয়ে নিগ্রোটা কোথায় যায়, কি করে অলক্ষ্যে থেকে লক্ষ্য করাই ওদের দু'জনের কাজ। আস্তানাটা বের করতে হবে।
সবশেষে দুটো টেলিফোন নাম্বার দিল রানা ওদের।
'এই নম্বর দুটো রাখো। যদি দেখো পুলিসের সাহায্য দরকার, তাহলে ঢাকায় ট্রাংকল করে জানাবে আখতারুজ্জামান সাহেবকে। আর···' একটু ইতস্তত করল রানা। 'যদি আমি মারা যাই এবং আমার মৃত্যুর পর তোমরা বিপদে পড়ো, যদি ভয়ানক কোন ইমার্জেন্সি হয়, যদি দেখো অবস্থা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে, একেবারে শেষ অবস্থা, তাহলে এই দ্বিতীয় নম্বরে শুধু একটা মেসেজ দেবে—মাসুদ রানা ইজ ডেড, উই আর ইন ডেঞ্জার। তারপর এই বাংলোর ঠিকানা দেবে। আর কিছু করতে হবে না।'
'এটা কার টেলিফোন নম্বর, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সালমা।
'আমার এক বান্ধবীর।' অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বলল রানা। 'মনে রেখো একস্ট্রিম কিছু না হলে ওই নম্বরে ফোন করবে না। ওটা একেবারে লাস্ট রিসোর্ট।'
'ও. কে., স্যার।' খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু সারাটা দিন কি করা যায়?'
'আমি যাব ভারসোভা বীচে সাঁতার কাটতে। নির্জন বীচ। সুইমিং

কস্টিউম সাথে থাকলে তুমিও আসতে পারো। গিলটি মিঞা যাবে নাকি?'

'আমি সাঁতার জানি যে সমুদ্দুরে নামব? ওরেব্বাপ, ভাবতেই তো কলজেটা শুকিয়ে আসতে চায়! তারচে ইসপেশাল শোতে ববি দেকব। সালমা দি' কি করবেন?'

'আমিও ববি দেখব। বোম্বে পর্যন্ত এসে এটা না দেখে ফিরলে কান ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে আমার ভাবী। শুধু দেখলে হবে না, পুরো গল্পটা বলতে হবে বাড়ি ফিরে।'

'ঠিক হ্যায়। জিসকো যো মরযি।' উঠে পড়ল রানা।

বেরোবার আগে আর একবার ফোন করল রানা তাজমহল হোটেলে। জানা গেল আজ সকালেও একজন লোক এসে খোঁজ নিয়েছে আসফ খান এখনও আছে, না চলে গেছে। ঘরেই আছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে।

বেরিয়ে পড়ল রানা।

ঠিক পাঁচটায় পৌঁছল রানা কে ডাবলিউ দিয়ে লেখা কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয়। কোণের একটা টেবিলে বসে কাটলেটের অর্ডার দিল।

একজোড়া কাটলেট, সেই সাথে পাতলা করে কাটা দু'টুকরো পাঁউরুটি আর সালাদ, সস, লবণ, গোল মরিচের শিশি সাজিয়ে দিচ্ছে বেয়ারা দক্ষ হাতে।

'নিগ্রো লোকটা এল না আজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ও তো ঠিক ছয়টার সময় আসে,' বলল বেয়ারাটা। 'পুরো একসের হাঁড়ি কাবাব খায় চারটে পরোটা দিয়ে।'

'রোজ?'

'রোজ। আর কি দেব, স্যার, আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল বেয়ারা। 'চা, কফি, না কোল্ড ড্রিংক?'

পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে বেয়ারার হাতে গুঁজে দিল রানা। 'চা দিয়ো, কিন্তু তার আগে এক প্যাকেট ইন্ডিয়া কিং নিয়ে এসো। এ থেকে যা বাঁচবে, তোমার বকশিশ। আর হ্যাঁ, এক গ্লাস জল দিয়ে যেও।'

পানির জন্যে একটা ছোকরাকে হুকুম দিয়ে বেরিয়ে গেল বেয়ারা, ফিরে এল দুই মিনিটের মধ্যে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে বকশিশের পরিমাণটা পছন্দ হয়েছে। সেলোফিনের খোলস ছাড়িয়ে টেবিলের উপর রাখল প্যাকেটটা।

'থাকে কোথায় লোকটা?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করে কাঁটা বিঁধিয়ে খানিকটা কাটলেট মুখে তুলল রানা। তারপর চাইল বেয়ারার মুখের দিকে।

'কোন্ লোকটা, স্যার?'

'ওই নিগ্রোটার কথা জিজ্ঞেস করছি। কোথায় থাকে?'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল বেয়ারা। একটু ইতস্তত করে বলল, 'জানি না, স্যার।'

'রোজ আসে লোকটা, কোনদিন জিজ্ঞেস করোনি কোথায় থাকে, কি করে? আশ্চর্য তো! ওর পরিচয় জানবার চেষ্টাই করোনি, এটা কেমন কথা?'

বেয়ারার দু'চোখে ভীতি দেখতে পেল রানা এবার। আমতা আমতা করে বলল, 'আমি কিছুই জানি না, স্যার। ম্যানেজার সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। উনি জানেন।' ত্রস্ত ভঙ্গিতে পালিয়ে বাঁচল সে রানার সামনে থেকে।

চা শেষ করে বিল হাতে কাউন্টারে এসে দাঁড়াল রানা ম্যানেজারের সামনে। কিন্তু রানার প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল ম্যানেজার।

'কই, না তো! কত লোকেই তো আসে যায়, কোন নিগ্রোর কথা তো খেয়াল পড়ছে না।'

'রোজ ছ'টার সময় যার জন্যে একসের হাঁড়ি কাবাব রেডি রাখতে হয়, তাকে খেয়ালই পড়ছে না আপনার?' নিদারুণ বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গি করল রানা। 'প্রকাণ্ড চেহারার এক নিগ্রো, যাকে একবার দেখেই ভুলতে পারছি না আমি, তাকে রোজ দেখেও মনে রাখতে পারছেন না আপনি–এটা কেমন কথা বলুন তো? নাকি আর কোন ব্যাপার আছে?'

'আর কোন ব্যাপার নেই, মিস্টার,' একটু যেন কঠোর শোনাল ম্যানেজারের কণ্ঠ। 'আধমন হাঁড়ি কাবাব তৈরি হয় রোজ, কম করে হলেও আড়াই হাজার খরিদ্দার আসে রোজ, তার মধ্যে কে কেমন দেখতে, আর কে কি খাচ্ছে মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ক্যাশ-ড্রয়ার টান দিয়ে খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ম্যানেজার। অর্থাৎ, এবার আপনি যেতে পারেন।

উপায়ান্তর না দেখে বেরিয়ে এল রানা।

গাড়িটা পার্ক করা আছে চৌপাতি বীচে। থাক। পায়ে হেঁটে এগোল সে পার্কের দিকে।

কাঁচের জানালা দিয়ে দেখল ম্যানেজার ফুটপাথের পদাতিকদের ভিড়ে মিশে গেল অনুসন্ধিৎসু লোকটা। বাম দিকে চলেছে। চট করে কাউন্টারের গদি আঁটা চেয়ার ছেড়ে নেমে পড়ল সে। ভিতরে যাওয়ার দরজাটা খুলে একটা সুদৃশ্য সুসজ্জিত ঘরে ঢুকল। একটা টেবিলের ওপাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে আরতি লাহিড়ী। মুখটা ফ্যাকাসে, বিবর্ণ।

'খুব সম্ভব এই লোকটাই অনুসরণ করেছিল আমাকে কাল রাতে!' আরতির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

আরতির ভয় সংক্রমিত হলো ম্যানেজারের মনেও। এগিয়ে এল কয়েক পা।

'পুলিসের লোক নাকি!' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাটা।

'বোকার মত কথা বোলো না, গোমেজ!' প্রায় ধমকে উঠল আরতি। 'পুলিসের চেহারা এ রকম হয়? ও তো দেখলেই চেনা যায়।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল সে। অনেকটা আপন মনেই বলে চলল, 'এ-ই বোধহয় ঢাকায় পিছু নিয়েছিল আমার। একই ফিগার। আসফ খান! নইলে

এখানে এসে ঝাংওর খোঁজ নিতে যাবে কেন? নিশ্চয়ই গোলমাল হয়ে গেছে কোথাও। এখন একমাত্র...'

আনমনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল আরতি। ডায়্যাল করল।

'কে, মহাবীর?...শোনো, তোমার একটা কাজ করতে হবে। এক্ষুণি। এক্ষুণি কোয়ালিটি রেস্তোরাঁ থেকে একজন লম্বা একহারা চেহারার লোক বেরিয়ে বাম দিকে এগিয়েছে পায়ে হেঁটে। বাঙালী, বয়স আটাশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, ভারী গোঁফ, চোখে চশমা, কাঁচাপাকা জুলফি। নীল একটা ট্রপিক্যালের স্যুট পরা, সাদা শার্ট, লাল-নীল-হলুদ স্ট্রাইপের টাই। ওর পিছু নিতে হবে। লোকটা কোথায় যায়, কোথায় থাকে, সাথে আর কেউ আছে কিনা, সব খবর নিতে হবে তোমার। জলদি। বিশ কদমও যায়নি লোকটা এখনও।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ব্যাগটা তুলে নিল আরতি টেবিলের উপর থেকে।

'ফিরে যাওয়া উচিত আমার।' সামান্য একটু কেঁপে গেল আরতির গলা। 'বুঝতে পারছি, ঘনিয়ে আসছে বিপদ। চিরঞ্জীব খোঁজ করলে বোলো, বাসায় ফিরে গেছি আমি।'

আরতির আতঙ্ক দেখে হিম হয়ে এল গোমেজের কলজেটা।

ভয়ানক কিছু ঘটতে চলেছে!

রাত আটটা।

বাসায় ফিরে এল রানা।

পার্কে ঘুরেছে সে অনেকক্ষণ, তারপর ঘুরেছে স্যার ফিরোজশাহ মেহতা গার্ডেনে। সন্ধে পর্যন্ত পায়চারি করে হতাশ হয়েছে সে। মেয়েটার দেখা পায়নি কোথাও। বাতি জ্বলে উঠেছে মেরিন ড্রাইভ আর কমলা নেহেরু পার্কে। প্রতি শনি ও রবিবারে অপরূপ আলোকসজ্জায় সাজানো হয় পার্কটাকে। সন্ধের পর আরও আধঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছে বাংলোয়। পাত্তা নেই সেই মেয়েটার।

মহাবীরের অস্তিত্ব টের পায়নি সে। ইস্ত্রিহীন বাদামী রঙের স্যুট পরা একজন মোটাসোটা বেঁটে লোককে দেখেছে রানা, কিন্তু সন্দেহ করতে পারেনি যে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ত্রিশ গজ যেতে না যেতেই ছায়ার মত পিছু লেগে গেছে লোকটা ওর। চৌপাতি বীচে পার্ক করে রাখা গাড়িতে উঠে ও যখন ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে, লোকটা তখন পাগলের মত এপাশ ওপাশ ট্যাক্সি খুঁজেছে, হাতের কাছে ট্যাক্সি না পেয়ে রানাকে চলে যেতে দেখে দিশেহারার মত ছটফট করেছে, বাপ-মা তুলে গাল দিয়েছে–সেসবের কিছুই টের পায়নি সে। হয়তো গিলটি মিঞার কাছে নতুন কোন খবর পাওয়া যেতে পারে মনে করে ঝড়ের বেগে এসে হাজির হয়েছে সে জুহু বীচে।

গাড়িটা থামতে না থামতেই দড়াম করে খুলে গেল দরজা। হাসি মুখে অভ্যর্থনা করল গিলটি মিঞা। চেহারা দেখেই বুঝতে পারল রানা টাটকা খবর নিয়ে বসে আছে গিলটি মিঞা ওর অপেক্ষায়। সালমাকেও দেখা গেল। সে-ও ফিরেছে।

ড্রইং রুমে ঢুকতে না ঢুকতেই কথার তুবড়ি ছুটাতে গিয়েছিল গিলটি মিঞা, রানা থামিয়ে দিল।

'আগে সালমার রিপোর্ট শোনা যাক।'

জানা গেল, পোনে ছ'টায় গিয়ে পৌঁছেছিল সে কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয়। ঠিক ছ'টায় এসেছিল সেই নিগ্রো। সাথে সাথেই তাকে ভিতরের একটা কামরায় নিয়ে গেল ম্যানেজার, কি কথা হলো জানতে পারেনি সালমা, মিনিট তিনেক পরেই একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে রেস্তোরাঁয় এসে বসল প্রকাণ্ড নিগ্রোটা। বিরাট একটা পেয়ালায় সের খানেক কাবাব এনে দিল বেয়ারা, সেই সাথে গোটা কয়েক পরোটা। আশ্চর্য দ্রুতগতিতে গোগ্রাসে গিলল সেসব দৈত্যটা, খেতে খেতে প্রত্যেকটা খরিদ্দারের চেহারা লক্ষ করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বার কয়েক সালমার মুখের উপর এসে স্থির হলো ওর দৃষ্টি। হয়তো মনে পড়েছিল এই রকমই একটা চেহারা দেখেছিল সে পরশু রাতে এয়ারপোর্টে। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। খুব একটা কেয়ারও করল না। খাওয়া শেষ হতেই একটা নোংরা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ থেকে।

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল গিলটি মিঞা। এইবার ওর রিপোর্ট। ফাঁকা ময়দান পেয়ে মনের সুখে ঘোড়া ছুটাল সে।

'কাল যে রাস্তায় গায়েব হয়েচিল, সেই রাস্তাতেই ষাট-সত্তুর গজ এঁগিয়ে একটা থাম্বার মায়ে ঢেলান দিয়ে ডেঁড়িয়ে ছিলুম, স্যার। ওকে বেরোতে দেকেই ও যেদিকে চলেচে সেই দিকেই হাঁটতে আরম্ভ করলুম। মাজে মাজে ঘাড় কাৎ করে দেকি শালা আসে কিনা। ওফ্‌, একেবারে তুর্কি নাচ নাচিয়ে ছেড়েচে। একেকটা পা যে ফেলে, আমার তিন পায়ের সমান। তিন মিলিটেই ধরে লিল প্রায়। তারপর সাঁই করে ঢুকে গেল বাঁয়ের এক গলিতে। শটকাট করে উটল গিয়ে একেবারে তারদেও রোডে। হাঁটিয়ে মেরেচে শালা। ছ'সাত মাইলের কম না। ও হেঁটেচে, আমি খানটেক দৌড়েচি, আর খানটেক ভিক্টোরিয়া গাড়িতে (বোম্বের ঘোড়ার গাড়ি) চড়েছি। যকোন দেখি আর পারা যায় না, গাড়ি চড়ে একশো গজ এগিয়ে গিয়ে নেবে যাই। এইভাবে চলতে, চলতে, চলতে, চলতে একেবারে সেই ওয়ার্ডেন রোড! সন্দ্যে হয়ে গেচে অনেক আগেই, ঠিকমত ঠাহর করা যাচ্ছে না, শরীলেও আর দুব্বল পাচি না, এমন সোমায় হঠাৎ রাস্তার পাশে ডেঁড়িয়ে থাকা ওরই মত প্রকাণ্ড এক কালো গাড়িতে উটে একেবারে পগার পার।'

'হায়, হায়! কোনদিকে গেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সোজা দক্ষিণ দিকে।' একগাল হাসল গিলটি মিঞা। 'কিন্তুক, স্যার, আমি হাল ছাড়লুম না। একটা উঁচু জায়গায় উটে ডেঁড়িয়ে রইলুম, ওর পিচনের দুটো লাল বাতির দিকে চেয়ে। সোজা রাস্তা। আমি যেই মনে মনে

তিনশো তেত্রিশ শুনলাম, ওমনি শালা মোড় লিল বাঁয়ে। তিন মাইল হবে না, আমার আন্তাজ, আড়াই থেকে পোনে তিন মাইলের মদ্যেই বাঁয়ে মোড় লিয়েচে।'

'এত গাড়ি ঘোড়ার মধ্যে ঠিক ওটার ওপর নজর রাখতে পেরেছিলে?'

'খুবই কষ্ট হয়েচে, স্যার। কম করে হলেও পঞ্চাশটা গাড়ি চোক ধাঁদিয়ে দোয়ার চেষ্টা করেচে, আরও পঞ্চাশটা গাড়ির ব্যাকলাইট ডিসটাব করেচে, কোনটা ব্রেক চাপে, কোনটা ডাইনে বাঁয়ে কাটার সিগন্যাল দেয়—এক্কেবারে জ্বালিয়ে মেরেচে। কিন্তুক আমার নজর হিলাতে পারেনি।' চোখ পাকিয়ে দেখাল। 'একেবারে এইরকম করে...'

'গুড।' মৃদু হাসল রানা। 'এখন আবার চিনতে পারবে?'

'নিশ্চয়।'

'তোমাকে চিনে ফেলেনি তো? টের পায়নি?'

'অসম্ভব। টের পেলে দুই আংগুলে টিপে মেরে ফেলত না? ওরেব্বাপ। দেকেনি, স্যার।'

'ঠিক আছে। চলো, আগে হোটেল থেকে খেয়ে নিই তিনজন।'

'প্যাকেটে করে তিনজনের খাবার লিয়ে এসেচি, স্যার। বলেন তো গরম করে ফেলি।'

রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সালমা আর গিলটি মিঞা।

দশ

রাত দশটা।

'এইখেনটায় শালার গাড়িটা রাকা চিল, স্যার।'

ব্রেক কষল রানা। একটা লিভার চাপ দিয়ে সীটটা এগিয়ে দিল কয়েক ইঞ্চি। নেমে পড়ল।

'নাও, বাকি পথটুকু তুমি চালাও।'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল গিলটি মিঞা, সরে চলে এল ড্রাইভিং সীটে।

কয়েক মিনিট পর স্পীড কমল গাড়ির, হেড লাইটটা অফ করে দিল গিলটি মিঞা, বামদিকে মোড় নিল।

'এইটেই।'

'ঠিক আছে, এগিয়ে যাও।' বলল রানা।

সাইড লাইট জ্বেলে সিকি মাইল এগোবার পর ডানদিকে ঘুরল রাস্তা। ক্রমে উঁচু হচ্ছে রাস্তাটা। দু'পাশে ঝোপঝাড়, জঙ্গল।

'গাড়িটা এখেনেই রেকে দিলে কেমন হয়, স্যার?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিঞা।

'ঘুরিয়ে রাখো,' বলল রানা। 'ওই সামনে ঝোপের আড়ালে।'

গাড়িটা আড়াল করে রেখে পায়ে হেঁটে এগোল ওরা এবার। যাতে শব্দ না হয় সেজন্যে খোয়া বিছানো রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। জঙ্গলের ভিতরটা ঘন অন্ধকার, পাতার ফাঁক দিয়ে যেটুকু চাঁদের আলো আসছে তাতে পথ দেখার ব্যাপারে কোন সুবিধে হচ্ছে না, বরং ধোঁকা লাগছে চোখে থেকে থেকে।

দশমিনিট খাড়াই ভেঙে বেরিয়ে এল ওরা জঙ্গল থেকে। সামনে গজ বিশেক দূরে দেখা গেল প্রকাণ্ড এক দেয়াল। বারো তেরো ফুট উঁচু। চাঁদের আলোয় দিনের মত আলোকিত। দেয়ালটার সামনের দিকটা প্রায় দুশো গজ লম্বা। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা লোহার গেট। রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে সেই বন্ধ গেটের সামনে। আর এপাশে দেয়ালটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্ধকারে।

'একেবারে জেলখানা বানিয়ে রেকেচে, স্যার।'

'হুঁ।' মনে মনে উচ্চতাটা মাপার চেষ্টা করল রানা। 'ঢোকা যায় কি করে?'

হাসল গিলটি মিঞা, 'ঢোকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, স্যার। কিন্তুক একবার ঢুকলে বেরোন খুবই মুশকিল হবে। কি ভাবচেন, যাবেন ভেতরে?'

কয়েকটা পাথর জড় করে দুই ফুট উঁচু একটা ধাপ তৈরি করল রানা, তারপর দাঁড়িয়ে ঠেলে তুলে দিল গিলটি মিঞাকে। দু'হাতে দেয়ালটা আঁকড়ে ধরে ঝুলে রইল গিলটি মিঞা। লাফ দিয়ে ওর পা ধরল রানা, তারপর গা বেয়ে উঠে এল উপরে। পনেরো ইঞ্চি চওড়া দেয়ালের উপর শুয়ে পড়ল দু'জন, যাতে কারও চোখে না পাড়ে যায়।

বিরাট এলাকা। জায়গায় জায়গায় ঝোপঝাড় আর এক-আধটা গাছ রেখে দেয়া হয়েছে প্রাকৃতিক শোভার খাতিরে। ঠিক মাঝখানে একটা আধুনিক দোতলা বাড়ি, জ্যোৎস্নার আলোয় হাসছে। কয়েকটা ঘরে বাতি জ্বলছে, বাকি সব অন্ধকার। বাড়িটার চারপাশে একশো গজের মধ্যে কোন গাছ গাছালি নেই—সুন্দর করে ছাঁটা সবুজ ঘাসের লন, আর মাঝে মাঝে গোল, ত্রিভুজ আর চারকোনা ফুলের বেড। বাড়ির পিছনে প্রকাণ্ড একটা দীঘির একাংশ দেখা যাচ্ছে। টলটলে পানি ঝিকমিক করছে চাঁদের আলোয়।

'মস্ত এলাকা, স্যার। চলুন নেমে পড়া যাক। ঘুরে ফিরে…'

'তুমি থাকছ এখানেই,' বলল রানা। 'আমি যাচ্ছি। যদি তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর দরকার পড়ে, তাহলে দৌড়ে এসে যেন তোমার গা বেয়ে দেয়াল টপকাতে পারি, সেজন্যে তোমার এখানে থাকা দরকার।'

'আমি যদি দৌড়ে এসে আপনার গা বেয়ে উটি, তাহালে কেমন হয়?' যুক্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করল গিলটি মিঞা। 'এসব ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার প্যাকটিস অনেক বেশি। বত্রিশ বচোর…'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো দেয়ালের ওপর। কথা বোলো না।'

সাবধানে শরীরটা নামাল রানা যতদূর সম্ভব, তারপর হালকা একটা লাফ

দিয়ে নেমে পড়ল ভিতরে। জায়গাটা ভাল করে চিনে নিয়ে সন্তর্পণে পা বাড়াল সে বাড়িটার উদ্দেশে। শ'দুয়েক গজ কোন অসুবিধেই হলো না। একটা পায়ে-চলা পথ পেয়ে ঝোপঝাড় আর গাছের আড়ালে আড়ালে চলে এল সে ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত। এইখানটায় এসে একটু ইতস্তত বোধ করল রানা।

ডাইনে বাঁয়ে চাইল সে। খোলা মাঠ। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় আলোকিত। এটা পেরোতে গেলেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এদিকে মুখ করা যেকোন জানালায় যে কেউ দাঁড়ালেই পরিষ্কার দেখতে পাবে ওকে। ঝুঁকি নেয়ার আগে বাড়িটার পিছনটা একবার দেখে নেয়া দরকার। ওদিকে সুবিধে হতে পারে।

খুব সাবধানে একটিও শুকনো ঝরা পাতা না মাড়িয়ে বাম দিকে এগোল সে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে প্রকাণ্ড এক অর্ধবৃত্ত তৈরি করে এগোচ্ছে বাড়িটার পিছন দিকটা দেখার জন্যে। নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে রানা, হঠাৎ ডানপাশে নড়ে উঠল কি যেন। ঝপ করে বসে পড়ল সে একটা ঝোপের আড়ালে।

গজ তিরিশেক দূরে একটা ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক, কাঁধে ঝুলছে স্লিং-এ বাঁধা স্টেনগান, ডান হাতে টেনে ধরে আছে একটা চেন। চেনের ও মাথায় ভীষণদর্শন এক উলফ্-হাউন্ড।

ঘাড়ের কাছে চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল রানার। ভয়ে। প্রকাণ্ড জন্তুটার চামড়ার নিচে শক্তিশালী পেশীর নড়াচড়া টের পাচ্ছে সে এখান থেকেও। গার্ডকে টেনে নিয়ে চলেছে সে।

স্থির হয়ে বসে রইল রানা। স্পষ্ট অনুভব করল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে না এসে যদি খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়ত তাহলে এতক্ষণে ওর কি অবস্থা হত। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলত ওকে এতক্ষণে জানোয়ারটা। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল প্রহরী, অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুর নিয়ে।

প্রকাণ্ড এক হাঁপ ছাড়ল রানা। লক্ষ করল হাতের তালু ভিজে উঠেছে ঘামে। বাড়িটার দিকে চাইল সে আবার। চারপাশটা ভালমত না দেখে ফিরে যেতে মন সরল না। কৌতূহল দমন করতে না পেরে আবার এগোল সে। এবার আরও সাবধানে, চারদিকে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তিন লাফে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপের আড়ালে সরে যাচ্ছে সে।

মিনিট দশেক এই ভাবে চলার পর বাড়িটার পিছন দিকে এসে পৌছল রানা। দীঘির পাশে প্রচুর ঝোপঝাড়। তারই আড়ালে এগিয়ে গেল সে যতদূর সম্ভব। বাড়িটার পিছনেও লন, কিন্তু সামনের মত অত বড় না। বড়জোর চল্লিশ গজ মত হবে। একটা জানালায় বাতি দেখা যাচ্ছে। বাকি সব অন্ধকার। চাঁদটা একটু হেলে থাকায় পনেরো-ষোলো গজ ছায়া পড়েছে বাড়ির পিছন দিকে। তার মানে পঁচিশ গজ আলোকিত লন যদি পেরোতে পারে তাহলে ছায়ায় ছায়ায় পৌছে যেতে পারবে সে বাড়িটার কাছাকাছি।

উলফ্-হাউন্ডটার কথা একবার ভাল করে ভেবে দেখল রানা। কিন্তু

কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো ভয়। বিদ্যুৎবেগে পেরিয়ে এল সে পঁচিশ গজ। তারপর আর এক ছুটে গিয়ে দাঁড়াল বাড়িটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে কোথাও কোন নড়াচড়ার লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। দু'মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আলোকিত জানালার পাশে চলে এল সে নিঃশব্দ পায়ে। ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েই বরফের মত জমে গেল রানা। বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর দুই চোখ। দু'চোখে অবিশ্বাস!

গবেষণাগার। বিদঘুটে চেহারার একটা বোতল থেকে সরু একটা টেস্টটিউবে কেমিক্যাল ঢালছে একজন লম্বা লোক। প্রকাণ্ড মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। কয়েক পা সরে গিয়ে কেমিক্যালটুকু ঢেলে দিল একটা পাত্রে। ডান পা-টা টেনে টেনে হাঁটছে লোকটা। পরিষ্কার চিনতে পারল ওকে রানা–কবির চৌধুরী! কোন ভুল নেই তাতে!

সেই কবির চৌধুরী। পাগল বৈজ্ঞানিক। রাঙামাটির পাহাড়ের মধ্যে তৈরি করেছিল গবেষণাগার, কাপ্তাই বাঁধ তৈরির ফলে পাহাড় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল বাঁধটাকেই। বহু কষ্টে ঠেকিয়েছিল রানা। সেই প্রথম পরিচয়। তারপর ওঙ্কার দ্বীপে দেখা পেয়েছিল তার–অদ্ভুত এক গবেষণায় মেতেছিল কবির চৌধুরী, ধ্বংস করে দিয়েছিল রানা ওর সে ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা। এরপর নীল আতঙ্কে কাঁপিয়ে দিয়েছিল লোকটা সমগ্র ঢাকাবাসীর বুক, রিসার্চ সেন্টার থেকে চুরি করেছিল সাংঘাতিক এক ভাইরাস, রুখে দাঁড়িয়েছিল দুনিয়ার বিরুদ্ধে–হয় ওর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে হবে, নয়তো ধ্বংস করে দেবে সে সমগ্র পৃথিবী। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রানা, আর নিজের প্রাণ বাঁচাতে আত্মহত্যার ছুতোয় হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কবির চৌধুরী মতিঝিলের কোন এক তেতলা বাড়ির ছাতে। তারপর শেষ দেখা ওর সাথে ইটালিতে। মারাত্মক ভাবে আহত অবস্থায় কাসা বিলাভিসটায় ওকে ফেলে ওরই তৈরি আশ্চর্য এয়ারক্রাফ্‌টে করে পালিয়েছিল রানা ও সোহানা বোমার ভয়ে। আশা করেছিল, সোহানার গুলিতে যদি না-ও মরে, বোমারু বিমানের আক্রমণ থেকে এবার আর নিস্তার নেই কবির চৌধুরীর। আশ্চর্য! মরণ নেই নাকি লোকটার?

পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, ব্ল্যাকমেলিংটা আসল উদ্দেশ্য নয় কবির চৌধুরীর, এটা শুধু টাকা উপার্জনের একটা ফিকির। এই টাকার সাহায্যে নিশ্চয়ই আবার কোন ভয়ঙ্কর গবেষণায় নামতে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু···কি আশ্চর্য লোকটার ক্ষমতা! সামান্য কয়েক বছরের চেষ্টায় কি ভয়ঙ্কর জোরের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছে সে ব্ল্যাক স্পাইডারকে সারা পৃথিবী জুড়ে! এই প্রচণ্ড ক্ষমতা যদি মানুষের কল্যাণে ব্যয় করত লোকটা তাহলে বিরাট এক মনীষীর সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারত চিরকাল পৃথিবীর ইতিহাসে।

এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ানো সমীচীন মনে করল না রানা। এক্ষুণি এই এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া দরকার। যা দেখার দেখে নিয়েছে সে। বুঝে নিয়েছে যা বোঝার।

ব্যস্তহাতে কেমিক্যাল মিক্স করছে কবির চৌধুরী, বিভোর হয়ে আছে নিজের কাজে। নিচু হয়ে সরে এল রানা। নিঃশব্দ পায়ে চলে এল ছায়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। তারপর দিল খিচে দৌড়। দীঘির পাশে একটা ঝোপের আড়ালে পৌঁছে চারদিক চাইল সে। নাহ্, কারও চোখে পড়েনি। নইলে এতক্ষণে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যেত।

কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশটুকু বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যত দ্রুত সম্ভব এগোল সে দেয়ালের দিকে। আগে পায়ে-চলা পথটা পেতে হবে, তারপর সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঁটলেই পৌঁছে যাবে গিলটি মিঞার কাছে।

গজ তিরিশেক গিয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়েই পাথরের মত জমে গেল রানা। দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে।

লনের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা উল্ফ্-হাউন্ড। সোজা রানার দিকে চেয়ে রয়েছে ওটা। মাথাটা সামান্য কাৎ হয়ে আছে এক পাশে, কান খাড়া।

ধুপধাপ বেতালা হাতুড়ি পড়ছে রানার হৃৎপিণ্ডের ভিতর। চোখের নজর এদের খুব ভাল না, জানে রানা। কিন্তু পায়ের আওয়াজ কি শুনতে পেয়েছে? উল্টো দিক থেকে বাতাস বইছে, কাজেই গন্ধ পায়নি বোঝাই যায়। গন্ধ পেলে ওখানে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে না থেকে হালুম করে এগিয়ে আসত। হয়তো পায়ের আওয়াজ পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে না পেরে ইতস্তত করছে। মনে মনে কুকুরটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল রানা–ও কিছু নয়, বাবা, কানের ভুল!

কয়েক পা এগিয়ে এল হাউন্ডটা মাটিতে নাক ঠেকিয়ে। থামল।

চিবুক বেয়ে টপটপ ঘাম ঝরতে শুরু করেছে রানার। কিন্তু একবিন্দু নড়ল না সে। কুকুরটাও দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। যেন শিকড় গজিয়ে গেছে পা থেকে। পুরো একটা মিনিট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। রানার মনে হলো এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

এমনি সময়ে বাড়ির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল প্রহরীটা। স্টেনগানটা তেমনি ঝুলছে কাঁধ থেকে। লনের উপর দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে বেশ কিছুদূর এগিয়ে এল লোকটা, থেমে দাঁড়িয়ে কুকুরটার হাবভাব লক্ষ করল।

পিছন ফিরে প্রহরীকে দেখে ছোট একটা ডাক ছাড়ল হাউন্ডটা। পিলে চমকে উঠল রানার। আরও কয়েক পা এগোল ওটা রানার দিকে। আবার ফিরে চাইল প্রহরীর দিকে।

'ইধার আও!' হাঁক ছাড়ল প্রহরী ভারী গলায়।

কয়েক সেকেন্ড কি করবে বুঝে পেল না কুকুরটা, তারপর শরীরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছুট দিল প্রহরীর দিকে। ওকে ধরেই কলারের সাথে চেনের হুকটা আটকে দিল প্রহরী। মলত্যাগের জন্যে ছেড়েছিল খুব সম্ভব–ভাবল রানা। কুকুর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূরে চলে গেল প্রহরীটা।

হাঁটতে শুরু করল রানা। এই ভয়ঙ্কর এলাকা থেকে বেরোবার জন্যে ছটফট করে উঠল ওর মনটা। দ্রুত এগোচ্ছে সে এবার। নিজের অজান্তেই

ঝোপঝাড়ের পাশে মাটির নিচে লুকানো একটা চৌকোনা ধাতব জিনিসের উপর পা ফেলল সে। টেরও পেল না অ্যালার্ম বেল বেজে উঠেছে বাড়িটার ভিতর।

পায়ে-চলা পথটা খুঁজছে রানা হন্যে হয়ে, পাচ্ছে না। ওটা আর কত দূরে আন্দাজ করে নেয়ার জন্যে থেমে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে চাইল সে। ঠিক সেই সময় অ্যালার্ম বেলের আওয়াজ পেল সে। খুবই অস্পষ্ট, মৃদু, কিন্তু বিপদঘণ্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চট করে মাটির দিকে চোখ গেল রানার। বুঝতে পারল, অজান্তেই কোন গোপন কানেকশন ছুঁয়ে ফেলেছে সে। আশেপাশে খুঁজল দু'তিন সেকেন্ড, কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই। ঝট করে পিছন ফিরল সে ছায়া নড়ে উঠতেই।

দৌড়ে আসছে নিগ্রোটা। লনের সিকি ভাগ পেরিয়ে এসেছে ইতোমধ্যেই। আশ্চর্য দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে লোকটা। মনে হচ্ছে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক অশুভ কালো ছায়া।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল ওর হাতে একটা চকচকে ছোরা।

এগারো

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথি করছিল আর নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিল চিরঞ্জীব শর্মা।

দেখতে সে অপূর্ব সুন্দর। লম্বায় পাঁচ ফুট আট, চমৎকার মেদহীন ফিগার, একমাথা কোঁকড়া চুল, ঘন টানা ভ্রূর নিচে উজ্জ্বল একজোড়া আয়ত চোখ, টিকাল নাক, ঝকঝকে সুসংবদ্ধ দাঁত। কিন্তু ঠোঁট দুটো অপেক্ষাকৃত পাতলা, এবং কেমন যেন নিষ্ঠুর। সুন্দর চেহারাকে এই ঈষৎ নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া নষ্ট তো করেইনি, বরং আশ্চর্য রকমের আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এর ফলে একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে, অমোঘ আকর্ষণে যেটা টানে মেয়েদের। সাজ পোশাকে ছিমছাম ধোপদুরস্ত।

কিন্তু আসল পরিচয় তার চেহারায় নয়, কাজে। নিজ যোগ্যতায় আট দশজনকে ডিঙিয়ে সে আজ ব্ল্যাক স্পাইডারের ডান হাত। আজ যে সারা পৃথিবী ব্ল্যাক স্পাইডারের ভয়ে থরহরিকম্প, বিশ্ব জুড়ে এই যে মাকড়সার জাল বিস্তার, তার পিছনে চিরঞ্জীবের দান কম হলেও শতকরা চল্লিশ ভাগ। প্ল্যান-প্রোগ্রাম তৈরির ভার মনিবের, কিন্তু সেটা কার্যকরী করতে হলে চাই এই শর্মাকেই। শেয়ালের ধূর্ততা, কাকের সতর্কতা, গণ্ডারের সহিষ্ণুতা, চিতার ক্ষিপ্রতা আর সিংহের দুঃসাহস নিয়ে মোকাবিলা করে সে যে কোন সমস্যার।

একমাত্র দুর্বলতা ওর আরতি লাহিড়ী। কেন যেন এইখানটাতেই ভয়ানক দুর্বল হয়ে যায় সে। আরও কয়েকটা মেয়েকে ভাগিয়ে এনে ব্ল্যাক স্পাইডারের

'কাজে লাগিয়েছে সে, কিন্তু আরতিকে ওদের সাথে এক করে দেখতে পারে না সে কোনদিনই। আরতির কথা স্বতন্ত্র।

নিজের প্রতি বার কয়েক চোখ মটকিয়ে ভ্রূ ভঙ্গি করে টাইয়ের নটটা ঠিক করল চিরঞ্জীব, ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল আরতি। মৃদু হেসে পিছন ফিরল চিরঞ্জীব, কিন্তু আরতির চেহারা দেখে জমে গেল হাসিটা।

'কি হয়েছে, আরতি? এরকম হয়েছে কেন চেহারা?'

দরজা বন্ধ করে দিল আরতি, দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। রক্তশূন্য মুখ।

'একটা লোকের কথা তোমাকে বলেছিলাম, ঢাকায় যে আমার পিছু নিয়েছিল, পুলিস লেলিয়ে দিয়েছিল আমার পেছনে—মনে আছে?' উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল আরতি, 'কাল রাতের অনুসরণের কথাও বলেছি তোমাকে। ওই লোকটাই বিকেল বেলা কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের গোমেজকে জিজ্ঞেস করেছিল জংগুর কথা। কোথায় থাকে, কি করে, সব!'

'জংগুর কথা?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল চিরঞ্জীব আরতির মুখের দিকে। 'সেই লোকটাই, এ ব্যাপারে তুমি শিওর?'

'পুরোপুরি শিওর হব কি করে?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল আরতি। 'তোমাকে তো বলেছি, ওর মুখ দেখতে পাইনি আমি। সেদিনও না, কালকেও না। কিন্তু আজ দেখেছি। ঢাকা থেকে এই লোকটাই এসেছে আমার সাথে একই প্লেনে—ওকে আসফ খান বলে ডেকেছিল কাস্টমস্ অফিসার। শিল্পপতি। কিন্তু দেহের গড়ন অবিকল এক।'

'আসফ খান? আমাদের লিস্টে ওর নাম আছে। বাংলাদেশের দশজন ধনী লোকের মধ্যে একজন। সামন্তের রিপোর্ট পেয়েছি আজ সকালেও। তাজমহল হোটেলেই আছে এখন পর্যন্ত। বোধহয় ভয় পেয়েছে আমাদের জংগুকে দেখে—হোটেল ছেড়ে একবারও ওকে বেরোতে দেখা যায়নি।'

'তাহলে কোয়ালিটি রেস্টুরেন্ট চিনে বের করল কি করে? কাল রাতে আমার পেছনে ধাওয়া করল কি করে?' ভুরু নাচাল আরতি। 'ঢুকতে বেরোতে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দিব্যি তো ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা সারা বোম্বে শহরে।'

এবার বেশ চিন্তিত দেখাল চিরঞ্জীবকে।

'তাই তো!' থুতনি চুলকাল সে। 'ভাবনার কথা! ঢুকতে বেরোতে দেখা যাচ্ছে না, অথচ···'

'তার মানে ও ওই হোটেলে নেই।' চোখ বড় বড় করে বলল আরতি।

'কোথায় আছে তাহলে?'

'খানিক পরেই জানা যাবে। মহাবীরকে লাগিয়ে দিয়েছি ওর পেছনে। কিন্তু···' দুশ্চিন্তা দেখা দিল আরতির মুখে। 'পাঁচ ঘণ্টা হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই কেন ওর? তুমিই বা ছিলে কোথায়? ফিরে আসা অবধি ছটফট করে মরছি। গোমেজ কিছু বলেনি তোমাকে?'

'আমি যাইনি আজ ওর ওখানে। কিন্তু দাঁড়াও···লোকটা বেশ ভাবিয়ে তুললে দেখছি! পুলিস বলে মনে হয়?'

'না।' মাথা নাড়ল আরতি। 'চালচলনে পুলিশী ভাব নেই মোটেই। ঢাকায় সেই কাস্টমস অফিসারের ব্যাপারটা যদি সাজানো না হয়ে থাকে তাহলে লোকটা শিল্পপতি আসফ খান। কিন্তু সে ব্যাপারে শিওর হওয়া যাচ্ছে না। আসফ খান যদি ওইদিনই বিদেশ থেকে ঢাকায় এসে থাকে তাহলে আগের রাতে আমাকে অনুসরণ করল কে? ব্যাপারটা খুব জটিল মনে হচ্ছে আমার কাছে, চিরঞ্জীব।' হঠাৎ ভেঙে পড়ল আরতি। 'এবং ভয়ানক বিপজ্জনক। সব সময় তোমাকে বলেছি, চিরঞ্জীব, এভাবে চলতে পারে না। ধরা আমাদের পড়তেই হবে। আজ হোক, কাল হোক...'

'এই-রে! শুরু হলো আবার!' এগিয়ে এসে আরতির হাত ধরে টেনে এনে খাটের ওপর বসাল চিরঞ্জীব। 'শোনো, আরতি, মাথা ঠাণ্ডা করো।' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল আরতির মুখোমুখি। 'এত ভড়কে যাওয়ার কিছুই নেই। এতদিন যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়েছে, এখন এক আধটা বাধা-বিঘ্ন আসছে তাতে ঘাবড়াবার কি আছে? বাধা না থাকলে বাধা ডিঙোবার আনন্দ আসবে কোত্থেকে? সামান্য বাধার ভয়ে এতদিনের এত পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলব না, এটা কোন কাজের কথা হলো? তুমিই বলো? আমরা দু'জন শুধু আমাদের চেষ্টায় এত বিরাট একটা নেটওঅর্ক তৈরি করতে পারতাম? পারতাম না। এত টাকা জীবনে কোনদিন রোজগার করতে পারব ভাবতে পেরেছি আমরা? আমাদের চারপাশে যে ঝুপঝুপ টাকার বৃষ্টি নেমেছে, দেখতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি। কিন্তু ধরা পড়লে এ টাকায় কোন কাজ হবে না, চিরঞ্জীব। সময় ঘনিয়ে এসেছে, বুঝতে পারছ না কেন তুমি? এই লোকটা পিছু লেগেছে আমাদের, এগিয়েও এসেছে অনেকদূর, এরপর হাতকড়া নিয়ে আসবে পুলিস। টাকা অনেক হয়েছে, চিরঞ্জীব। এবার আমাদের কেটে পড়ার সময় এসেছে।'

'কেটে পড়া!' তাজ্জব চোখে চেয়ে রইল চিরঞ্জীব আরতির দিকে। 'এসব কি বলছ তুমি!'

'কি বলছি বুঝতে না পারার মত কচি খোকা তুমি নও, চিরঞ্জীব।' রেগে উঠল আরতি, গলার স্বর উঠে গেল এক পর্দা উপরে। 'আমি বলছি, ধরা পড়বার আগে কেটে পড়তে হবে আমাদের। এসব ছেলেখেলা নয়—বুঝতে পেরেছি আমি এবার ঢাকায় গিয়ে। অন্ধকার রাতে বিদেশ বিভূঁইয়ে খুনের দায়ে পুলিসের তাড়া খেয়ে তোমাকে যদি পাগলের মত ছুটোছুটি করতে হত, তাহলে আমার কথা বুঝতে কোন অসুবিধেই হত না তোমার। ঘুমাতে পারি না রাতে, দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে যাই।' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল আরতি, 'খুনের দায়ে ধরা পড়ব আমরা, তা জানো? ধরা পড়তেই হবে আমাদের! আমি জানি...'

'চুপ করো!' বাঘের মত গর্জে উঠল চিরঞ্জীব। 'নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে তোমার। মাথা খারাপ হয়েছে!'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমাকে ভুলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে

এনে...'

আরতির দুই কাঁধ ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিল চিরঞ্জীব।

'শাট আপ্! আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখা যাচ্ছে! শুনে রাখো, বহুবার বলেছি, আবার বলছি,–যে কাজে নেমেছি তা থেকে মুক্তি নেই আমাদের। চাল ফেরত নেয়া যায় না এ খেলায়: হয় জিতব, নয় হারব, আর কোন উপায় নেই।' হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে ফেলল চিরঞ্জীব। 'এ তুমি কি শুরু করেছ, আরতি? মনিবের কানে গেলে...'

'কচু হবে! ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি জানতাম, এ অন্যায় চিরদিন চলতে পারে না। গন্ধ শুঁকে শুঁকে বোম্বে পর্যন্ত এসে হাজির হয়েছে, এবার লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে! নিজের চালের আগুন নেভাবে, না আমাদের বাঁচাবে কবির চৌধুরী? সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের। না-ই থাকলাম এদেশে, ইচ্ছে করলে দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুতে গিয়ে ঘর বাঁধতে পারি আমরা।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল চিরঞ্জীব।

'তিন রাত না ঘুমিয়ে এই প্ল্যান এঁটেছ বুঝি? বাহ্, চমৎকার! বড় খুশি হবে মনিব এ কথা জানলে। শুধু খুশিমনে বিদায়ই দেবে না, তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি শুনলে বকশিশও দেবে প্রচুর!'

'বোকার মত কথা বলছ, চিরঞ্জীব। টেরই পাবে না আমরা কখন কিভাবে কেটে পড়ছি। যখন টের পাবে তখন নিজের মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকবে না ওর।'

'তোমার ধারণা গোটা তিনেক দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "যা গেছে তা যাক" ভেবে বেমালুম ভুলে যাবে কবির চৌধুরী আমাদের, তাই না?' বাঁকা হাসি ফুটে উঠল চিরঞ্জীবের ঠোঁটে। 'গত তিন রাতে আর ক'টা দুঃস্বপ্ন দেখেছ তুমি, আরতি? আসল দুঃস্বপ্ন শুরু হবে পালাবার পরমুহূর্ত থেকে। আমাদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্যেও বিশ্রাম নেবে না সে, একথা আমি যেমন জানি, তুমিও জানো তেমনি। খামোকা মনকে চোখ ঠেরে লাভ কি, আরতি? সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে ওর কয়েকশো এজেন্ট, আমাদের খুঁজে বের করতে বড় জোর তিন মাস লাগবে ওর। তারপর?' আবার হাসল চিরঞ্জীব। 'আর যদি ভেবে থাকো আমি না গেলে একাই পালাবে তুমি, তাহলেও মস্ত ভুল করবে। একটি মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি পাবে না জীবনে। পিছনে একটা পায়ের শব্দ শুনলেই চমকে উঠবে কলজে, কেউ তোমার দিকে একবার চাইলেই ধক করে উঠবে বুকের ভেতর। সর্বক্ষণ সংশয় আর আতঙ্ক। তোমার সামনে দৃষ্টান্ত নেই এমন তো নয়, জানো না যারা ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তাদের কি অবস্থা হয়েছে?'

'জানি। কিন্তু এই অবস্থায় আর কিছুদিন থাকলে সত্যিই পাগল হয়ে যাব আমি।'

'মনটা স্থির করো, আরতি।' আরতির কাঁধের উপর হাত রাখল চিরঞ্জীব। 'মনটা শান্ত করো। ভয়ের কিছুই নেই। ওই লোকটা বড়জোর আর

দু'এক কদম এগোতে পারবে, তারপরেই ঘ্যা…চ! খিচিৎ! ওকে যদি ম্যানেজ না করতে পারলাম, তাহলে আর…'

'তার মানে তুমি পালাচ্ছ না?' অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চাইল আরতি চিরঞ্জীবের মুখের দিকে।

'না। আমিও না, তুমিও না। পালাবার প্রশ্নই ওঠে না। ঘরে যাও, চান করে ঠাণ্ডা হয়ে একটা লম্বা ঘুম দাও দিকিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। আতঙ্কের ঠেলায় ঘোলা হয়ে গেছে তোমার বুদ্ধি। ঘুম দিয়ে উঠলেই ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চিন্তে ঘুমোওগে যাও। ভুলে যেও না, ওই লোকটা যদি জংগুর খোঁজ করতে করতে এই বাড়ি পর্যন্ত এসেও পৌছোয়, মাটির নিচের এই ঘরে এসে পৌছতে পারবে না সে কিছুতেই। অত সহজ না, বুঝলে?' হাত ধরে টেনে তুলে দিল সে আরতিকে। 'যাও তো, লক্ষী মেয়ের মত ঘরে চলে যাও।'

'মনিবকে বলবে নাকি লোকটার কথা?' জিজ্ঞেস করল আরতি।

'এখন বলার কোন দরকার নেই। এর ব্যাপারে কিছু তথ্য জোগাড় করে নিই আগে।'

দরজার কাছে চলে গেল আরতি, তারপর পিছু ফিরে বলল, 'মহাবীরের টেলিফোন করবার কথা।'

'ও না করলে আমিই করব। চিন্তা নেই।'

আরতি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অমায়িক ভাবটা খসে গেল চিরঞ্জীবের মুখ থেকে। ভ্রূ কুঁচকে বার কয়েক পায়চারি করল সে সুসজ্জিত ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত। মাঝখানে থেমে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে নিল একটা, তারপর আবার শুরু হলো পদচারণ।

সিগারেটটা শেষ হয়ে আসতেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল সে কানে। মহাবীরের খোঁজ করতেই জংগু জানাল ঘণ্টা দুয়েক আগে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকেছে মহাবীর, বার কয়েক চিরঞ্জীবের কানেকশন চেয়েছে, এখন বোধহয় ঘুমে। মহাবীরের ঘরে কানেকশন দিতে বলে অসহিষ্ণু অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল চিরঞ্জীব। আধ মিনিট পর ভেসে এল মহাবীরের সদ্য ঘুম ভাঙা আড়ষ্ট কণ্ঠ।

'বীরত্বের সাথে নাক ডাকাচ্ছিলে বুঝি, মহাবীর?'

চিরঞ্জীবের কণ্ঠস্বরে এক নিমেষে সজাগ হয়ে উঠল মহাবীর।

'জ্বি-আজ্ঞে, ঘুমোচ্ছিলাম, স্যার।'

'তোমার কোন সংবাদ দেয়ার কথা ছিল টেলিফোনে?'

'তিনবার খোঁজ করেছিলাম, স্যার আপনাকে, পাইনি।'

'বাইরে ছিলাম। খবর শোনা যাক। ফলো করেছিলে?'

'জ্বি-আজ্ঞে, করেছিলাম, স্যার। কিন্তু ধোঁকা দিয়ে চলে গেল। বেহুদা ঘোরাঘুরি করল বাগানে, পার্কে সন্ধে পর্যন্ত, তারপর হঠাৎ চৌপাতি বীচে পার্ক করা একটা গাড়িতে উঠেই ভোঁ করে হাওয়া হয়ে গেল। আশেপাশে কোন ট্যাক্সি পেলাম না যে ওকে…'

'তাজমহল হোটেলে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'জ্বি-আজ্ঞে, নিয়েছিলাম, স্যার। দিব্যি নাম রয়েছে রেজিস্ট্রিতে। সন্দেহ হওয়ার কায়দা করে-ঢুকে পড়লাম ওর কামরায়। ঘর ফাঁকা! কেউ নেই ওই ঘরে, কোন মালপত্রও নেই, ঝাড়ু পর্যন্ত পড়েনি ও ঘরে গত তিনদিন।'

'তারপর?' ভ্রূজোড়া কুঁচকে রয়েছে চিরঞ্জীবের।

'তারপর ফিরে এসে আপনাকে ফোন করবার চেষ্টা করলাম।'

'লোকটা কোথায় আছে বের করবার কি ব্যবস্থা?'

'আপনি হুকুম করলে কাল থেকে সমস্ত হোটেল, মোটেল, বাংলো খোঁজ করতে শুরু করি। তিন দিনের মধ্যে বেরিয়ে যাবে এই তিনটের যে কোন একটায় যদি উঠে থাকে। কিন্তু যদি কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে উঠে থাকে...'

'ওসব বুঝি না। কালকের মধ্যেই লোকটার ঠিকানা চাই আমার।'

কথাটা বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল চিরঞ্জীব, এমনি সময় বেজে উঠল অ্যালার্ম বেল। তিন সেকেন্ডের জন্যে পাথরের মত জমে গেল চিরঞ্জীব। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মত চেপে ধরেছে রিসিভারটাকে। অবাঞ্ছিত কেউ ঢুকেছে এ বাড়ির এলাকায়! কে সে!

রিসিভারটা কড়াৎ করে ক্রেডলে নামিয়ে রেখেই এক লাফে চলে এল সে ডেস্কের কাছে, টান দিয়ে ড্রয়ার খুলে খপ করে তুলে নিল পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট অটোমেটিকটা। এক লাফে করিডরে বেরিয়ে দেখল জংগু বেরিয়ে আসছে কন্ট্রোল রুম থেকে। দু'জন দৌড় দিল আলাদা দুটো লিফটের দিকে।

মিশমিশে কালো প্রকাণ্ড দৈত্যটাকে ঝড়ের বেগে এগোতে দেখে প্রথমেই রানার ইচ্ছে হলো দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে যেদিক খুশি ছুট দেয়। চাঁদের আলোয় লোকটাকে মনে হচ্ছে এক ভয়ানক অশুভ প্রেতাত্মা।

দৌড় দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। চট করে সরে গেল একটা ঘন ঝোপের আড়ালে। বসে পড়ল। এই প্রকাণ্ড এলাকায় একজন লোককে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে খুঁজে পাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়।

রানা যেখানটায় লুকিয়ে আছে তার থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে লন ছেড়ে ঝোপঝাড় এলাকায় ঢুকল নিগ্রোটা। থেমে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে কান খাড়া করে।

সেই গার্ডটাকে দেখা গেল, বামহাতে চেন ধরে উল্ফ্-হাউন্ডের টানে এগিয়ে আসছে এইদিকে। স্টেনগানটা চলে এসেছে ডানহাতে। প্রস্তুত। নিগ্রোটাকে দেখতে পেয়ে থেমে দাঁড়াল লোকটা, টেনে ধরে রাখল চেন। কিন্তু কথা শুনতে চাইছে না হাউন্ড, প্রবল বিক্রমে লাফ-ঝাঁপ শুরু করেছে, এগোতে চেষ্টা করছে প্রাণপণ শক্তিতে, চেন ছিঁড়ে ফেলার জোগাড়, সেইসাথে মাঝে মাঝেই ছাড়ছে এক একটা কলজে কাঁপানো ডাক। আরও কয়েকটা কুকুরের ডাক শুনে চমকে চারদিকে চাইল রানা। আরও তিনজন গার্ড আসছে বাড়িটার দু'পাশ থেকে। তিনজনের হাতে চেপে ধরা চেন ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছে আরও তিনটে উল্ফ্-হাউন্ড।

হাত নেড়ে ওদের থেমে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল নিগ্রোটা। তারপর ধীরে সতর্ক পায়ে এগোতে শুরু করল রানা যেখানে লুকিয়ে আছে সেই দিকেই।

পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে রানা, কুকুর টেনে ধরে দাঁড়িয়ে আছে চারজন প্রহরী চারটে পাথরের মূর্তির মত। নিগ্রোটার পায়ের মৃদু মশমশ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। ছয়-সাত হাত দূরে এসে দাঁড়াল আবার। পাতার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা ওর সজাগ, চঞ্চল চোখ দুটো। ছুরিধরা হাতটা তৈরি আছে ছুরি-চালানোর ভঙ্গিতে।

দম বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল রানা। আধ মিনিট নড়ল না কেউ। গাছের পাতায় সড়সড় শব্দ হচ্ছে মৃদু হাওয়ায়, ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে নিগ্রোটা, খানিক দূরে থেকে থেকে গর্জে উঠছে ভয়ঙ্কর মৃত্যু। সাবধানে এগোল নিগ্রোটা আবার। গজ তিনেক দূর দিয়ে চলে গেল নিকষ কালো দৈত্য। এখনও এগোচ্ছে। একবিন্দু নড়ল না রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এখন সামান্যতম শব্দ হলেও টের পেয়ে যাবে নিগ্রোটা।

বিশ গজ মত গিয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল নিগ্রোটা। বুঝতে পেরেছে সে, খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে। কুকুরগুলো ছেড়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে আত্মগোপনকারী। মোটা, কর্কশ গলায় হাঁক ছাড়ল সে, 'ইসলাম! কুকুরগুলো লেলিয়ে দাও!'

আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই। প্রহরীগুলো কুকুরের কলার থেকে চেন খুলে নেয়ার আগেই তড়াক করে এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। দেয়ালের অবস্থানটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েই ছুটল সে প্রাণপণে। ছোটখাট ঝোপ-ঝাড় লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে, বড়গুলোর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে জীবনপণ করে ছুটছে সে, যেন তাড়া করেছে ওকে সাক্ষাৎ যম। একমাত্র চিন্তা কখন গিয়ে পৌঁছবে দেয়ালের কাছে, লাফ দিয়ে উঠে ধরবে গিলটি মিঞার পা, টপকে পার হয়ে যাবে এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এলাকা।

চারটে কুকুরের সম্মিলিত গর্জন শুনতে পাচ্ছে রানা। এগিয়ে আসছে দ্রুত। তীর বেগে ছুটে আসছে চারটে উলফ্-হাউন্ড। হঠাৎ ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে পায়ে-চলা পথটা পেয়ে গেল রানা। এটাই খুঁজছিল সে এতক্ষণ। জীবনের দ্রুততম দৌড় দৌড়াল এবার রানা।

হাউন্ডগুলোর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে রানা। কয়েক গজ পিছনে ওদের চাপা ক্ষিপ্ত গর্জন শুনে মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিমশীতল ভয়ের স্রোত উঠে এল রানার মস্তিষ্কে। হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে কুঁকড়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করল ওর। বুঝতে পারল, দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, হেরে যাচ্ছে সে দৌড় প্রতিযোগিতায়, একেবারে কাছে এসে পড়েছে ওগুলো। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওগুলো ওর উপর। স্পষ্ট মানসচক্ষে দেখতে পেল সে, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ওর দেহটা, ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলছে ওকে কুকুরগুলো।

সামনেই কয়েক গজ দূরে রাস্তার পাশে একটা নারকেল গাছ দেখতে পেল রানা। ততক্ষণে একটা কুকুর পৌঁছে গেছে ওর ডান পাশে। লাফ দিয়ে

উঠে কোটের আস্তিন কামড়ে ধরল। বাম হাতে ধাঁই করে কিল মারল রানা ওটার চাঁদি বরাবর। মাটির উপর তিন গড়ান খেয়ে উঠে দাঁড়াল ওটা আবার। পিছিয়ে পড়েছে একটু। রানা বুঝে নিল, খেলা শেষ। সাঁই করে ডান পাশে ঘুরেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে নারকেল গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে।

কয়েক পা এগিয়েই ব্রেক কষল কুকুরগুলো, চট করে ঘিরে ফেলল নারকেল গাছটা। পা ভাঁজ করে খাপ পেতে বসল চারজন চারদিকে, জিভ বের করে হাঁপাতে শুরু করল হ্যা হ্যা করে। কাজ কমপ্লিট।

হাঁপাচ্ছে রানাও। সভয়, সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছে কুকুরগুলোকে। ও জানে, এখন যে কোন দিকে এগোতে গেলেই ঝাঁপ দেবে চারজনই একসাথে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল রানা। নড়াচড়া দেখে ধমক দিল দুটো কুকুর, গুটিসুটি মেরে আরও খানিকটা এগিয়ে এল।

থপ থপ পায়ের শব্দে চোখ তুলল রানা। সরু পথ ধরে দৌড়ে আসছে নিগ্রোটা চকচকে ছোরা হাতে। রানাকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল। তাজ্জব হয়ে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

একটা সিগারেট বের করে শুকনো ঠোঁটে লাগাল রানা, তারপর নিগ্রোটার কণ্ঠস্বর নকল করে জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাচ হবে আপনার কাছে, মিস্টার?'

বারো

বসবার ঘরে একটা মস্ত টেবিলের ওপাশে প্রকাণ্ড একখানা রাজকীয় গদি আঁটা চেয়ারে আরাম করে বসে এক বিঘৎ লম্বা ও সেই অনুপাতে মোটা একটা চুরুট টানছে কবির চৌধুরী। কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগানো চোখ দুটো হাতের দিকে নিবদ্ধ, স্থির।

সামনে, ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রানাকে কিভাবে পাকড়াও করা হলো সে রিপোর্ট পেশ করছে চিরঞ্জীব শর্মা।

কবির চৌধুরীর ডান হাত সে, মস্ত দায়িত্ব আর প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও একজিকিউশনের কাজ করে যাচ্ছে সে গত দুই বছর ধরে বিশ্বস্ততার সাথে। ব্ল্যাক স্পাইডারের আজকের এই পৃথিবী জোড়া কুখ্যাতির অনেকখানি কৃতিত্ব ওর, একথা সবাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য। ওর দক্ষতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারে এমন কেউ নেই এ প্রতিষ্ঠানে, এক কবির চৌধুরী ছাড়া। পদ মর্যাদার দিক থেকে কবির চৌধুরীর নিচেই ওর স্থান, কিন্তু ঠিক কতটা নিচে সেকথা খোদ মনিব এবং ও ছাড়া আর কারও জানা নেই! মনিবের সামনে চেয়ারে বসতে পায় না সে। পর পর সাজিয়ে যদি নাম লিখতে হয়, জানে চিরঞ্জীব, তাহলে কবির চৌধুরীর নাম লেখার পর দশ আঙুল পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রেখে তারপর ওর নাম লেখা

উচিত–দু'জনের ক্ষমতার তফাৎ ঠিক এতখানিই।

এই আশ্চর্য ধূর্ত, ভয়ঙ্কর, প্রতিভাবান, আর তেমনি নিষ্ঠুর, দুর্ধর্ষ লোকটার সামনে দাঁড়ালেই ওর বুকের ভিতরটা কেন যে কাঁপতে থাকে বুঝতে পারে না চিরঞ্জীব। আসলে বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পায় সে এই লোকটাকে। বহুবার নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে সে, যতদিন পর্যন্ত মারাত্মক কোন ভুল বা গাফিলতি না করছে ততদিন কোন ভয় নেই ওর–কিন্তু এ সব কোন যুক্তিতেই ভয় কাটেনি ওর। ওর ধারণা কবির চৌধুরীর মধ্যে আছে এক উন্মাদ পিশাচের বাস, যে কোন মুহূর্তে পিছন ফিরলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ঘাড়ের উপর। কখন যে আক্রমণ করে বসবে কেউ জানে না। বিশ্বস্ত ও যোগ্য অনুচরকেও সামান্য অপরাধেই কি পরিমাণ নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে পারে কবির চৌধুরী দেখেছে সে নিজ চোখে।

'আসফ খান?' হঠাৎ কথা বলে উঠল কবির চৌধুরী। 'আশ্চর্য!'

'আপনি চেনেন ওকে?' বলল চিরঞ্জীব। 'মোস্তাককে ট্রাংকল করেছিলাম আজ দুপুরে। ও বলল...'

'তেরো কোটি টাকা রয়েছে ওর স্যুইস ব্যাংকে।' মৃদু টান দিল কবির চৌধুরী চুরুটে।

কবির চৌধুরীর মুখে হুবহু মোস্তাকের সংলাপটা শুনে ভিতর ভিতর চমকে গেল চিরঞ্জীব। লোকটা অন্তর্যামী নাকি!

'আশ্চর্য!' আপন মনেই বলল কবির চৌধুরী আবার। 'ওকে কি করেছ?'

'নিচে বন্দী-গুহায় ফেলে রেখেছি শিকল দিয়ে বেঁধে।'

'একা ছিল?'

এই কথাটা জিজ্ঞেস করবে ভেবে ভয় পাচ্ছিল চিরঞ্জীব এতক্ষণ। চোখ কান বুজে বলে ফেলল, 'সাথে আরেকজন ছিল। পালিয়ে গেছে।'

দাঁতে চাপা চুরুটটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে পুরু ছাইটা পরীক্ষা করল কবির চৌধুরী।

'কি করে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো?'

'ও যে দেয়ালের ওপর শুয়ে ছিল টের পায়নি কেউ। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পালিয়ে গেছে। মারকারি ট্রাভেল্সের গাড়ি, ওখান থেকেই জুহু বীচের বাংলোর ঠিকানা পাওয়া গেছে।'

এক মিনিট চুপ করে রইল কবির চৌধুরী। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে সাহস পেল না চিরঞ্জীব, দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। ও জানে, কমপিউটারের গতিতে চিন্তা চলেছে এখন কবির চৌধুরীর মাথার মধ্যে, ফলাফল বা সিদ্ধান্ত জানা যাবে খানিক অপেক্ষা করলেই।

'ওকে চলে যেতে দেয়া উচিত হয়নি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কবির চৌধুরী। 'দায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করো। অবশ্য মারাত্মক কোন ক্ষতি হয়নি এর ফলে। লোকটা পুলিসের কাছে যাবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ধরনের একটা ব্যাপার ঘটতে পারে সে আশঙ্কা আমি অনেক আগেই করেছিলাম। কাজেই অপ্রস্তুত নই। গত তিন বছরে এ অঞ্চলে যে সুনাম, প্রতিষ্ঠা আর

প্রতিপত্তি অর্জন করেছি দান খয়রাৎ আর ঘুষের মাধ্যমে, সেটা একবার বাজিয়ে দেখবার সময় এসেছে। দেখা যাক, ধোপে কতখানি টেঁকে। তৈরি হয়ে নাও, চিরঞ্জীব, কাল পুলিসকে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে সার্চ করবার আমন্ত্রণ জানাব আমি। ওরা রাজি না হলে রীতিমত চাপাচাপি করে সার্চ করতে বাধ্য করব ওদের। ওরা যাতে কিছুই খুঁজে না পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে তোমাকে। বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝতে পেরেছি।' বলল চিরঞ্জীব।

এতক্ষণে সরাসরি চিরঞ্জীবের মুখের দিকে চাইল কবির চৌধুরী।

'পুলিস আসবে শুনে ভয় লাগছে?'

'না।' ছোট্ট করে উত্তর দিল চিরঞ্জীব।

'গুড! এই তো চাই!' মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী। 'তোমার নামে পুলিস রিপোর্ট আছে; কাজেই তুমি অনুপস্থিত থাকবে। সেই সাথে আরতিও। ঘাবড়ে গিয়ে একটা কিছু করে বসার আশঙ্কা আছে ওকে দিয়ে। দারুণ উৎকণ্ঠায় ভুগছে ও, মেন্টাল ব্রেকডাউনের কাছাকাছি পর্যায়ে চলে গেছে একেবারে। ওর হয়তো ধারণা হতে পারে যে এই আমাদের শেষ, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি আমরা। তুমি লক্ষ রাখবে ও যেন আতঙ্কিত না হয়ে ওঠে।'

'আচ্ছা,' বলল চিরঞ্জীব। লক্ষ করল, এই প্রসঙ্গ আসতেই গলাটা কেন যেন শুকিয়ে এসেছে ওর।

'মেয়েটা দেখতে ভাল,' আরতির প্রসঙ্গ ত্যাগ করল না কবির চৌধুরী। 'কিন্তু জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করবার মত মনের জোর নেই।'

'ঢাকার ঘটনায় ও একটু মুষড়ে পড়েছে,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল চিরঞ্জীব, নিজের কানেই কেমন বিদঘুটে শোনাল নিজের গলা। 'ঠিক হয়ে যাবে দু'একদিনেই।'

'ঠিক হয়ে যাওয়াই ভাল।' মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী। 'তোমার সাথে ওর বিশেষ হৃদ্যতা লক্ষ করেছি। আশা করি ওর কাজের জন্যে দায়ী থাকতে রাজি হবে তুমি?'

'কোন ঝামেলা হবে না,' বলল চিরঞ্জীব। 'ঠিক হয়ে যাবে।'

চিরঞ্জীবের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। কবির চৌধুরীকে চুরুটের প্রতি আবার মনোনিবেশ করতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। চট করে রুমাল বুলিয়ে নিল একবার কপালে।

'তুমি যদি চাও আমি সরাসরি কথা বলতে পারি ওর সাথে। কিন্তু আমার ধারণা, নিজের মেয়েমানুষকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা তোমার থাকা উচিত।'

'ওকে নিয়ে কোন অসুবিধের সৃষ্টি হবে না। এ ব্যাপারে আমি কথা দিতে পারি।' মেঝের দিকে চোখ রেখে বলল চিরঞ্জীব। বুকের মধ্যে কাঁপুনি উঠে গেছে ওর। এসব কথা বলছে কেন মনিব আজ হঠাৎ?

'গুড! এই তো চাই!' কেমন যেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল কবির চৌধুরী। 'স্ত্রীলোক হচ্ছে ভোগের সামগ্রী, চুটিয়ে ভোগ করো যত খুশি; কিন্তু কখনও নিজের রাশটা ওদের হাতে তুলে দিয়ো না। দিলেই মারাত্মক ভুল করবে।

তাহলে তোমার ইচ্ছাশক্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তোমার পিঠে চেপে বসে টগবগ করে ছুটবে ওরা যেদিকে খুশি। পথে খানাখন্দ থাকলে হাত-পা ভাঙবে তোমারই।'

মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল চিরঞ্জীব।

'আসফ খানের প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা, তাই না?' বলল কবির চৌধুরী। 'কেন ঢুকেছিল ও এখানে জানা গেছে?'

'জংগুর আক্রমণে জ্ঞান হারিয়েছিল লোকটা, এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে।'

'ও কিন্তু অনেক পয়সার মক্কেল। মারাত্মক কোন আঘাত পায়নি তো?'

'না। ডক্টর যোশী পরীক্ষা করে দেখেছে। জ্ঞান ফিরবে শীঘ্রি।'

'কিন্তু এ লোক গোমেজের রেস্তোরাঁ পর্যন্ত পৌঁছল কি করে? কিভাবে কিসের ওপর ভিত্তি করে খুঁজে বের করল আমাদের? এবং কেন? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। তোমার কি মনে হয়?'

'মোস্তাকের কাছে জানা গেল, এই লোকটা নাকি জহিরুল হকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।'

'আচ্ছা!' আপন মনে মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী। 'তাই বলো! কথাটা আগেই জানানো উচিত ছিল আমাকে। এতক্ষণে বোঝা গেল এর এই গোয়েন্দাগিরির কারণ।' খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'মোস্তাক লোকটাকে তুখোড় বলে মনে হচ্ছে, তাই না? ওর কাজের ধারাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ঢাকার ব্যাপারটা যেভাবে ম্যানেজ করেছে, রীতিমত তারিফই করতে হয়। দুর্ধর্ষ লোক। ঠিক আমার মনের মত।' চিরঞ্জীবের চোখের দিকে চাইল। 'ওকে এখানে আনিয়ে নিলে কেমন হয়?'

কোন জবাব দিল না চিরঞ্জীব। ওর ঘোর আপত্তি টের পেয়ে মুচকি হাসি খেলে গেল কবির চৌধুরীর মুখে। বলল, 'অঢেল টাকা আর আরাম পেয়ে তুমি বেশ খানিকটা নরম হয়ে গেছ, চিরঞ্জীব। তোমার দৃঢ় মনোবল গলতে শুরু করেছে আঁচ পেয়ে। এটা তোমার জন্যে ক্ষতিকর। বিপজ্জনক।'

সাধারণ একজন নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডার সাথে ওর এই অন্যায় তুলনাতে ভিতর ভিতর গরম হয়ে উঠল চিরঞ্জীব। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'আমার কাজ পছন্দ না হলে বিদায় করে দিন।'

হেসে উঠল কবির চৌধুরী।

'তুমি তো জানো, চিরঞ্জীব, বিদায় আমি কাউকেই দিই না। সে নিয়ম আমার এখানে নেই। যতক্ষণ কাজে গাফিলতি না পাচ্ছি...যাকগে, এসব তোমার জানা আছে। কাল সকাল এগারোটা নাগাদ পাঠিয়ে দেবে আসফ খানকে আমার কাছে। এখন তুমি যেতে পারো।'

ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল চিরঞ্জীব ঘর থেকে। সাথে নিয়ে গেল চাপা আতঙ্কের কালো ছায়া।

হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা।

ঝনঝন শব্দ শুনে দৃষ্টি গেল পায়ের দিকে। শিকল দিয়ে বাঁধা। দেয়ালের গায়ে বসানো প্রকাণ্ড এক আংটার সাথে লাগানো শিকলের আরেক মাথা। রোদের মত উজ্জ্বল কর্কশ চোখ-ধাঁধানো আলো নামছে ওভারহেড ল্যাম্প থেকে।

বুকে, পিঠে, কাঁধে আর মাথায় চাপা ব্যথা। মাথার ভিতরটা দপদপ করছে।

একটা গুহার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে সে। অমসৃণ পাথুরে মেঝে, দেয়ালও পাথরের। চমকে উঠে ভাবল রানা, কাম্পালা হিলের মধ্যে রয়েছে সে! সব মনে পড়ে গেল ওর। কিছুক্ষণ আগে...এইয্যাহ্, ঘড়ির দিকে চেয়েই অবাক হয়ে গেল রানা, সাড়ে দশটা বাজে, বন্ধ হয়ে নেই, চলছে অটোমেটিক ঘড়ি। পরমুহূর্তে চোখ পড়ল ওর লাল তিনটে অক্ষরের উপর। আজ রবিবার। তার মানে গত রাতে জ্ঞান হারিয়েছিল সে। এখন পরদিনের সকাল অথবা রাত সাড়ে দশটা। এতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল সে।

বামহাতের আস্তিন উপরে তুলেই পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে ব্যাপারটা। ছোট্ট একবিন্দু জখম দেখা যাচ্ছে। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল ওকে।

ম্যাচ আছে কিনা জিজ্ঞেস করার সাথে সাথেই বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিগ্রোটা ওর উপর। ঝট করে সামান্য একটু বাঁয়ে সরে প্রচণ্ড এক জুডো চপ কষিয়েছিল রানা ওর ঘাড়ের পাশে। ছোট্ট একটুকরো কাতর ধ্বনি বেরোল ওর মুখ থেকে, কিন্তু কাবু হলো না মোটেও। দড়াম করে একটা ঘুসি পড়ল রানার বুকের পাঁজরে, পরমুহূর্তে চোয়ালের উপর পড়ল সেই সমান ওজনের আরেকটা। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা। ক্ষুধার্ত বাঘের মত ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নিগ্রোটা। তারপর আর কিছু মনে নেই রানার।

গিলটি মিঞার কি অবস্থা?—ভাবল রানা। পালিয়েছে, না ধরা পড়েছে? যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে পুলিসে। এরা কি জানে যে ওর সাথে গিলটি মিঞাও ছিল? প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। জানলে ওদের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে কোন মুহূর্তে পুলিস এসে হাজির হবে, খানাতল্লাশী করবে সারা বাড়ি। আর একবার চারপাশে চাইল রানা। ওই বাড়িরই নিচের কোন ঘরে রাখা হয়েছে ওকে, নাকি অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছে?

পায়ের বাঁধনের দিকে মন দিল রানা। একটা স্টীলের ব্যান্ড পরানো আছে পায়ের কব্জির তিন ইঞ্চি উপরে। শক্ত হয়ে চেপে বসে আছে ব্যান্ডটা। তালাটা পরীক্ষা করেই বুঝতে পারল রানা একটা পেরেক বা তারের টুকরো পেলে এটা খুলে ফেলা খুব একটা কষ্টকর হবে না ওর পক্ষে। কিন্তু সেসব পরে ভাবা যাবে। ওর কাছে ওই রকম সরু শক্ত কোন জিনিস নেই এখন, আর থাকলেও পায়ের বাঁধন খুলে ফেলা মানেই যে এখান থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে, এমন তো নয়। আগে বুঝে নিতে হবে অবস্থাটা।

অন্ধকার গুহার শেষ মাথায় হঠাৎ আলো দেখা গেল। একটা টর্চ হাতে

এগিয়ে আসছে সেই দৈত্যের মত নিগ্রোটা। ওর দু'পাশে হাঁটছে দুটো উলফ্-হাউন্ড। গজ পঞ্চাশেক লম্বা হবে সরু গুহাটা। লম্বা পা ফেলে রানার সামনে এসে দাঁড়াল জংগু। বীভৎস হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

'বাহ্, জ্যান্ত হয়ে উঠেছেন দেখছি! আমার সাথে একটু আসতে হবে আপনাকে।' নিচু হয়ে তালা খুলে দিল জংগু, তারপর যেন কানে কানে পরামর্শ দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না। যে কাজ শেষ করতে পারবেন না, সেটা শুরু করতে যাওয়াটা বোকামি।'

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল কালো-পাহাড়। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানাকে।

আগে আগে চলল রানা, পিছনে টর্চ হাতে চলল জংগু, নীরবে অনুসরণ করছে ওকে হাউন্ড দুটো। লম্বা টানেলের মাঝামাঝি পৌঁছতেই বাম দিকে ইঙ্গিত করল জংগু।

'এই দিকে। আগে ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে তারপর নিয়ে যাব আপনাকে বসের ঘরে।'

সরু একটা প্যাসেজ ধরে কয়েক পা এগিয়ে কয়েক ধাপ পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা মস্ত স্টীলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'এগিয়ে যান, খুলে যাবে।' পিছন থেকে বলল জংগু। টিপ দিল দেয়ালের গায়ে বসানো একটা বোতামে।

রানা এগোতেই নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। সামনে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা করিডর। দেয়ালগুলো ধবধবে সাদা প্লাস্টিক পেইন্ট করা। সোজাসুজি সামনে একটা দরজা, করিডর ধরে ডানদিকে কয়েক পা এগোলে আরেকটা দরজা।

রানার পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে সামনের দরজাটা ঠেলে খুলে দিল জংগু।

'ঢুকে পড়ুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাথরুম সেরে বেরিয়ে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

ঝকঝকে পরিষ্কার চমৎকার আধুনিক বাথরুম। প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলল রানা। শেভ করে দু'মিনিট শাওয়ারে ভিজে দামী তোয়ালে দিয়ে গা মুছল, তারপর ছড়ে যাওয়া, থেঁতলে যাওয়া জায়গাগুলোতে ডেটল লাগিয়ে নিয়ে সিঁথি করল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, পুরু গোঁফজোড়া ঠিক করে নিল। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল খুট করে দরজা খুলে।

স্টীলের দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল জংগু, সোজা হয়ে গেল রানাকে দেখে, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল এগোবার জন্যে। এগোল রানা।

'ডাক্তারকে চটাবেন না,' পরামর্শ দিল জংগু। 'ওকে চটালে কপালে দুঃখ আছে আপনার।'

কয়েক পা এগিয়ে একটা দরজার গায়ে তিনটে টোকা দিয়ে হ্যান্ডেল

চেপে খুলে ফেলল জংগু সেটা। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকবার ইঙ্গিত করল রানাকে।

প্রকাণ্ড একটা অপারেটিং থিয়েটারে ঢুকল রানা। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আর কলকজা দেখে টের পেল এটা সাধারণ অপারেটিং থিয়েটার নয়। মহা মূল্যবান, আধুনিক যন্ত্রপাতি, যেগুলো বিদেশী যে কোন বড় হাসপাতালের গর্বের বিষয় হতে পারত, সে সব এখানে উপস্থিত।

এককোণে একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে সাদা অ্যাপ্রন পরা বেঁটে-খাটো কুঁজো একজন লোক। শরীরের তুলনায় মাথাটা প্রকাণ্ড মনে হয়। ড্যাবডেবে দুই ঘোলাটে চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। গালভর্তি দশ-বারো দিনের না-কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি। লোকটার চোখের খেপাটে দৃষ্টিতে কি যেন রয়েছে, যেটার দিকে চেয়ে ছমছম করে উঠল রানার গা।

'আমার নাম ডক্টর জাগজীওন যোশী, এফ.আর.সি.এস, ব্রেন স্পেশালিস্ট।'

পিনপিনে গলার স্বর শুনে হেসে ফেলতে যাচ্ছিল রানা, ডিগ্রির বহর শুনে সামলে নিল। উঠে দাঁড়াল ডক্টর যোশী, টেবিলের উপর থেকে পুরু লেন্সের চশমাটা তুলে নিয়ে কাঁপা হাতে চোখে আঁটল, তারপর ঠিক শিম্পাঞ্জীর ভঙ্গিতে লম্বা দুটো হাত ঝুলিয়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল রানার সামনে।

'আঘাতগুলো আমি আগেই পরীক্ষা করে দেখেছি। মারাত্মক কিছু নয়। আসুন, ড্রেসিং করে দেয়া যাক।'

'তার দরকার হবে না,' বলল রানা। 'ডেটল লাগিয়ে নিয়েছি। এমনিতেই সেরে যাবে।'

'ঠিক আছে, যেমন আপনার অভিরুচি,' চিকন কণ্ঠে বলল ডাক্তার। 'মাথা ধরার জন্যে কোন ওষুধ দেব?'

'না, ধন্যবাদ।'

কপাল কুঁচকে গেল ডাক্তারের। দুই চোখে সন্দেহ।

'রিফিউয করছেন যে বড়? কেউ কিছু বলেছে আমার নামে? নিশ্চয়ই কিছু শুনেছেন আপনি আমার…'

'আপনার সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি আমাকে,' বলল রানা।

বিশ্বাস করল না ডাক্তার রানার কথা। ঝট করে ঘুরে শিম্পাঞ্জীর ভঙ্গিতে পা ফেলে বসল গিয়ে নিজের চেয়ারে। বিচিত্র এক টুকরো হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে।

'ঠিক আছে। যান। কিন্তু জেনে রাখুন, আবার আসতে হবে আপনাকে আমার কাছে। তখন আর রিফিউয করবার উপায় থাকবে না।' ঘোলাটে চোখ পাকাল ডক্টর যোশী।

'এ কথার মানেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না,' বলল রানা।

'পারবেন। সবই বুঝিয়ে দেয়া হবে আপনাকে সময় হলেই।' সিগারেট শেষ করে ঘরের মধ্যে চলে এসেছে জংগু, তাকে নির্দেশ দিল, 'একে নিয়ে যাও এখান থেকে।' আঙুল দিয়ে দরজা দেখাল ডক্টর যোশী। থরথর করে

কাঁপছে হাতটা।

বেরিয়ে এল রানা ডাক্তারের ঘর থেকে। সসম্ভ্রমে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পিছন পিছন চলল জংগু, তার পিছনে হাউন্ড দুটো।

'এবার বিগ্ বসের ঘরে। সাবধান! উল্টা-সিধা কিছু বললে দুঃখ আছে কপালে।'

'তোমাদের এখানে সব ক'টার মাথায় ছিট আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেসে উঠল জংগু।

'ঠিক বলেছেন! আমি ছাড়া সবার মাথাতেই আছে।' বামদিক থেকে আরেকটা প্যাসেজ এসে মিশেছে এই করিডরে, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এইদিকে।'

কিছুদূর এগিয়ে একটা স্টীলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দেয়ালের গায়ে একটা বোতাম টিপে ধরল জংগু। ধীরে ধীরে খুলে গেল ভারী দরজাটা। দরজার ওপাশে প্রশস্ত একটা সিঁড়িঘর। সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। জংগুর ইঙ্গিতে উপরে উঠতে শুরু করল রানা । দশ ধাপ পর পর ল্যান্ডিং। পঁয়ত্রিশ ধাপ উঠে থেমে দাঁড়াল আরেকটা স্টীলের দরজার সামনে। আরেকটা বোতাম টিপে ধরল জংগু।

'আসফ খানকে নিয়ে এসেছি, বস্।' দেয়ালের দিকে ফিরে বলল জংগু।

রানা দেখল, দেয়ালের গায়ে একটা মাইক্রোফোন বসানো আছে। তিন সেকেন্ড পর নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা, পিছন থেকে মৃদু ঠেলা দিল জংগু রানার পিঠে। প্রকাণ্ড একটা সুসজ্জিত কামরায় ঢুকে পড়ল রানা দেয়ালে বসানো একটা খোলা আলমারির মধ্যে দিয়ে। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের পুরু কার্পেটের উপর। বারান্দার দিকে একটা দরজা খোলা, সবুজ লনে রোদের সমারোহ, ফুলগাছগুলো দুলছে মৃদুমন্দ বাতাসে, শিরশির করছে ইউক্যালিপ্টাস গাছের চিকন লম্বা পাতা। এক লাফে বারান্দায় পড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে লনে নেমে ছুটে পালাবার ইচ্ছেটা বহুকষ্টে দমন করল রানা। কারণ, কুকুরগুলো, যেন রানার মনোভাব টের পেয়েই ওর পায়ে গা ঘষে চলে গেল বারান্দায়, দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে গেল প্রহরীর মত।

গদি আঁটা চেয়ারে বসে আছে কবির চৌধুরী এদিকে মুখ করে। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানাকে, তারপর বাম হাতে ইঙ্গিত করল সামনের চেয়ারটায় বসবার জন্যে। বাম হাতের অনামিকায় দশ ক্যারেটের একটা হীরার আংটি ঝিক করে উঠল।

'বসুন, মিস্টার আসফ খান। আপনাকে এভাবে আমাদের মধ্যে পাব তা কল্পনাও করতে পারিনি। আশাতীত ব্যাপার। খুবই আনন্দ হচ্ছে। বসে পড়ুন।' পরিষ্কার বাংলা শুনে রানার অবাক হওয়ার ভান দেখে হাসল। 'আমি বাঙালী। বাংলাদেশেই জন্ম। আসল নাম কবির চৌধুরী। ছদ্মনাম ব্ল্যাক স্পাইডার।'

এগিয়ে এসে নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা। ওপাশের একটা দরজা

খুলে ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল একজন সাদা উর্দি পরা বেয়ারা। টেবিলের উপর একটা কেক বিস্কিট বোঝাই বড়সড় প্লেট নামিয়ে দুটো কাপে কফি ঢেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আপনার নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে, মি. আসফ খান?' বলল কবির চৌধুরী। 'বড় ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে সকালটা, তাই আপনার সুখ-সুবিধের দিকে নজর দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিন, যাহোক কিছু মুখে দিন, তারপর আলাপ করা যাবে।'

সত্যিই, খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে ওর। একটা পেস্ট্রি তুলে নিয়ে কফির কাপ সামনে টেনে নিল রানা। ওর ঠিক তিন হাত পিছনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জংগু। বাম হাত তুলে ওকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করল কবির চৌধুরী।

'তুমি এখন যেতে পারো, জংগু। দরকার পড়লে বেল বাজাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে গেল জংগু।

সারা ঘরে চোখ বুলাল রানা একবার। টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়ে রাখা দুটো পেপার ওয়েটের উপর থমকে গেল ওর দৃষ্টিটা এক সেকেন্ডের জন্যে, তিন সেকেন্ডের জন্যে থামল একটা আলমারির মাথায় দেড় ইঞ্চি ব্যাসের দেড়ফুট লম্বা কাঠের রুলারটার উপর। দ্রুত একটা হিসাব-কিতাব হয়ে গেল ওর মনের মধ্যে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে দুই কদম গেলেই ডাণ্ডাটা চলে আসবে ওর হাতে। খুব একটা জখম হওয়ার আগেই ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে সে কুকুর দুটোকে। তার আগেই অবশ্য একটা বাড়ি দিয়ে নিতে হবে ওই হারামজাদাটার মাথায়। এই ঘরটা ম্যানেজ হয়ে যাবে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে, কিন্তু তারপর? জংগু কতটা দূরে আছে এখান থেকে? কাল রাতের সেই স্টেনগানধারী গার্ড চারজন কি এখনও টহল দিচ্ছে বাইরে? লন পেরিয়ে, ঝোপঝাড় পেরিয়ে পাঁচ-ছয়শো গজ যেতে হবে ওকে দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছতে। তেরো ফুট উঁচু দেয়ালের উপর ওঠার সুবিধের জন্যে গিলটি মিঞা নেই এখন আর ওর অপেক্ষায়। তার উপর রয়েছে বাকি দুটো কুকুর। কাজেই···চিন্তাটা দূর করে দিল রানা মাথা থেকে। মন দিল কফির কাপে।

রানার মুখের দিকে চেয়ে ছিল কবির চৌধুরী। মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'আপনি বড় ভয়ানক লোক, মিস্টার আসফ খান,' শান্ত কণ্ঠে বলল কবির চৌধুরী। 'এবং বুদ্ধিমান। এক সেকেন্ডের জন্যে আমার ভয় হয়েছিল ঝোঁকের বশে হঠাৎ কোন হঠকারিতা করে বসবেন বুঝি। ওই রুলারটা লোভ জাগায়। কিছুদিন আগে আমার আর এক অতিথি হঠাৎ ওটা ব্যবহার করবার জন্যে খেপে উঠেছিলেন। ওই পর্দাটার আড়াল থেকে গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল লোচন।' কফির কাপে চুমুক দিল কবির চৌধুরী। 'বেশ ভাল কফি। কাপটা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসুন। দয়া করে কোন বোকামি করে বসবেন না।'

নির্বিকার মুখে পর্দাটার দিকে চাইল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে মন দিল কফির কাপে। শেষ চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল একটা। নড়েচড়ে বসল আরাম করে।

'আচ্ছা, চেনা চেনা লাগছে কেন বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী। 'মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে, কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কাগজে ছবি দেখে থাকবেন হয়তো,' বলল রানা শান্ত কণ্ঠে।

'সেটা সম্ভব। এখানে কেন এসেছেন, মি. আসফ খান? প্রতিশোধ নিতে?' রানার চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল কবির চৌধুরী।

'শুধু আমি একা নই, পুলিসও আসছে,' বলল রানা।

'আসছে নয়, বলুন, এসে গেছে।' হাসল কবির চৌধুরী। 'এসে চলে গেছে। আজ সকালে ছয়জন পুলিস অফিসার এসেছিল আপনার খোঁজে। ইচ্ছে করলে গর্ব বোধ করতে পারেন, আপনার জন্যে খোদ পুলিস কমিশনার পায়ের ধূলি দিয়ে গেছেন আজ এখানে। উনি নিজে না এলে কাম্বালা থানার পুলিসদের দিয়ে এ বাড়ি সার্চ করানো মুশকিলই হয়ে যেত। এই অঞ্চলে মস্ত লোক আমি। কোথাকার কে এক লোক আমার নামে যা-তা একটা বাজে অভিযোগ নিয়ে এসে তেমন সুবিধে করতে পারার কথা নয়, কিন্তু আপনার লোক নাকি বুদ্ধি করে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করেছিল, ফলে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে পুলিস। ওদের ক্ষমা চাওয়ার বহর দেখে হাসি চেপে রাখাই মুশকিল হয়ে পড়েছিল আমার পক্ষে। যাই হোক, আমার কথাবার্তা শুনে বাড়িটা সার্চ না করেই চলে যাচ্ছিল ওরা, কিন্তু এই সুযোগ কি আমি ছাড়ি? বাধ্য করলাম ওদের বাড়ি সার্চ করতে। তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই বাড়ির নিচে যে ঘরগুলো বানিয়েছি তার গোপন দরজা কিছুতেই খুঁজে পেল না ওরা। পাওয়া সম্ভব নয়। আপনিই বলুন, কে সন্দেহ করবে এই আলমারির ভেতর দিয়ে আবার গুপ্ত পথ থাকতে পারে? বাড়িটা সার্চ হয়ে যেতেই আমি একটু একটু করে রেগে উঠতে শুরু করলাম। কোথাকার কে এক বাঙালী কোটিপতি কেনই বা আমার বাড়ির দেয়াল টপকে চোরের মত ভেতরে ঢুকবে, আর তার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কেনই বা আমাকে দায়ী করা হবে ভেবে পেলাম না আমি। বললাম, প্রায় দেড়শো একর জমি আছে আমার বাউন্ডারির ভেতর, কোন ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাপের কামড় খেয়ে মরে পড়ে আছে হয়তো দেখুন খুঁজে। দেখা হলো। নেই। দীঘিতে ডুবে মরেছে কিনা দেখুন। দেখা হলো। নেই। এইবার একেবারে রাজকীয় রোষে ফেটে পড়লাম আমি। কে সেই চুনোপুঁটি যে নালিশ করেছে যে আমি তার মনিবকে ধরে আটকে রেখেছি? মাথা খারাপ, নাকি রসিকতা করছে লোকটা? পুলিস ঠিক জানে সে লোক সত্যি সত্যিই নিখোঁজ হয়েছে কিনা? সমস্ত নিষিদ্ধপল্লী কি খোঁজ করা হয়েছে এখানে আসবার আগে? কী উদ্ভট কথা বলছেন আপনারা যে আমিই ব্ল্যাক স্পাইডার? কি প্রমাণ আছে আপনার বা সেই চুনোপুঁটির হাতে?' হাসল কবির চৌধুরী।

'আমার ন্যায়সঙ্গত রাগ দেখে শেষকালে পায়ে ধরতে বাকি রাখল পুলিস কমিশনার সাহেব। তেপ্পান্ন বার মাফ চেয়েছে আমার কাছে। আমি শুনেছি। এই চমৎকার মজার একটা সকালের জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, মি. আসফ খান।'

হতাশা গোপন করার চেষ্টা করল রানা সাধ্যমত। কিন্তু পারল না।

'আপনার কাছে হয়তো খুবই মজা লাগছে, কিন্তু আমার কাছে তা লাগছে না। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছি না। আমাকে যদি বাকি জীবনটা এখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হয়...'

'না, না, না, না।' অমায়িক কণ্ঠে বলে উঠল কবির চৌধুরী। 'তা কেন হবে? আপনার যখন খুশি চলে যেতে পারেন আপনি এখান থেকে। আপনাকে আটকে রাখার কোন ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু চলে যেতে হলে আমার দুটো শর্ত আপনাকে মানতে হবে। প্রথম শর্ত, আপনাকে কথা দিতে হবে, ভবিষ্যতে আমার পেছনে লাগবেন না, এবং এখানে যা দেখলেন, শুনলেন সব গোপন রাখবেন। আপনি মানী লোক, আপনার কথার দাম আছে। আমার বিশ্বাস, কথা দিলে আপনি কথার খেলাপ করবেন না। আপনার কথায় আমি আস্থা রাখতে রাজি আছি। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, মুক্তির জন্যে কিছু মুক্তিপণ দিতে হবে আমাকে। আপনি ধনীলোক, যা চাইব সেটা আপনার পক্ষে কিছুই না। ভেবে দেখুন, দেয়াল টপকে এখানে ঢুকে আপনি আমাদের কম অসুবিধের মধ্যে ফেলেননি। লাখ দশেক পেলেই আমি মনে করব ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে আমার।'

'দ-শ লাখ টাকা!' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'হ্যাঁ। দশ লাখ। কিন্তু বাংলাদেশী টাকা নয়, আমি চাইছি দশ লাখ ডলার,' হাসল কবির চৌধুরী। 'প্রচুর ব্ল্যাক-মানি জমিয়েছেন আপনি সুইস ব্যাংকে। ওর একটা সামান্য অংশ বোম্বে শাখায় ট্র্যান্সফার করে আনতে বেশি সময় লাগবে না।'

'আমি যদি রাজি না হই?'

'সেটা আপনার খুশি। আপনার ওপর জোর খাটাতে যাব না। কারও ওপর জোরাজুরি করাটা মোটেই পছন্দ করি না আমি। যারা আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়, তাদের ভার ছেড়ে দিই আমি ডক্টর যোশীর হাতে। ওর সাথে পরিচয় হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ও একজন ব্রেন স্পেশালিস্ট। অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। গোটা কয়েক বেপরোয়া অস্ত্রোপচারের পর আত্মগোপন করে আছে পুলিসের ভয়ে। খুনের দায়ে খুঁজছে ওকে পুলিস। আমি আশ্রয় দিয়েছি ওকে, ওর গবেষণার জন্যে যা যা প্রয়োজন সব কিনে দিয়েছি। শুধু যন্ত্রপাতিই নয়, ওর গবেষণার জন্যে জ্যান্ত মানুষও সরবরাহ করি আমি। ওর ধারণা, সূক্ষ্ম কয়েকটা জটিল অপারেশনের মাধ্যমে ইচ্ছে করলে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। গত দেড় বছর ধরে কাজ করছে ও এই থিয়োরীর ওপর। ধরুন,

একজন লোক খুব ভীতু, তাকে সাহসী করে দেয়া যায়; একজনের কিছু মনে থাকে না, তার স্মরণশক্তি বাড়িয়ে দেয়া যায়; একজনের কাজে মন বসে না, তার মধ্যে প্রচণ্ড কনসেনট্রেশন এনে দেয়া যায়; ফাঁকিবাজ লোককে কর্মঠ বানিয়ে দেয়া যায়—এরকম আরও অসংখ্য ব্যাপার। সফল হলে একটা বিপ্লব হয়ে যাবে সারা দুনিয়ায়। ধরুন, কোন দেশের সৈন্যগুলোকে দুর্দান্ত সাহসী করে দেয়া গেল; পলিটিশিয়ানগুলোর স্মরণশক্তি বাড়িয়ে দেয়া গেল দশ গুণ; আমলাগুলোর কাজে মন বসে না, কনসেনট্রেশন এনে দেয়া গেল, শ্রমিকগুলো অলস, ফাঁকিবাজ, তাদের ছোট্ট একটা অপারেশন করে বানিয়ে দেয়া হলো দারুণ কর্মঠ। কল্পনা করুন! একটা দেশের ভোলই পাল্টে যেতে পারে এর ফলে। সর্বস্তরে যদি এই অপারেশন চালানো যায় তাহলে একটা জাতি কোথায় উঠে যেতে পারে চিন্তা করুন। কেউ রুখতে পারবে সে জাতিকে? গোটা পৃথিবীকেই বদলে দেব আমি। কিন্তু ঠিক করেছি শুরু করব বাংলাদেশ থেকে। কল্পনা করে দেখুন বাংলাদেশের চাষীগুলো বেদম কাজ করছে মাঠে, শ্রমিকরা কল-কারখানায় জান বের করে দেয়ার উপক্রম করছে কাজের ঠেলায়, চোরাচালানি, মজুতদার আর রাজনৈতিক ট্যান্ডেলগুলো সব সৎ হয়ে গিয়ে দাড়ি রেখে দিয়েছে, আমলাগুলো ঘুষের নাম শুনলেই ঘুসি বাগিয়ে আসে, নেতারা নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, পরেও সেসব মনে রাখতে পারছে এবং সেইমত কাজ করছে, ছাত্ররা ছাত্রাবাসে গোলাগুলি না ছুঁড়ে মন দিয়ে অধ্যয়ন করছে, ব্যবসায়ীরা পাঁচ পার্সেন্ট মুনাফাতেই মাল ছাড়ছে বাজারে,—আর কে বাকি থাকল?—ও, হ্যাঁ, বুদ্ধিজীবী, এদের সুবুদ্ধির চেয়ে কুবুদ্ধিই বেশি, তার চেয়ে বেশি নির্বুদ্ধিতা, এদের সব ফরেন সার্ভিসে পাঠিয়ে দেব, উল্টোপাল্টা কথা বলে সারা বিশ্বের চোখ ঘোলাটে করে দেবে, দেশে কি আশ্চর্য গঠনমূলক কাজ চলেছে টের পাবে না বাইরের কেউ। তিনটা বছর। তারপরই সোনায় ভরে উঠবে সোনার বাংলা, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বাঙালী দুনিয়ার সেরা জাতি হিসেবে। কল্পনা করতে পারেন?'

চুরুটটা নিভে গিয়েছিল বক্তৃতার চোটে, সেটা ধরিয়ে নিয়ে লজ্জিত হাসি হাসল কবির চৌধুরী।

'এ শুধু একটা দিক—আরও অনেক কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে আমার, সে সব গবেষণাও চলছে, কিন্তু দেখেছেন, আসল কথা থেকে সরে গিয়েছি আমি বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মত। যাই হোক, জগজীবন যোশীর এক্সপেরিমেন্ট এখন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, থিওরীটাও পুরোপুরি ডেভেলপ হয়নি। ওর কাজটা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিতে হলে প্রচুর লোক দরকার, হাতে কলমে দেখা দরকার কাটাছেঁড়া করে। কাজেই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ গেলে তাকে তুলে দিই আমি ওর হাতে। মাসখানেক আগে এক বোম্বাইয়া ফিল্ম প্রডিউসার টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল, ওর অবস্থাটা একবার নিজ চোখে দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার কাছে। খুবই উঁচুদরের উচ্চাভিলাষী অস্ত্রোপচার—কিন্তু অসফল। হাত দুটো নড়াবার ক্ষমতা নেই আর প্রডিউসার সাহেবের, কথা বলে আড়াই বছরের শিশুর

ভঙ্গিতে, স্মরণশক্তি অলমোস্ট নিল্। যোশী অবশ্য আবার অপারেশন করে এইসব দোষ সারিয়ে তোলার কথা ভাবছে, কিন্তু আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। আবার অপারেশন করলে আরও খারাপ হবে অবস্থা। কাল রাতে আপনাকে দেখেই ওর মাথায় এসেছে, অপটিক নার্ভকে রিজুভেনেট করা যায় কিনা দেখা উচিত আপনার ওপর পরীক্ষা চালিয়ে। তর সইছে না ওর। আমি অপেক্ষা করতে বলেছি ওকে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে আপনাকে ওর হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকবে না। তার আগে আপনাকে আর একটা বিষয়ে পরিষ্কার জানিয়ে রাখা ভাল। যোশীর থিওরীগুলো প্রত্যেকটাই ব্রিলিয়্যান্ট এবং ইঞ্জিনিয়াস, কিন্তু এত মদ খায় যে সর্বক্ষণ হাত দুটো কাঁপে ওর। বিশেষ করে অপারেশনের আগে তো পুরো এক বোতল হুইস্কি ওর খাওয়া চাই-ই। ফলে সূক্ষ্ম অপারেশনের সময় ব্রেনের কোথায় যে খোঁচা লেগে যাচ্ছে, কোন্‌টা কাটতে গিয়ে কোন্‌টা কাটছে সে হুঁশ থাকে না ওর। ওর হাতে পড়লে আমার যতদূর বিশ্বাস, চোখ দুটো তো যাবেই, যে কোন অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়ে যাবে আপনার।'

কবির চৌধুরীর হাসি হাসি মুখটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল রানা কয়েক সেকেন্ড, তারপর ঢোক গিলল। জিভটা শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই সাথে একটা প্রচণ্ড রাগও উঠতে আরম্ভ করেছে ব্রহ্মতালুতে। টেবিলের উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কণ্ঠনালীটা খামচে ধরে একটানে ছিঁড়ে ফেলার কথা খেলে গেল মাথায়। ক্রমে লাল হয়ে উঠছে ওর চোখ দুটো।

'মরণ এসেছে তোমার, কবির চৌধুরী!' বলল রানা। 'প্রথম সুযোগেই খুন করব আমি তোমাকে। তৈরি থেকো।'

'অক্ষমের এরকম অনেক আস্ফালন শুনেছি আমি, মিস্টার আসফ খান।' হাসি ফুটে উঠল কবির চৌধুরীর মুখে। ডেস্কের গায়ে একটা বোতাম টিপল। সাথে সাথেই ঘরে ঢুকল জংগু। 'সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে একঘণ্টা সময় দেব আমি আপনাকে। যদি টাকা দিতে রাজি থাকেন, তাহলে জেনেভার অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং কর্পোরেশনে চিঠি দেবেন আপনি ওদের বোম্বে শাখায় দশ লক্ষ ডলার পাঠাতে। টাকাগুলো আমার হাতে পৌঁছনোর সাথে সাথে ছেড়ে দেয়া হবে আপনাকে।'

'ছেড়ে যে দেয়া হবে তার নিশ্চয়তা কি?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার মুখের কথায় আস্থা রাখতে হবে আপনার। আর কোন নিশ্চয়তা নেই। আমি কথা দিচ্ছি, ছেড়ে দেব।' এক টুকরো হাসি ফুটল কবির চৌধুরীর মুখে। 'আমিও আপনার মুখের কথায় আস্থা রাখব যে আপনি আর আমার পিছু লাগবেন না, এখানে যা দেখলেন এবং শুনলেন সব গোপন রাখবেন। আমার কথায় বিশ্বাস না করলে আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করব কি করে বলুন?' জংগুর দিকে ফিরল কবির চৌধুরী। 'একে নিয়ে যাও বন্দী-গুহায়।'

ব্ল্যাক স্পাইডার-২

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৭৪

এক

ঠিক বেলা দেড়টায় টোকা পড়ল আরতি লাহিড়ীর শোবার ঘরের দরজায়।

সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ছোট্ট একটা ঘর। আলো বাতাসের এমন চমৎকার ব্যবস্থা যে বলে না দিলে কারও বুঝবার উপায় নেই ঘরটা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে ত্রিশ ফুট নিচে। মসৃণ দেয়াল, প্লাস্টিক পেইন্ট করা।

একরাশ উদ্বেগ আর অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি করছিল আরতি, ঘরে টোকা পড়তেই উঠে বসল তড়াক করে। ভয়ে ভয়ে চাইল বন্ধ দরজার দিকে। কে? জংগু নয়তো! পা টিপে চলে এল দরজার পাশে।

'দরজা খোলো, আরতি।' চিরঞ্জীবের গলা।

দরজাটা খুলে দিয়ে বিছানায় এসে বসল আরতি। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের টুলটা টেনে নিয়ে সামনে বসল চিরঞ্জীব। লক্ষ করল, আতঙ্ক দূর হয়নি আরতির এখনও।

'কি ব্যাপার, চিরঞ্জীব? কি হচ্ছে ওপরে? আমাকে আটকে রাখা হয়েছে কেন নিচে?'

'আটকে নয়, নিরাপদে রাখা হয়েছে তোমাকে। পুলিস এসেছিল সকালে। তোমার সেই আসফ খানকে খুঁজতে। না পেয়ে তেপ্পান্ন বার মাফ চেয়ে চলে গেছে।'

'ওই লোকটা কোথায়?'

'বন্দী-গুহায়। ধরা পড়েছে কাল। দেয়াল টপকে ঢুকেছিল।'

'এ বাড়ি চিনল কি করে?' কেঁপে গেল আরতির কণ্ঠস্বর।

'তা জানি না। অত ভয় পাওয়ারও কিছুই নেই। ওকে হাতের মুঠোয় পেয়ে মনিব দারুণ খুশি। দশ লাখ ডলারের একটা ছোট্ট কামড় বসাচ্ছে। তেরো কোটি টাকার মালিক লোকটা।'

'তাহলে মাত্র দশ লাখ ডলার নেয়া হচ্ছে কেন?'

'এটা প্রথম কিস্তি। এর বেশি চাইলে কারেনসি ট্রাবল দেখা দেবে। আসফ খান মনে করছে এই এক কিস্তি টাকা দিয়েই পার পেয়ে যাবে। আসলে পুরো তেরো কোটি টাকা গুনে দিয়ে যেতে হবে ওকে এখান থেকে। যখন যাবে, পা দুটো বেরোবে আগে, শরীরটা থাকবে খাটিয়ার ওপর, কাফনে মোড়া।'

চোখ-মুখ কুঁচকে গেল আরতির এই ভয়াবহ বর্ণনা শুনে। জিজ্ঞেস করল,

'আসফ খান জানে না সেটা?'

'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। অন্তত আঁচ তো করা উচিত ছিল। রেগেমেগে হৈ-হুলুস্থুল করবে আশা করেছিলাম, কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখতে পেলাম না ওর মধ্যে। লক্ষ্মী ছেলের মত যা বলা হচ্ছে তাই করছে লোকটা। চিঠি লিখে দিয়েছে ওর ব্যাংকে বোম্বেতে দশ লাখ ডলার ট্র্যান্সফার করবার জন্যে। মনিবও একটু অবাক হয়ে গেছে লোকটার ভালমানুষী দেখে। লোকটা হয়তো ভয় পেয়েছে দারুণ। যাই হোক, চিঠিটা ওর সেক্রেটারির হাতে পৌঁছে দিতে হবে তোমাকে। এই চিঠি নিয়ে যেতে হবে ওকে জেনেভায়।'

কথাটা শুনেই আড়ষ্ট হয়ে গেল আরতি।

'আমাকে চিঠি নিয়ে যেতে হবে। তার মানে?'

'হ্যাঁ। ওর জুহু বীচের বাংলোয় তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে এ চিঠি। ঘাবড়াবার...'

'আমাকে কেন?' গলার স্বর একটু চড়ে গেল আরতির। 'তুমি, জংগু বা মহাবীর, কিংবা আর কেউ...'

'আমাকে বলে লাভ নেই, আরতি,' কড়া গলায় বলল চিরঞ্জীব। 'মনিবের হুকুম। তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে এটা।'

'যত রাজ্যের জঘন্য কাজগুলোতেই আমাকে বাচাই করা হয় কেন বলতে পারবে?'

'এই কাজের মধ্যে জঘন্য কি দেখলে তুমি?'

'আমাকে ধরে পুলিসে দিলে তখন? ঢাকায় বেঁচে গেছি একবার ধরা পড়তে পড়তে।'

'ওসব কথা বাদ দাও, আরতি,' একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল চিরঞ্জীব। 'কোন বিপদ নেই এই কাজে। ওখানে পুলিস আসবে কোত্থেকে? আর আসফ খানের লোক তোমার গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ও আমাদের হাতে রয়েছে। কাজেই...'

'আমাকে রেহাই দাও, চিরঞ্জীব।' আকুল আবেদন ফুটে উঠল আরতির চোখে। 'আর কাউকে পাঠাও। আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না।'

'তুমি জানো না, আরতি, তোমাকে বলা ঠিক হচ্ছে কিনা জানি না,' সোজা আরতির চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল চিরঞ্জীব, 'তোমার সামনে বিপদ দেখতে পাচ্ছি আমি। এর মধ্যে তুমি থাকতে চাও কি চাও না, সেটা বলার উপযুক্ত সময় এটা নয়। ঠিক তিনটের সময় পৌঁছতে হবে তোমাকে আসফ খানের বাংলোয়। এটা হুকুম।'

শেষের কথাগুলো আরতির কানে ঢুকল না। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। উঠে দাঁড়িয়েছে বিছানা ছেড়ে।

'বিপদ! বিপদ মানে?'

'মানেটা ডিকশনারিতে দেখে নিও। তোমার ওপর আর মনিবের তেমন আস্থা আছে বলে মনে হয় না। তার মতে জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করবার

ক্ষমতা নেই তোমার, একটুতেই নার্ভাস হয়ে গিয়ে কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারো। খুব সম্ভব তোমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এই চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে।'

বসে পড়ল আরতি বিছানার ধারে। পায়ে জোর পাচ্ছে না।

'কাজটা মোটেই কঠিন নয়, আরতি,' শান্ত কণ্ঠে বলল চিরঞ্জীব। 'পরীক্ষা হিসেবে কিছুই না। নিজেকে এখন সামলে নেয়া দরকার তোমার। মনিবের চোখ রয়েছে তোমার ওপর। এর মানেটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না তোমাকে?'

মেঝের দিকে চেয়ে বসে রইল আরতি। কোন কথা বলল না।

'এই যে চিঠি,' বলল চিরঞ্জীব। বুক পকেট থেকে একটা খাম বের করে রাখল ড্রেসিং টেবিলের উপর। 'ঠিকানাটা লেখা আছে খামের ওপর। চিনে যেতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'ওখানে সালমা বলে আসফ খানের এক সেক্রেটারি আছে। তাকে বলবে খান সাহেব ভালই আছেন, বোম্বে থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওকে। আগামী কাল সকাল দশটার ফ্লাইটে জেনেভা যেতে হবে ওকে। সেখানে আসফ খানের ব্যাংকে গিয়ে দিতে হবে এই চিঠি। এত টাকা বোম্বেতে আনা হচ্ছে কেন সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠলে ওকে বলতে হবে কাম্বালা হিলে একটা বাড়ি কিনবার ইচ্ছে আছে ওর। মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে পুলিসের কাছে এ ব্যাপারে টুঁ শব্দ করলে বিপদ ঘটবে আসফ খানের। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল আরতি।

'ঠিক আছে। ঠিক তিনটের সময় পৌছতে হলে দুটোর সময় বেরিয়ে যেতে হবে তোমাকে এখান থেকে। তৈরি হয়ে নাও। অস্টিনটা নিয়ে যেয়ো।' এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরাল চিরঞ্জীব। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'তোমার ব্যাপারটা গেল, এবার অন্য একটা ব্যাপারে আলাপ করা যাক। মোস্তাক লোকটাকে কেমন বুঝলে? কি রকম লোক?'

অবাক হয়ে চিরঞ্জীবের মুখের দিকে চাইল আরতি।

'মোস্তাক? খুব খারাপ লেগেছে ওকে আমার। চালু লোক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়ানক দুর্ধর্ষ। কেন?'

'ওর ওপর মনিব খুবই সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। আমার জায়গায় ওকে বসাবার মতলব আছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভাবছি, খামোকা ভয় দেখাবার লোক কবির চৌধুরী নয়। তোমার ব্যাপারে আমার ওপরেও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে সে। তোমার সাথে আমার ভাবটা সুনজরে দেখছে না। আভাস দিল, আমি নাকি তেজ হারিয়ে ফেলছি ক্রমে।'

'তাহলে আমাদের এখান থেকে সরে পড়া দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আরতি। হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে ফেলেছে সে।

'আমার কথা শোনো, চিরঞ্জীব। পুলিসের হাত থেকে যদি বেঁচে যাইও, কবির চৌধুরীর হাত থেকে বাঁচতে পারব না। সময় থাকতে কেটে না পড়লে শেষ করে দেবে ও আমাদের। পালিয়ে যাওয়া উচিত, তুমি বুঝতে পারছ না, চিরঞ্জীব, দিন ঘনিয়ে এসেছে আমাদের।'

'থামবে তুমি?' ধমকে উঠল চিরঞ্জীব। কেমন যেন খেপাটে দেখাচ্ছে ওকে। 'তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আরতি, আর এসব কথা মুখে আনবে না। কবির চৌধুরীকে চিনলে একথা মুখ দিয়ে বের করতে পারতে না। ওর বিরুদ্ধে যাওয়া আমাদের পক্ষে এক কথায় অসম্ভব। কথাটা ভাল করে মনের মধ্যে বসিয়ে নাও। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, বলির পাঁঠার মত অপেক্ষা করাই তোমার ইচ্ছে,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল আরতি। 'যদিও জানো, যে কোন মুহূর্তে নেমে আসতে পারে খাঁড়া। মোস্তাককে এখানে নিয়ে এলে তোমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?'

'কী হবে?' উন্মাদের দৃষ্টিতে আরতির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল চিরঞ্জীব, যেন ও-ই মোস্তাক। 'ওকে টাইট দিতে পারব না? তুমি আমাকে কি ভেবেছ? কবির চৌধুরী পর্যন্ত পৌঁছতে হবে না বাছাধনকে। একেবারে সাফ করে দেব।'

'তার আগে তুমিই না সাফ হয়ে যাও কবির চৌধুরীর হাতে, দেখো।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল চিরঞ্জীব। খপ করে ধরল আরতির দুই বাহু। টেনে দাঁড় করাল ওকে।

'মরণ ছিল্লিয়ে ধরেছে তোর, হারামজাদি। খবরদার, আরতি। আজ পর্যন্ত গায়ে হাত তুলিনি আমি, তাই বলে ভিজে বেড়াল মনে কোরো না আমাকে। বাড়াবাড়ি করলে খুন হয়ে যাবে।' জোরে একটা ঝাঁকি দিল সে আরতিকে। 'শোনো। আমাদের দু'জনের কারও এখান থেকে বেরোবার রাস্তা নেই। গলা পর্যন্ত ডুবে আছি আমরা এর মধ্যে। তুমি চাও আমি কবির চৌধুরীকে বলে দিই নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে তোমার? জানিয়ে দিই পালিয়ে যাওয়ার মতলব করছ তুমি? জানো কি অবস্থা হবে তখন তোমার? ডক্টর যোশীর হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। এখনও যদি সাবধান না হও, তোমার ব্যাপারে আমার আর কোন দায়িত্বই থাকবে না। মনিবকে বলেছিলাম, শুধরে নেব তোমাকে, দায়-দায়িত্ব সব আমার। কিন্তু মনে কোরো না, তোমার জন্যে হাড়িকাঠে ঘাড় পাতব আমি।'

হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল আরতির দেহটা।

'ঠিক আছে, চিরঞ্জীব,' বলল সে। 'একটু বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক হয়ে যাবে।'

'সেটা তোমার জন্যেই মঙ্গল হবে,' বলল চিরঞ্জীব, 'তোমার জন্যে কেন এতটা করি জানো না তুমি? তোমার ওপর দুর্বলতা আছে আমার, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে খামখেয়ালী করে আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারো না তুমি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'তুমি কেন ভয় পাচ্ছ, বুঝতে পারছি না, আরতি। আমি তো আছি। কি করে ভাবলে তোমার

নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই তোমাকে জুহু বীচে পাঠাব আমি? আমার ওপর আর ভরসা নেই তোমার?' কাছে টেনে নিল আরতিকে। 'লক্ষ্মী মেয়ে। অবাধ্য হয়ো না। যা বলি করে যাও, দেখবে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কোন বিপদ ঘেঁষতে পারবে না কাছে।'

চোখ না তুলেই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল আরতি।

ঘড়ি দেখল চিরঞ্জীব। 'চলি। মনিবের সাথে দেখা করতে হবে আবার। চিঠিটা ঠিকমত পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?'

মাথা নিচু করেই উত্তর দিল আরতি, 'হ্যাঁ।'

চিবুক ধরে ওর মুখটা উঁচু করল চিরঞ্জীব, ঝুঁকে এসে চুমু খেলো ঠোঁটে, তারপর সোজা হয়ে বলল, 'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। বেশি সময় নেই, কাপড় পরেই রওনা হয়ে যাও।'

চিরঞ্জীব বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল আরতি। নিজের রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। চোখের কোলে কালি পড়েছে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনায় শেষ হয়ে গেছে সে ভিতর ভিতর। কপালের পাশে একটা আঁকাবাঁকা নীল শিরা দপদপ করছে।

ফাঁদে আটকা পড়া দিশেহারা ইঁদুরের মত লাগছে আরতির। কী করবে সে এখন? চিরঞ্জীবের উপর আর ভরসা করা চলে না—আজ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ওর জন্যে হাড়িকাঠে ঘাড় পাততে পারবে না সে। যে কোন মুহূর্তে চোখ উল্টে নেবে সে এখন। অথচ এরই উপর ভরসা করে বেরিয়েছিল ও বাড়ি ছেড়ে। ডুবে গেছে আরতি, আর বাঁচবার কোন আশাই নেই। অথচ জীবনটা কী হতে পারত ওর!

ভয়ানক গুণ্ডা হিসেবে দুর্নাম কামিয়েছিল চিরঞ্জীব কলকাতায় ওদের আশেপাশের আট-দশটা পাড়া জুড়ে। ওর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল মেয়েগুলো। আরও শোনা যেত আফিম আর কোকেনের গোপন ব্যবসা ছিল ওর। ডাকাতি,রাহাজানির দায়ে সাতবার হাজত বাস করতে হয়েছে ওকে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে পুলিস। কি একটা খুনের দায়েও ঝুলাবার চেষ্টা করেছিল পুলিস ওকে একবার, কিন্তু ফাঁসাতে পারেনি, পিছলে বেরিয়ে গেছে। যমের মত ভয় পেত সবাই ওকে। তারই খপ্পরে পড়ল আরতি।

সেদিন এক বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টি হয়ে কলেজ থেকে ফিরতে সাঁঝ হয়ে গিয়েছিল আরতির, আবছা আঁধার গলিতে ঢুকতেই খপ করে দু'পাশ থেকে দু'হাত চেপে ধরল চিরঞ্জীবের দুই স্যাঙাৎ। একজন চেপে ধরল মুখ। তিন মিনিটের মধ্যে ধরে নিয়ে হাজির করল চিরঞ্জীরের ঘরে। হাতে পায়ে ধরেছিল, অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল, আঁচড়ে, কামড়ে, খামচে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল সেদিন ও চিরঞ্জীবকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়েছিল কুমারীত্ব।

আশ্চর্য মানুষের মন। এরপর আর ধরে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়নি।

নিজেই গেছে আরতি। ক্রমে ক্রমে দেহ-মন, জীবন-যৌবন, সব সঁপে দিয়েছে ওই দুর্ধর্ষ অমানুষটার পায়ে। হয়তো আশা ছিল, ভাল করে নেবে ওকে, শুধরে নেবে। এমনি সময়ে ধরা পড়ল চিরঞ্জীবের তিনজন লোক মাল সমেত। গা ঢাকা দিল চিরঞ্জীব। এদিকে আরতির চাল চলনে ওর মা সন্দেহ করতে শুরু করেছে কিছু একটা হয়েছে মেয়ের, এদিকেও মাল সমেত ধরা পড়ার সম্ভাবনা। কারণ আরতির পেটে তখন আড়াই মাসের বাচ্চা। যখন তখন বমি আসতে চায়।

পালাল ওরা। ঠিক হলো বোম্বে গিয়ে আরতি অভিনয় করবে ছবিতে, চিরঞ্জীব চাকরি জুটিয়ে নেবে একটা–চলে যাবে দু'জনের সংসার। একটা সাইড-রোলে সুযোগও পেয়েছিল আরতি, কিন্তু ছবিতে নামতে দিল না ওকে চিরঞ্জীব–দারুণ এক কাজ নাকি পেয়েছে, আরতিকেও দরকার সেখানে। সেই থেকে শুরু।

প্রথম দিনই কবির চৌধুরীকে অপছন্দ হয়েছিল ওর। কিন্তু কাজটা না নিয়েও উপায় ছিল না। হাতে টাকা পয়সা যা ছিল সব শেষ হয়ে এসেছিল তখন। ধীরে ধীরে কাজের ধরনটা ওর কাছে যত পরিষ্কার হয়ে এল, ততই অপছন্দ বাড়তে লাগল আরতির। কিন্তু নেশায় পেয়ে গেছে চিরঞ্জীবের। আরতি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, এখন যখন টাকার আর কোন অভাব নেই, তবু কেন এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কাজ করেই যেতে হবে ওদের, কেন এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। কেন পালিয়ে গিয়ে একটা শান্তির নীড় বাঁধতে পারবে না ওরা দূরে কোথাও। যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, তখনও কেন একটা অর্থলোলুপ পিশাচের সাথে সম্পর্ক রাখতেই হবে ওদের। বিশেষ করে যখন বোঝা যাচ্ছে এ লোক যে কোন মুহূর্তে পিঠের ওপর ছুরি বসিয়ে দিতে পারে পিছন ফিরলেই। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় আরতির।

আর এক উপসর্গ দেখা দিয়েছে গত দুই মাস ধরে। যমের মত ভয় পায় সে জংগুকে। চিরঞ্জীব জানে না, সেই জংগুরই নজর পড়েছে ওর উপর। এক রাতে বাতি নিভিয়ে চিরঞ্জীবের অপেক্ষায় শুয়ে ছিল সে, হঠাৎ ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল একটা প্রকাণ্ড কালো ছায়া। দুঃস্বপ্নের মত ঘটে গেল সবকিছু। ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই। কাউকে কিছুই বলতে পারেনি আরতি। কিন্তু তারপর থেকে দু'দিন একদিন পর পরই আসছে জংগু ওর ঘরে। গভীর রাতে। এর হাত থেকে নিস্তারের কোন পথ দেখতে পাচ্ছে না সে।। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ঠিক আছে, চিরঞ্জীব না যায় ও একাই যাবে। বাপ-মার মুখে চুনকালি মেখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে বাড়ি থেকে, সেখানে আর ফিরবার উপায় নেই। তবু যেতে হবে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেই পা বাড়াবে সে, চলে যাবে যেদিকে দু'চোখ যায়। এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু টাকা পাবে কোথায় ও? ব্যাংকে আছে, কিন্তু চিরঞ্জীবের সাথে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে রেখেছে সে টাকা, দু'জনের সই ছাড়া তোলা যাবে না।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। আসফ খান। লোকটা বিরাট বড়লোক। এর সাথে কোনরকম চুক্তিতে আসা যায় না?

একটা সিগারেট ধরিয়ে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ চিন্তা করল আরতি। তারপর ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই চমকে উঠে দাঁড়াল। ওয়ারড্রোব থেকে কাপড় বের করে পরে নিল ত্রস্ত হাতে। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার টেনে বের করে আনল ওর পয়েন্ট টু-ফাইভ বেরেটা। ম্যাগাজিন এবং চেম্বার পরীক্ষা করে দেখল, স্লাইড টেনে দেখল ইজেকটার স্প্রিং ঠিক আছে কিনা, তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যাগে পুরল পিস্তলটা। চিঠিটা তুলে নিয়ে গুঁজে দিল ব্যাগের সাইড-পকেটে। দ্রুতপায়ে করিডর ধরে এগোল লিফটের দিকে।

দুই

হতাশ ভঙ্গিতে স্খলিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকল গিলটি মিঞা। ধপাস করে বসে পড়ল ড্রইংরূমের সোফায়।

নিজের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল সালমা। ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে বসল গিলটি মিঞার মুখোমুখি।

'কি খবর, গিলটি মিঞা? কদ্দুর কি হলো?'

গত রাতটা অপেক্ষা করেছে ওরা রানার জন্যে। রানা ফিরে না আসায় আজ সকালে ফোন করেছে ঢাকায় আখতারুজ্জামানকে। তারই নির্দেশে গিলটি মিঞা খবর দিয়েছে গিয়ে থানায়।

'প্রথম তো আমার কতা শুনে সব শালা হেসেই খুন। বেশি চাপাচাপি করায় আমাকেই ধরে পুরে দিতে চায় হাজতে। এমন সোমায় জামান সাহেবের ফোন এসে গেল। পুলিসের এক মস্তবড় সায়েব এসে হাজির। নিগ্রোটার কতা বলতেই চিনতে পারল থানার লোকেরা কার বাড়িটার কতা বলচি। পারে তো মারে আমাকে! বলে, চোদ্রি সায়েবের মতন ভাল নির্ঝঞ্ঝাট লোক নাকি এ তল্লাটে নেই। যাই হোক, আমার সব কতা শুনল বড় সায়েব, কিন্তুক তার কতাবার্তা আমার তেমন পচোন্দ হলো না। বলে, নিগ্রোটার সাতে ব্ল্যাক স্পাইডারের যে কোন সম্পর্ক আছে তার কোন প্রমাণ আচে আমার কাচে? ওই মেয়েটার কতা বললাম। শুনে বলে, নিগ্রোর সাতে তার কি সম্পর্ক? মেয়েটাকে তো আর ও বাড়ির কাচাকাচি দেকা যায়নি। আমি বলি, লেহালুয়া। আসপ খান সায়েব যে ওই বাড়ির ভেতর গিয়ে এঁটকে পড়েচে, তাতে তো আর কোন সন্দো নাই। শুনে বলে, ও বাড়িতে ওরকম বেআইনীভাবে ঢোকার কোন অদিকার নেই আসপ খান সায়েবের। তার ওপর ও বাড়িতেই যে উনি রয়েচেন তার কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। যত্তোসব বাজে! কয়েক ঘণ্টা তক্কাতক্কির পর আবার ঢাকায় টাংকল করল বড় সায়েব। জামান সায়েবের সাতে কি কতা হলো জানি না, আমাকে থানায়—

বসিয়ে রেখে ছয়জন লোক নিয়ে রওনা হলো কাম্বালা হিলের দিকে গজগজ করতে করতে।'

উঠে গিয়ে একগ্লাস পানি খেয়ে এল গিলটি মিঞা।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল সালমা।

'বসে আচিতো আচিই। শেষ পর্যন্ত ফিরল বড় সায়েব। দলবল নিয়ে। বলে সারা বাড়ি নাকি তন্নতন্ন করে খুঁজেচে, কোথাউ বাদ রাকেনি। চৌদ্রি সায়েব নাকি মাহা খাপ্পা হয়ে গেচে আমার নালিশের কতা শুনে। অনেক করে মাপ চেয়ে ন্যাজ গুটিয়ে চলে আসতে হয়েচে পুলিসকে। আমাকে বুদ্দি দিল, যান, আর কোন গোলমাল না পাকিয়ে বাড়ি গিয়ে বসে থাকুন দু'দিন, হয়তো কোন বান্দবীর সাথে মৌজে আছে, আপনি শুদু শুদু ভেবে মরচেন। দুদিনের মদ্যে ফিরে না এলে আবার খবর দেবেন থানায়।'

'নিশ্চয়ই অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওঁকে? আপনার কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল সালমা।

'আমার মনে হয় ওই বাড়িতেই এঁটকে রেকেচে।' জোরের সাথে জবাব দিল গিলটি মিঞা।

'কিন্তু তাহলে পুলিস পেল না কেন খুঁজে? ওরা যখন বাড়িটা সার্চ করেছে...'

'করুক। ওদের দৌড় আমার ভাল করেই জানা আচে। আমার দিঢ় বিশ্বাস ওই বাড়িতেই কোন গোপন কুঠুরিতে রেকেচে ওনাকে।'

গিলটি মিঞার দৃঢ় বিশ্বাসের উপর রীতিমত শ্রদ্ধা আছে সালমার। গত আড়াই বছরের সাহচর্যে পদে পদে টের পেয়েছে সালমা, কি আশ্চর্য ক্ষুরধার একটা মস্তিষ্ক রয়েছে গিলটি মিঞার খুলির ভিতর। লোকটার কথাগুলো হাস্যকর, হাসি মস্করা নিয়ে থাকতে খুবই পছন্দ করে, কিন্তু কাজের সময় এর মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধ তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা, এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা সে দেখেছে সেটা মাঝে মাঝে অলৌকিক মনে হয়েছে সালমার কাছে। কাজেই কোন রকম তর্ক না তুলে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'কি করবেন ভাবছেন?'

'ভাবচি, আমি নিজেই ঢুকব আজ রাতে।'

'বলেন কি!' কপালে উঠল সালমার চোখ। 'একা?'

'আর লোকজন পাব কোতায়?'

'দ্বিতীয় নম্বরটায় ট্রাংকল করব?' জিজ্ঞেস করল সালমা।

'উঁহুঁ। এত সামান্যতেই ওনাদেরকে ডিসটাব করা ঠিক না।'

'কাদেরকে?'

'ওই ওনার আপিসের লোকদেরকে।'

'আপিসের লোক তো আমি আর আপনি—আমরা দু'জন,' সচকিত হয়ে বলল সালমা। 'আরও কোন অফিস আছে নাকি ওঁর?'

'আচে। বড় ডেঞ্জারেস আপিস! ভায়ানোক। আপনি কিছুই জানেন না এ ব্যাপারে?'

'না। উনি বলেননি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি কোনদিন। তবে সন্দেহ হয়েছে, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ওঁর আরও কোন পরিচয় আছে, এবং সেইটাই আসল পরিচয়, গোয়েন্দাগিরিটা নিছক লোক দেখানো ব্যাপার। মনে হচ্ছে আপনি সবই জানেন। একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'উঁহুঁ। আমার কিছু বলা ঠিক হবে না। ওনার ব্যাপার ওনার কাছেই শুনবেন।' চট করে আগের কথায় ফিরে গেল গিলটি মিঞা। 'আমাকে একাই চড়াও হতে হবে চৌদ্রি শালার ওপর।'

'কিন্তু মাসুদ রানা সাহেব এখনও ওই বাড়িতেই আছেন কিনা জানা নেই, এই অবস্থায় কেবল আন্দাজের ওপর নির্ভর করে চড়াও হতে গেলে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে আপনার। ধরা পড়লে আপনাকেও গায়েব করে দেবে বেমালুম। তাতে মাসুদ রানা সাহেবের কোন উপকারই হবে না। আমার মনে হয় ঠিক হচ্ছে না কাজটা।'

'আপনি কি ভাবচেন?' প্রশ্ন করল গিলটি মিঞা।

'ব্ল্যাক স্পাইডার একজন ব্ল্যাকমেলার। আসফ খানের মত একজন ধনী লোককে হাতের মুঠোয় পেয়ে কিছু টাকা বের করে নেয়ার কথা ওর মাথায় আসবে সবচেয়ে আগে। আমার মনে হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যেই টাকা দাবি করে চিঠি পাঠাবে ব্ল্যাক স্পাইডার। ততক্ষণ পর্যন্ত...' কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ থেমে গেল সালমা গিলটি মিঞাকে এক লাফে উঠে দাঁড়াতে দেখে।

দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে গিলটি মিঞা। ঝট করে ফিরল সালমা দরজার দিকে।

চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আরতি লাহিড়ী। হাতে পিস্তল।

একটা আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে সামন্ত। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাংলোটা। অপরাহ্নের রোদটা বেশ কড়া। কিন্তু এখানে এই ছায়ায় বসে ঝিরঝিরে দখিনা হাওয়া খেতে খেতে কোকিলের কুহুতান শুনে চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছিল ওর।

গিলটি মিঞাকে ফিরে আসতে দেখল সে। ঘড়ি দেখল। আর খানিক বাদেই এসে পড়বে আরতি লাহিড়ী। চিরঞ্জীব বলে দিয়েছে: দেখবে আরতির যেন কোন বিপদ না হয়। অলক্ষ্যে থাকবে, কিন্তু যদি দেখো বেকায়দায় পড়েছে আরতি, এগিয়ে যাবে। দরকার মনে করলে পিস্তল ব্যবহার করবে।

বাঘের চেয়েও যদি কাউকে সামন্ত বেশি ভয় পায় তো সে হচ্ছে এই চিরঞ্জীব। পিস্তলটা বের করে পরীক্ষা করল সামন্ত, পকেট থেকে নোংরা একটা রুমাল বের করে যত্নের সাথে মুছল, তারপর ভরে রাখল শোলডার হোল্স্টারে। জামা-কাপড় বা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকে মোটেই খেয়াল নেই সামন্তের, নোংরার হদ্দ বলে গাল খায় সবার কাছে, কিন্তু পিস্তলটার প্রতি তার যত্নের শেষ নেই। এটাকেই সে মানে অন্নদাতা হিসেবে, রুটি-রুজির উপায় হিসেবে। কাজেই ভক্তির সীমা নেই।

দেখতে সে ভয়ানক কুৎসিত, কিন্তু মনটা সরল। সরল মনেই আরতির

বুকে হাত দিয়েছিল সে এই দলে ঢোকার তিন দিনের মধ্যে। সাথে সাথেই গালের উপর চড় পড়ল ঠাস করে। ভাগ্যিস আর বাড়াবাড়ি কিছু করে বসেনি! তখন কি ছাই জানত যে ও হচ্ছে চিরঞ্জীব শর্মার মেয়েমানুষ? নতুন নতুন কার কি পজিশন তাই বুঝে উঠতে পারেনি সে তখন। পরদিনই টের পেল যখন আরতিকে নিয়ে একটা অশোভন রসিকতা করায় ওর চোখের সামনে ইসাকে মারতে মারতে হাগিয়ে ছেড়ে দিল চিরঞ্জীব। তারপর সে কী ভয়! তিন তিনটা মাস ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে সামন্ত, চিরঞ্জীব ডেকে পাঠালেই পিলে চমকে উঠেছে ওর। কপাল ভাল, নালিশ করেনি আরতি। কিন্তু এর জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরে থাকুক, মনে প্রাণে ঘৃণা করেছে সে মেয়েলোকটাকে। ওকে এতখানি মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার কি মানে? নালিশ করে দিলে একদিনের কিল ঘুসিতেই রফা হয়ে যেত, তা না…তিন তিনটা মাস ভুগিয়েছে ওকে। কিন্তু না, আসল কথা এটা নয়; প্রচণ্ড এক জৈবিক আকর্ষণ বোধ করে সামন্ত আরতির প্রতি, কিন্তু জানে ওর কুৎসিত চেহারা আর নোংরা স্বভাব কোনদিনই আরতির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না, কোনদিন যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না সে; তাই তীব্র আকর্ষণ ঘৃণায় রূপ নিয়েছে ক্রমে। আশা ছাড়তে পারছে না বলেই তীব্রতর হচ্ছে ওর ঘৃণা। এক-আধদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে মনে হয় অ্যাসিড ছুঁড়ে আরতির মুখটা পুড়িয়ে দিতে পারলে বোধহয় যন্ত্রণার খানিকটা উপশম হত। কিভাবে ওকে জব্দ করা যায়, যন্ত্রণা দেয়া যায় ভেবে বের করবার চেষ্টা করেছে সে, বহু রাত জেগে শতেক প্ল্যান এঁটেছে, কিন্তু চিরঞ্জীবের ভয়ে কোনটাই কার্যকরী করবার সাহস হয়নি।

কল্পনায় সবেমাত্র আরতির জামা-কাপড় খুলতে শুরু করেছিল সামন্ত, এমনি সময় জলজ্যান্ত মানুষটাকে দেখতে পেল সে চোখের সামনে। চট করে আড়ালে সরে গেল সামন্ত।

ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যাচ্ছে আরতি সাবধানে। তার চেয়েও সাবধানে এগোল সামন্ত ওর পিছু পিছু। ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্ব, আর মেরুদণ্ডের গভীর ভাঁজ দেখে খচ করে কামনার ছুরি বিঁধল সামন্তের বুকে। আহা, বাংলোতে এখন যদি আর কেউ না থাকত, শুধু ও আর আরতি…

বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা একছুটে পেরিয়ে গেল আরতি। দ্রুতপায়ে উঠল চারধাপের সিঁড়ি। ঘরে ঢোকার আগে দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করে নিচ্ছে।

নিঃশব্দ পায়ে কয়েক হাত তফাতে এসে দাঁড়িয়েছে সামন্ত একটা গাছের আড়ালে। পিস্তল হাতে আরতিকে চৌকাঠ ডিঙাতে দেখেই একছুটে খোলা দরজার পাশে দেয়ালে সেঁটে দাঁড়াল সে।

সালমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও।…দু'একদিনের মধ্যেই টাকা দাবি করে চিঠি পাঠাবে ব্ল্যাক স্পাইডার। ততক্ষণ পর্যন্ত…থেমে গেল কণ্ঠস্বরটা।

'খবরদার! এক পা নড়বে না কেউ!' আরতির কণ্ঠ।

মাথা ঝাঁকাল সামন্ত। ধমকের ভঙ্গিটা পছন্দ হয়েছে ওর। বুদ্ধি থাকলে

এই এক ধমকেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দু'জন। বুঝতে পারল, ওর সাহায্যের দরকার পড়বে না, একাই সামলাতে পারবে আরতি।

পিস্তল হাতে ঢাকার সেই মেয়েলোকটাকে দিন-দুপুরে চোখের সামনে দেখে হকচকিয়ে গেল গিলটি মিঞা। বার দুই চোখ পিটপিট করল।

'বসে পড়ুন।' পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করল আরতি।

টুপ করে বসে পড়ল গিলটি মিঞা। এক পা এগিয়ে এল আরতি ঘরের মধ্যে।

'আসফ খান নিরাপদে আছেন। ওঁকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বোম্বে থেকে। কাজেই এখানে খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ হবে না। আসফ খানের লেখা চিঠি নিয়ে এসেছি।' সালমার দিকে চাইল! 'আপনাকে কাল দশটার ফ্লাইটে জেনেভা গিয়ে অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং কর্পোরেশনে এই চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। যদি কোন প্রশ্ন ওঠে, বলতে হবে কাম্বালা হিলে একটা বাড়ি কেনার জন্যে দশ লাখ ডলার ওর দরকার।'

সালমা ও গিলটি মিঞার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে ব্যাগের সাইড পকেট থেকে খামটা বের করে সামনে ছুঁড়ে দিল আরতি। নিচু হয়ে ঝুঁকে তুলে নিল ওটা সালমা কার্পেটের উপর থেকে।

'বুজলাম।' একগাল হাসল গিলটি মিঞা। 'কিন্তু উনি এখেনে নেই, এই মিচে কতাটা বিশ্বাস করলুম না। নিরাপদে আচে, খুব ভাল কতা। ওনার কোন ক্ষতি করলে আপনাদের কাউকে আস্ত রাকবো না, সে কতাও জানিয়ে দিচ্চি।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিস্তল দিয়ে গাল চুলকাল সামন্ত। গিলটি মিঞার মুখে কথাটা শুনে হাসি পেল ওর। চোখের সামনে ভেসে উঠল গিলটি মিঞার চেহারাটা। ওর মুখে একথা মানায় না।

চিঠিটা খুলে পড়ল সালমা। ব্যাংকের প্রতি আদেশ। আশা করেছিল ওর জন্যও কিছু নির্দেশ থাকবে চিঠিতে, কিন্তু হতাশ হলো। একমাত্র ভরসার কথা, হাতের লেখাটা রানারই, তার মানে বেঁচে আছে।

'টাকাটা বোম্বে এসে পৌঁছলে তারপর?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল সালমা।

'তখন আসফ খান একটা চেক লিখে দেবেন। আপনি সে টাকা ভাঙিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিলে ছেড়ে দেয়া হবে আসফ খানকে।'

'ছেড়ে যে দেয়া হবে তার কোন নিশ্চয়তা আছে?' একই কণ্ঠে প্রশ্ন করল সালমা।

'এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন ব্ল্যাক স্পাইডার। আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে, তাই বলছি। কাল সকালেই রওনা হতে হবে আপনাকে জেনেভা।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গিলটি মিঞার দিকে চাইল সালমা। একগাল হাসল গিলটি মিঞা। মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিয়েছে সে, রানা যে আসফ খান নয় সেটা এরা বুঝে উঠতে উঠতে কয়েকদিন পার হয়ে যাবে। এই সময়টা কাজে

লাগাতে হবে। ভাবনাচিন্তা করবার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এখন রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল।

'নিশ্চয়,' বলল গিলটি মিঞা। 'আসপ খান সায়েবের হুকুম মানতে আমরা বাদ্য।'

'এ ব্যাপারে যদি আপনারা পুলিসের সাহায্য নেয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে মারা পড়বেন আসফ খান। কারও সাধ্য নেই যে ওকে খুঁজে বের করে। কোনরকম চালাকি খাটাতে গেলে জীবনে আর দেখা পাবেন না ওর।'

ভেরি গুড—ভাবল সামন্ত। গুণ আছে ছুঁড়িটার। ওর জন্যে আর ভাবনা নেই। কাজেই এখন বেরিয়ে আসার আগেই সরে পড়া দরকার। নিঃশব্দ পায়ে সরে যাচ্ছিল সামন্ত, এমন সময় আরতির কথা কানে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এই কথাই বলতে বলা হয়েছে আমাকে আপনাদের,' সরাসরি সালমার চোখে চোখ রাখল আরতি। 'কিন্তু এটা সর্বৈব মিথ্যা। আসফ খানকে কোনদিনই ছেড়ে দেয়া হবে না। পুরো তেরো কোটি টাকা আদায় করে নিয়ে ওকে মেরে ফেলা হবে।'

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল গিলটি মিঞা, ওর কাঁধে একটা হাত রাখল সালমা। বলল, 'একথার মানে? একথা আমাদের জানাচ্ছেন কেন?'

'সহজ মানে। আমি এই দল ছেড়ে পালাতে চাই। টাকা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাই আমি আপনাদের সাথে। আমি জানি কোথায় আছেন উনি। আমি ওকে বের করে আনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। ব্ল্যাক স্পাইডারের যা দাবি তার চার ভাগের এক ভাগ নেব আমি—আড়াই লক্ষ ডলার। ওদের কথামত কাজ করলে টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবেন, কিন্তু আসফ খানকে ফিরে পাবেন না। আর আমার সাথে চুক্তিতে এলে আমি বের করে এনে দেব আসফ খানকে। কোনটা করবেন?'

'আপনার কথায় বিশ্বাস কি?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল সালমা।

'বিশ্বাস করার দরকারই বা কি?' পাল্টা প্রশ্ন করল আরতি অসহিষ্ণু কণ্ঠে। 'আসফ খান মুক্ত না হলে আমি টাকা পাচ্ছি না, চাইছিও না। আপনাদের বিশ্বাস করতে পারি কিনা আমি সেটাই হলো প্রশ্ন। টাকাটা বোম্বে পৌঁছতে কতদিন লাগবে?'

'পাঁচ-ছ'দিনের বেশি না,' বলল সালমা।

'যদি ওঁকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করে দিই, টাকাটা পাচ্ছি আমি?' বলল আরতি। 'পাকা কথা চাই আমার।'

'আসফ খান যদি নিরাপদে মুক্ত হন, তাহলে সাধ্য মত বোঝাবার চেষ্টা করব আমি যেন আপনাকে টাকা দেয়া হয়, এইটুকু কথা দিতে পারি,' চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বলল সালমা। 'এর বেশি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। টাকাটা আমার নয় যে আমি কথা দিয়ে দেব।'

'আমি কতটা বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি, ধরা পড়লে আমার কি অবস্থা হবে জানেন না আপনারা,' চোখ পাকিয়ে বলল আরতি। 'একজন মাতাল ডাক্তার

আছে ওদের ওখানে। ব্রেন স্পেশালিস্ট। মানুষের ব্রেন কাটা ছেঁড়া করে একটার পর একটা উদ্ভট গবেষণা করছে লোকটা। আমার বিশ্বাসঘাতকতা টের পেলে ওর হাতে তুলে দেয়া হবে আমাকে। আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে এর ওপর। কাজেই আলগা কথায় চলবে না। পাকা কথা দিতে হবে। কথা না পেলে আমি কোন সাহায্যই করব না আপনাদের।'

তিন সেকেন্ড ইতস্তত করল সালমা, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি। টাকা আপনি পাবেন।'

'পুলিসকে জানাবেন না আপনারা?'

'না।'

কথাটা শোনামাত্র পিস্তলটা ব্যাগে পুরল আরতি লাহিড়ী। এক সাথে উঠে দাঁড়াল সালমা ও গিলটি মিঞা। গিলটি মিঞা জিজ্ঞেস করল, 'ওই বাড়িতেই কোতাউ লুকোন আচে, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওই বাড়ির তিরিশ ফুট নিচে বারোটা ঘর আছে, বন্দী-গুহা আছে। ওঁকে কোথায় রাখা হয়েছে জানি আমি। কিন্তু সেখান থেকে বের করে আনা খুবই কঠিন এবং বিপজ্জনক।'

'কি রকম বিপজ্জনক?' প্রশ্ন করল গিলটি মিঞা।

'একটা বোতামে টিপ দিলেই যে কোন প্যাসেজ বা ঘরে জল ভরে যাবে কানায় কানায়,' বলল আরতি। 'অ্যালার্মের ব্যবস্থা আছে সবখানে। প্রত্যেকটা করিডরের দু'মাথায় দুটো করে স্টীলের দরজা, খোলা বা বন্ধ হয় ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে। তাছাড়া বাইরে পাহারা দিচ্ছে কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড আর চারটে ভয়ঙ্কর কুকুর।'

'তাহলে ওনাকে বের করে আনা যাবে কি করে?' জানতে চাইল গিলটি মিঞা।

'সেটাই ভেবে চিন্তে বের করতে হবে আমাদের,' বলল আরতি। 'টাকাটার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, এবার আমি বাড়িটার একটা নকশা তৈরি করে দেব আপনাদের। হাতে তিনদিন সময় আছে। অ্যালার্মগুলো কোথায় কোথায় আছে, গার্ডরা ঠিক কোন জায়গায় প্যাট্রোল দেয়—প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি ব্যাপার জানাব আপনাকে, কিন্তু একটু সময় লাগবে। আগামী বিষ্যুৎবার সন্ধের পর একটা ডেফিনিট প্ল্যান তৈরি করে নিয়ে আসব আমি।'

আর দাঁড়ানো উচিত বলে মনে হলো না সামন্তের। সব শুনে ছোট ছোট চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড় হয়েছে ওর। এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে আরতি। ওর চোখে পড়াটা ঠিক হবে না। নিঃশব্দ দ্রুতপায়ে বারান্দা থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল সে ঝোপের আড়ালে।

তিন

অভ্যাসবশে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়েও খালি হয়ে আসা প্যাকেটের দিকে

লক্ষ যেতেই ইচ্ছেটা দমন করল রানা। মাত্র পাঁচটা আছে আর। নেশাটা আর একটু চড়ুক তখন দেখা যাবে।

এবড়োখেবড়ো মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। স্টীলের ব্যান্ডটা পরানো আছে পায়ে। ঘড়িতে বাজছে চারটা। চার ঘণ্টা আগে ওকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে গেছে চিরঞ্জীব, তারপর থেকে আর কারও দেখা নেই। একা একা শুয়ে শুয়ে আবোল তাবোল ভারছে রানা।

ছোকরাটা অবাক হয়ে গেছে রানাকে লক্ষ্মী ছেলের মত চিঠিটা লিখে দিতে দেখে। কিন্তু রানা ভেবে দেখেছে অন্তত দুটো দিন সময় দরকার ওর। আসফ খানের যদি বিদেশী ব্যাংকে তেরো কোটি টাকা থাকেও, রানার চিঠির কানাকড়ি মূল্যও দেবে না সে ব্যাংক। কিন্তু রানা যে আসল আসফ খান নয় সেটা বের করতে সময় লাগবে কবির চৌধুরীর। এই ক'দিন বসে থাকবে না গিলটি মিঞা। পুলিস বাড়ি সার্চ করে ওকে খুঁজে না পেতে পারে, কিন্তু গিলটি মিঞার চোখে ধুলো দেয়া সহজ নয়। চিঠিটা হাতে পেলেই বুঝতে পারবে ওরা বেঁচে আছে রানা। পূর্ণোদ্যমে এবার লাগবে ওরা।

দু'দিক থেকে চেষ্টা চললে অসুবিধেয় পড়বে কবির চৌধুরী। ওরা বাইরে থেকে চেষ্টা করবে ভেতরে ঢোকার, রানা ভেতর থেকে চেষ্টা করবে বাইরে বেরোবার। কেবল ওদের উপর নির্ভর করলে চলবে না, নিজেকে নিজেরই মুক্ত করতে হবে ওর। দুপুরে খাবার সময় একটা মাছের কাঁটা সরিয়ে রেখেছিল, কিন্তু কাজ হলো না ওটা দিয়ে, খানিক খোঁচাখুঁচি করতেই মট করে ভেঙে রয়ে গেল অর্ধেকটা তালার মধ্যে। অন্য কোন বুদ্ধি বের করতে হবে।

কিভাবে পায়ের বাঁধনটা খোলা যায় ভাবছিল রানা, এমন সময় দেখতে পেল একটা আলো এগিয়ে আসছে ওর দিকে। টর্চের আলো। কাছাকাছি এসে নিভে গেল আলোটা, পরমুহূর্তে ওভারহেড ল্যাম্পের কর্কশ আলোর নিচে এসে দাঁড়াল আরতি।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা। অবাক হয়ে দেখল আরতির ভীত-সন্ত্রস্ত রক্তশূন্য মুখ।

রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল আরতি। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'আপনার সেক্রেটারির সাথে কথা হয়েছে আমার। তাকে বলেছি আপনাকে এখান থেকে বের করবার সব ব্যবস্থা করব আমি। তার বদলে আড়াই লক্ষ ডলার দিতে হবে আমাকে। আপনার সেক্রেটারি কথা দিয়েছে, কিন্তু টাকাটা দিচ্ছেন আপনি, কাজেই আপনাকেও কথা দিতে হবে।'

মেয়েটার দিকে এক নজর চেয়েই বুঝতে পারল রানা মিথ্যে কথা বলছে না ও। অত্যন্ত সিরিয়াস ওর চোখমুখ।

'অনেক টাকা!' বলল রানা। 'হঠাৎ খোলস বদলানোর ইচ্ছে হলো কেন?'

'যথেষ্ট হয়েছে। এবার সময় থাকতে পালাতে চাই আমি। টাকা ছাড়া পালিয়ে বাঁচতে পারব না।' এদিক ওদিক চাইল আরতি। 'আপনাকে ছাড়বে

না ওরা কিছুতেই (ক্রমে ক্রমে সব টাকা বের করে নিয়ে খুন করবে। আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমি, যদি আপনি কথা দেন এখান থেকে বেরিয়ে আড়াই লক্ষ ডলার দেবেন আমাকে।'

'স্বচ্ছন্দে দেব,' বলল রানা। 'ছাড়া না পেলে তো আর দিতে হচ্ছে না, কাজেই কথা দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। যান, পাবেন আপনি আড়াই লাখ ডলার।'

'ঠিক তো? প্রমিজ?'

'হ্যাঁ, প্রমিজ। এখন শোনা যাক কিভাবে বের করবেন আমাকে এখান থেকে?'

'ভেবে-চিন্তা প্ল্যান তৈরি করতে হবে,' বলল আরতি। 'দরজাগুলো ইলেকট্রিক্যালি কন্ট্রোল্‌ড্‌। ইচ্ছে করলেই যে কোন ঘর বা প্যাসেজ ভরে ফেলা যায় জল দিয়ে। প্রকাণ্ড দীঘিটা নিশ্চয়ই দেখেছেন—ওটার জল। আন্ডারগ্রাউন্ডে একটা কন্ট্রোল রুম আছে, কিন্তু দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকে সেখানে। সেই লোকটাকে কাবু করতে না পারলে বেরোতে পারবেন না এখান থেকে। রাতে বেরোনোই সবচেয়ে সুবিধে, জংগু ছাড়া আর কেউ জেগে থাকে না। রাতে জংগুর ডিউটি পড়ে কন্ট্রোল রুমে।'

'ওরে সর্বনাশ! ওই দৈত্যটাকে কাবু করতে হবে আমার?'

মাথা ঝাঁকাল আরতি।

'একটা পিস্তল বা রিভলভার জোগাড় করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চেষ্টা করে দেখব। মনে হয় পারব।'

'ভাল করে চেষ্টা করুন,' বলল রানা। 'পিস্তল ছাড়া ওকে কাবু করা অসম্ভব। এটার কি ব্যবস্থা করা যায়?' পায়ের ব্যান্ডটার দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

'একটা হ্যাক-স কিংবা রেত জোগাড় করে দিতে পারি।'

'তারচেয়ে একখানা চুলের কাঁটা দিতে পারেন কিনা দেখুন। আছে?'

আরতির ডান হাত উঠে গেল খোঁপায়। একটা কাঁটা খসিয়ে দিল রানার হাতে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'আবার আসব আমি। পিস্তল জোগাড় করবার চেষ্টা করব, কিন্তু সহজ হবে না সেটা। তেমন দেখলে আমারটাই দেব আপনাকে।' নিবিড় দুই চোখ রাখল আরতি রানার চোখে। 'আপনাকে বিশ্বাস করে ঠকব না তো, মিস্টার আসফ খান? এজন্যে আমি কত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি জানেন না আপনি। টাকাটা পাব তো ঠিক?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আমি যদি মুক্ত হতে পারি তাহলে টাকা আপনি পাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি যা করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে আপনার আরও ভেবে দেখা উচিত। টাকা পেলেও খুব একটা উপকার হবে না আপনার। ব্ল্যাক স্পাইডারের হাত থেকে রেহাই যদি পানও, পুলিস খুঁজছে আপনাকে, ধরা আপনাকে পড়তেই হবে। সে ব্যাপারে

কিছুই করতে পারব না আমি।'

'পুলিসের ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই আমার।'

'কন্ট্রোল রুমটা কোন্ দিকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডক্টর যোশীর অপারেশন থিয়েটারের ঠিক উল্টোদিকে! ওটা হচ্ছে...'

'চিনতে পেরেছি,' বলল রানা। 'আপনি একটা পিস্তল জোগাড় করার চেষ্টা করুন। পিস্তল ছাড়া জংগুকে কাবু করা যাবে না।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

দ্রুতপায়ে চলে গেল আরতি। ওর গমন পথের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। নিজের অজান্তেই একটা সিগারেট বের করে ধরাল। নতুন প্রেক্ষিতে পরবর্তী কর্তব্যগুলো গুছিয়ে ফেলল সে মনে মনে। তারপর লাগল তালাটার পিছনে। আধঘণ্টা চেষ্টার পর খুলে গেল তালা। ঝন্ করে শিকল সহ ইস্পাতের ব্যান্ডটা পড়ল মাটিতে। টিপ-তালা। খুলতে কষ্ট, কিন্তু লাগাবার সময় কব্জির কাছে বেড় দিয়ে ছোট্ট একটা টিপ দিলেই লেগে যায় কুট করে। নিজের সাফল্যে খুশি হয়ে খানিক পায়চারি করার উদ্দেশে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় আবার আলো দেখতে পেয়ে চট করে পরে নিল ব্রেসলেটটা। হেয়ারপিনটা গুঁজে দিল চাঁদির কাছে চুলের মধ্যে।

টলতে টলতে এসে দাঁড়াল ডক্টর জগজীবন যোশী। ভেজা ভেজা চোখ দুটো মনে হলো জ্বলছে। কপালে স্বেদ বিন্দু। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। কাঁপছে হাতটা।

'কি খবর?' ভুরু নাচাল রানা। 'কি চাই এখানে?'

'একটু রক্ত,' জড়ানো গলায় বলল যোশী। 'আর পালস্ রেটটা।'

'রক্ত? পালস রেট?' অবাক হয়ে গেল রানা। 'কি বলছেন আপনি?'

'মিস্টার আসফ খান! একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেন্টের জন্যে আপনাকে আমার চেম্বারে পাঠানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য এখনও স্থির নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু সময় বাঁচাবার জন্যে কয়েকটা প্রাথমিক টেস্ট আমি আগেই সেরে রাখতে চাই। আপাতত আপনার ব্লাড স্পেসিমেন আর পালস রেটটা পেলেই চলবে, সন্ধের পর যদি দয়া করে আমার চেম্বারে একবার আসেন তাহলে আপনার ইউরিন স্পেসিমেন আর প্রেশারটা নিয়ে নেব। সেইসাথে চোখটাও একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।' হিক্কা তুলল ডাক্তার।

'আমাকে আপনার হাতে তুলে দেয়া যখন হবেই, তখন আগে থেকে টেস্টগুলো সেরে তৈরি হয়ে নিতে চাইছেন, তাই না?' অমায়িক কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ।' অকপটে স্বীকার করল মাতাল ডাক্তার। 'তাহলে কাজ অনেকটা এগিয়ে থাকে।'

পকেট থেকে একটা নিড্ল্ আর চৌকোণ দুটো কাঁচের টুকরো বের করল যোশী। এগিয়ে এল এক পা।

'বেঘোরে মারা পড়বার ইচ্ছে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা নরম গলায়। 'আমার পা দুটো বাঁধা, কিন্তু হাত দুটো মুক্ত। আর এক পা এগোলে গলা

টিপে দম বের করে দেব তোমার, বাঁদরের বাচ্চা!'

নিমেষে মুখটা কঠোর হয়ে গেল ডাক্তারের, চট করে পিছিয়ে গেল এক পা। কিন্তু হাল ছাড়ল না।

'দেখুন, শুধু শুধু আমার কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনার কি লাভ? দারুণ গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেন্ট এটা। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করা উচিত আপনার, মিস্টার আসফ খান, যে আপনিই প্রথম সুযোগ লাভ...হিক্! আপনি সহযোগিতা না করলে অবশ্য আমার অপেক্ষা করতে হবে। যত দিন না...'

'বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে তোমার, ডক্টর হনুমান। হয়তো সারাজীবন। কবির চৌধুরীর দাবি পূরণ করছি আমি।'

'উঁহুঁ! অসম্ভব!' চোখ পাকাল যোশী। 'আমি ডক্টর কবির চৌধুরীকে বলেছি, তুমি টাকা দেয়ার ছুতো করে খানিকটা সময় নেয়ার চেষ্টা করছ আসলে। তোমার টাইপটা ভাল করেই চিনি আমি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমাকে দিয়ে কোন কাজ করানো প্রায় অসম্ভব।'

'যদি তাই বলে থাকো, তাহলে আবার যাও, গিয়ে বলো, আমার চরিত্র বিশ্লেষণে ভুল হয়েছিল তোমার।' মৃদু হেসে বলল রানা, 'তোমার এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ হওয়ার উৎসাহ আমি বোধ করছি না মোটেই। দুঃখিত।'

'আমার গবেষণার কথা বলেছেন উনি তাহলে তোমাকে!' অপমান ভুলে খুশি হয়ে উঠল ডক্টর যোশী। 'এই গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছ তুমি? এর ফলে যে কি বিরাট...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই শুনেছি আমি!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রানা। 'মাতাল অবস্থায় অপারেশন করার ফলে মানুষের কি অবস্থা হয়, তাও শুনেছি। এখন দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।'

ধুম করে মাটিতে পা ঠুকল যোশী রাগের মাথায়। ফলে টলে পড়ে যাচ্ছিল, দেয়াল ধরে সামলে নিল।

'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অপারেটিং টেবিলের ওপর পাব আমি তোমাকে, আসফ খান!' বলল যোশী। 'খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না আমার!'

টলতে টলতে চলে গেল জগজীবন যোশী এলোপাতাড়ি পা ফেলে।

এই মাতাল উন্মাদের কাঁপা হাতের অপারেশনের কথা ভেবে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা একবার। খেয়াল করল, জিভটা শুকিয়ে এসেছে ওর।

আমগাছটার ছায়ায় বসে উসখুস করছে সামন্ত। আর ঘামছে দরদর।

আমগাছের নিবিড় ছায়া, মৃদুমন্দ সমীরণ, কোয়েল-পাপিয়ার কুহুতান কোন কিছুই ঠাণ্ডা করতে পারছে না ওর মনের উত্তেজনা। টগবগ করে ফুটছে সে ভিতর ভিতর। সেই সাথে ভয়ও পেয়েছে সে। পরিষ্কার চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সামন্ত, এক্ষুণি একটা কিছু করা দরকার কিনা।

মানে আরতির বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে। ওর নিজের নিরাপত্তাও জড়িত এর সাথে। আরতিকে প্ল্যান মাফিক কাজ করতে দিলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে যাবে। পুলিসের হাত থেকে কবির চৌধুরী যদি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়ও, সব জানা সত্ত্বেও কাউকে কিছু না জানালে কবির চৌধুরীর হাত থেকে ওর নিজের আত্মরক্ষা করবার উপায় নেই। খুন করবে ওকে কবির চৌধুরী।

কিন্তু ও যে সবকিছু জানে তার কি কোন প্রমাণ আছে? নেই। এই ব্যাপারটা থেকে ও নিজে কি কিছু সুবিধা আদায় করতে পারবে? নাহ্, তাড়াহুড়ো না করে ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

আরতির কথাগুলো শোনার পর বাংলো থেকে বেরিয়েই একছুটে চিরঞ্জীবের কাছে গিয়ে সবকিছু রিপোর্ট করবার অদম্য ইচ্ছে হয়েছিল ওর। কিন্তু ওর উপর আদেশ আছে মহাবীর বা লোচন এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত নজর রাখতে হবে ওকে এই বাংলোর উপর। আদেশ অমান্য করলে খেপে যেতে পারে চিরঞ্জীব। কাজেই মনের উত্তেজনা মনে চেপে রেখে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়েছে ওর কাছে।

বেরিয়ে গেল আরতি ত্রস্ত পায়ে। একই সাথে ঘৃণা ও দৈহিক আকর্ষণ বোধ করল সামন্ত ওর প্রতি। মনে মনে হাসল সে। আরতি মনে করেছে কাকপক্ষীও টের পায়নি ওর মতলব। টেরটি পাবে বাছাধন। হঠাৎ ওর মনে হলো, এতদিনে আরতির একটা দুর্বলতা জেনে ফেলেছে সে। এর সুযোগ নিতে পারে ও এখন ইচ্ছে করলেই। এবার আর ঠাস করে গালে চড় লাগাতে হচ্ছে না শালীকে। যে কোন প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে ও এখন এক কথায়। কিন্তু না, ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে, একসাথে সব কিছু ভাবতে গেলে গোলমাল করে ফেলবে সে কোথাও। হঠাৎ করে যে জ্ঞান লাভ করে ফেলেছে সে, আরতির কল্যাণে হঠাৎ সে-যে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছে, সেটাকে ভাল করে ভেবে চিন্তে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার না করলে লাভ তো দূরের কথা, মস্ত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ওর।

প্রথমে ধরা যাক, চিরঞ্জীবের কাছে রিপোর্ট করলে কি লাভ বা ক্ষতি। আরতি হচ্ছে চিরঞ্জীবের মেয়েমানুষ, ওর কাছে এসব কথা বলতে গেলে কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। ও কি ব্যাপারটা চেপে রাখার হুকুম দিয়ে গোপনে আরতিকে ডেকে খানিকটা ধমকধামক দিয়েই দায় সারতে চাইবে, না তুমুল একটা হৈ চৈ বাধিয়ে তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটাবে, নাকি খাড়া অবিশ্বাস করবে সামন্তের সব কথা? যদি ও হঠাৎ খেপে গিয়ে ওকেই মারধর শুরু করে দেয়? এই সেদিন তেওয়ারির সামনের তিনটে দাঁত খসিয়ে দিয়েছে চিরঞ্জীব। নাহ্। একটা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বোকামি করবে না চিরঞ্জীব—নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল সামন্ত। যতই পেয়ারের মেয়েমানুষ হোক, সবাইকে চিট করে আড়াই লাখ ডলার নিয়ে গুটগুট করে হেঁটে বেরিয়ে যাবে আরতি এবং তারপরেই আসবে পুলিসের আক্রমণ, এটা কিছুতেই হজম করবে না চিরঞ্জীব। হাজার হোক লোকটা বাঘের বাচ্চা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কথাটা খুব সাবধানে ভাঙতে হবে। পিস্তলটা সাথে রাখা উচিত।

বলা যায় না আত্মরক্ষার জন্যে দরকার হতে পারে।

সে হবেখন–ভাবল সামন্ত। প্রয়োজন হলে পিস্তল বের করবে সে। প্রয়োজন হলে সোজা রিপোর্ট করবে মনিবের কাছে। এত বড় একটা খবর যখন রয়েছে হাতের মুঠোয়, কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই ওর। নিজেকে মহাশক্তিমান মনে করে মিনিট দুয়েক লেগে গেল ওর সামলে উঠতে।

কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ওর নিজের লাভ কি হচ্ছে এ থেকে? এসব নালিশ-ফালিশের মধ্যে না গিয়ে আরতির টাকায় ভাগ বসালে কেমন হয়? টাকা না পাওয়া পর্যন্ত ছায়ার মত আরতির পিছু লেগে থাকতে পারে সে। যেই পেয়ে যাবে টাকা, অমনি একগাল মিষ্টি হেসে অর্ধেকটা চেয়ে বসবে। সোয়া লাখ ডলার। বাকি জীবনটা পায়ের উপর পা তুলে কেটে যাবে ওর। কথাটা মাথায় আসতেই লোভে, উত্তেজনায় প্রায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সামন্ত, কিন্তু পরমুহূর্তে চুপসে গেল এর খারাপ দিকগুলো মাথায় আসতেই। ধরা আরতিকে পড়তেই হবে। সর্বশক্তি নিয়োগ করবে কবির চৌধুরী। পৃথিবীর কোথাও গিয়ে নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। এই দলের সাথে গত দেড়টি বছর কাজ করবার পর এটুকু সে হলফ করে বলতে পারে। প্রাণ নিয়ে এ দল ছেড়ে পালাতে পারেনি আজ পর্যন্ত কেউ। আরতিও পারবে না। সে-ও না। কাজেই ওর কাছ থেকে টাকার ভাগ নেয়া আর জেনেশুনে বিষ পান করা একই কথা।

নাকি সোজা বড় সাহেবের সাথে গিয়ে দেখা করবে? মুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিল সামন্ত। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে জিভ কেটে নেবে চিরঞ্জীব। তারচেয়ে ওকেই সব খুলে বলে অনুরোধ করবে যেন বড় সাহেবকে বলে এক আধটা বোনাসের ব্যবস্থা করে দেয়। এর বেশি কিছু আশা করতে যাওয়া ওর জন্যে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে না যাওয়াই ভাল।

আরতির পরিণতির কথা ভেবে কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল সামন্তের। চিরতরে হারাতে হবে ওকে। ডক্টর যোশীর হাতে যে ওকে তুলে দেয়া হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মানেই মৃত্যু। যদি হালকা কোন শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা করা যেত মেয়েলোকটাকে, তাহলে খুশিই হত সামন্ত, কিন্তু ওর ভয়ঙ্কর পরিণতির চিন্তায় আশ্চর্য এক অস্বস্তিতে ভুগছে সে। অবশ্য করবার ওর কিছুই নেই, নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছে আরতি। ও তো কোন ছার, চিরঞ্জীবেরও সাধ্য নেই যে ওকে আর রক্ষা করে।

মাথা ঝাড়া দিল সামন্ত। এ নিয়ে মিছে ভাবনা করে লাভ নেই। তবু কিছুতেই দূর করতে পারল না সে আরতির চিন্তা। কল্পনায় একবার সাবধান করে দিল সে আরতিকে, আরতি আজ রাত্রিটা ওর ঘরে কাটাতে রাজি হয়ে গেল, পরদিন সকালে উঠে হাওয়া হয়ে গেল আরতি, আর সমস্ত দোষ এসে পড়ল ওর ঘাড়ে, ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে জংগু ওকে ডক্টর যোশীর অপারেশন থিয়েটারে। ওরেব্বাপ! শিউরে উঠে বাস্তবে ফিরে এল সামন্ত।

*

আরতির বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারটা নিয়ে সামন্ত যখন হিমশিম খাচ্ছে, ঠিক তখন কবির চৌধুরীর ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট দিচ্ছে চিরঞ্জীব শর্মা।

ডেস্কের ওপাশে গদি আঁটা চেয়ারটায় বসে রয়েছে কবির চৌধুরী স্থির হয়ে। ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে মোটা চুরুট, বাম হাতের তর্জনীর মাথাটা মোলায়েম ভাবে বুলাচ্ছে সে ডেস্কের সাথে ফিট করা একটা সাদা বোতামের উপর। বোতামটায় মৃদু একটা চাপ দিলেই ডেস্কের মধ্যে লুকানো একটা টুয়েলভ বোর বন্দুকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে গুলি। গোপন বন্দুকের মুখটা সোজা চেয়ে রয়েছে চিরঞ্জীবের বুকের দিকে। ও জানে না, রোজই তাই থাকে।

'চিঠিটা পৌঁছে দেয়া হয়েছে,' বলল চিরঞ্জীব। 'কোন গোলমাল হয়নি। আসফ খানের সেক্রেটারি রওনা হচ্ছে কাল সকালের ফ্লাইটে। ওর ধারণা, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে টাকাটা।'

আনমনে আঙুল বুলাচ্ছে কবির চৌধুরী বোতামটার উপর।

'তোমার ধারণা ওরা সহযোগিতা করবে?'

'হ্যাঁ। এছাড়া আর কোন পথ ওদের আছে বলে মনে হয় না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী।

'আরতি নিয়ে গিয়েছিল চিঠিটা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ও কি একা গিয়েছিল!'

'ওর ধারণা ও একা গিয়েছিল,' বলল চিরঞ্জীব। 'কিন্তু গোলমাল হতে পারে আশঙ্কা করে কাছাকাছিই লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম সামন্তকে।'

'ভালই করেছিলে। ওদের দু'জনকে ঠিকমত বোঝানো গেছে যে পুলিসের কাছে গেলে অমঙ্গল হবে আসফ খানের?'

'যেমন যেমন শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল, তোতাপাখির মত আউড়ে দিয়ে এসেছে আরতি। একেবারে মুখস্থ।'

'ভেরি গুড,' বলল কবির চৌধুরী। চুরুটের ছাই পরীক্ষা করল কয়েক সেকেন্ড। 'সামন্ত কোথায়?'

'ওখানেই। মহাবীর বা লোচন না পৌঁছানো পর্যন্ত ওখানেই থাকতে বলেছি ওকে।'

নাক চুলকাল কবির চৌধুরী, তারপর সরাসরি চাইল চিরঞ্জীবের মুখের দিকে।

'অর্থাৎ কেবল আরতির রিপোর্টই পেয়েছ তুমি, সামন্তের কনফার্মেশন পাওনি এখনও।'

কথাটা শুনেই আড়ষ্ট হয়ে গেল চিরঞ্জীবের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা।

'কনফার্মেশন? ঠিক বুঝলাম না আপনার কথাটা। সামন্তের সাথে আমার কোন কথা হয়নি ঠিকই, কিন্তু নতুন কি বলবে সে? আপনি কি বলতে চাইছেন আরতিকে আর বিশ্বাস করা যায় না?'

'ঠিক তা নয়,' চোখ না সরিয়েই বলল কবির চৌধুরী। 'তবে যে কোন রিপোর্টকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করবার আগে সুযোগ থাকলে আরেকজনের সমর্থন নেয়া সব সময়ই উচিত। এমন হতে পারে, হয়তো শেষমুহূর্তে নার্ভাস হয়ে পড়েছিল আরতি, হয়তো যায়ইনি বাংলোতে। আমার যতদূর বিশ্বাস ও গিয়েছিল, কিন্তু ঠিক কি কথাবার্তা হয়েছিল সে সম্পর্কে যদি সামন্তের কনফার্মেশন পাওয়া যায় তাহলে সবদিক থেকেই ব্যাপারটা আরও অনেক সন্তোষজনক হয়, কারও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।'

'সামন্ত বাইরে থেকে নজর রেখেছিল বাড়িটার ওপর,' চিরঞ্জীব বলল। 'কথাবার্তা কি হয়েছিল সেটা ওর শোনার কথা নয়।'

টেলিফোন রিসিভার কানে তুলে নিল কবীর চৌধুরী।

'জংগু? লোচনকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও জুহু বীচের বাংলোয়। সামন্তকে গিয়ে যেন বলে আমি দেখা করতে বলেছি। এখানে পৌঁছেই যেন সোজা আমার কাছে এসে রিপোর্ট করে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে চিরঞ্জীবের দিকে ফিরল কবির চৌধুরী। 'অনুমানের ওপর বিশ্বাস নেই, চিরঞ্জীব। এতে মারাত্মক ভ্রম হয়। আমি সামন্তের সাথে কথা বলব।'

ভয়ানক চটে গেল চিরঞ্জীব, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা নির্বিকার রেখে বলল, 'যা ভাল বোঝেন!'

'হ্যাঁ। ঘাবড়ে গিয়ে একটা কিছু করে বসা আরতির পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি শিওর হতে চাই এই কাজটা ও কতখানি সুষ্ঠুভাবে করেছে। ওকে বিশেষ জরুরী একটা কাজে পাঠাবার ইচ্ছে আছে আমার। বেশ মোটা অঙ্কের টাকা জমে গেছে ঢাকায়। আরতিকে পাঠিয়ে টাকাটা আনিয়ে নিতে চাই।' আবার চুরুটের ছাই পরীক্ষায় মন দিল কবির চৌধুরী। 'তোমার কি মনে হয় ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়? ক্যাশ টাকা, অঙ্কটাও বিরাট। আমি চাই না টাকাগুলো নিয়ে কেউ কেটে পড়ুক।'

'কেটে ও পড়বে না।' গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল চিরঞ্জীব। 'ওকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু ওকে এখন ঢাকায় পাঠানো উচিত বলে মনে করি না আমি। ঢাকার পুলিসের কাছে ওর চেহারার বর্ণনা আছে, ওকে এখনও খুঁজছে ওরা। এই অবস্থায় আবার ওকে ঢাকায় পাঠানো ঠিক হবে না।'

'ওহ্-হো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। যাই হোক, কাউকে পাঠানো দরকার টাকাটা আনতে। সামন্তকে পাঠালে কেমন হয়?'

মাথা নাড়ল চিরঞ্জীব।

'ছোটখাট কাজে ঠিকই আছে, কিন্তু এত টাকার ব্যাপারে ওর ওপর ভরসা করা যায় না।'

চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী।

'তাহলে মোস্তাককেই বলতে হবে ওর কোন বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে।'

চিরঞ্জীব মনে মনে ভাবল, তার মানে বোঝাতে চাইছে আমি ঠিক মত

কাজ চালাতে পারছি না, বিশ্বাসযোগ্য লোক আমার হাতে নেই। আমার অদক্ষতায় অসুবিধে হচ্ছে কাজের, সেজন্য মোস্তাকের সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছে। লোচনের নাম উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল চিরঞ্জীব এমনি সময় আবার কথা বলে উঠল কবির চৌধুরী।

'কিন্তু আরতির জন্য কিছু কাজ বের করা দরকার। শুধু শুধু বসিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। ওর উপযুক্ত কাজ এখানে নেই।' এতক্ষণে চুরুটের ছাইয়ের উপর থেকে চিরঞ্জীবের চোখের উপর এসে স্থির হলো কবির চৌধুরীর দৃষ্টি। 'সাউথ আমেরিকার পেরুতে একটা অপারেশন সেন্টার খুলব ভাবছি। তোমার কি মনে হয়, রাজি হবে ও যেতে?'

আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেত চিরঞ্জীব। রক্তশূন্য মুখটা আড়াল করল সে পিঠ চুলকাবার ছলে। ব্যাপার কি! পেরুর নামটা হঠাৎ মাথায় এল কবির চৌধুরীর, নাকি কোনভাবে শুনে ফেলেছে ওদের কথাবার্তা!

'পেরু? ঠিক বলতে পারছি না। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।'

হাসি ফুটে উঠল কবির চৌধুরীর মুখে।

'থাক, এখন কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। খানিকটা সময় হাতে পেলে আমিই কথা বলব ওর সাথে। বহুদিন কথা বলা হয়নি ওর সাথে। মাঝে মাঝে ভাবি, চিরঞ্জীব, আমাদের দলে কোন মেয়েমানুষ রাখা ঠিক কিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে ওদের প্রয়োজন আছে, মানি, কিন্তু এদের ব্যাপারে কখনও নিশ্চিত হওয়া যায় না। অনিশ্চিত চরিত্রের লোক আমার পছন্দ নয়।'

'আরতিকে অনিশ্চিত চরিত্রের দলে ঠিক ফেলা যায় না,' চট করে বলল চিরঞ্জীব, 'ওর ওপর থেকে আপনার আস্থা উঠে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি এর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে? ওর এতদিনের সার্ভিস রেকর্ড দেখুন! কোথাও কোন ত্রুটি নেই। নিষ্ঠার সাথে প্রতিটা আদেশ পালন করে এসেছে সে গত তিন বছর। আজ হঠাৎ অকারণে ওকে সন্দেহ করতে শুরু করলে অবিচার করা হবে ওর প্রতি।'

'আমার চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে ওকে দেখছ তুমি, কাজেই হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় খানিকটা চেঞ্জ দরকার ওর। এই ধরো নতুন মুখ, নতুন দেশ, নতুন নিয়ম। ওর সাথে তোমাকেও যদি পাঠাই পেরুতে, যাবে?'

'আপনি আদেশ করলে যাব,' চিরঞ্জীব বলল। অনুভব করল, ঘামতে শুরু করেছে সে। 'কিন্তু আমার ধারণা, এখানে থেকে আপনাকে বেশি সার্ভিস দিতে পারব আমি। গত দুই বছর ধরে হেডকোয়ার্টারের কাজ চালাচ্ছি আমি। আর কারও পক্ষে চট করে এই হাজারও রকমের কাজ বুঝে নেয়া মুশকিল হবে। এতবড় একটা অর্গানাইজেশনের দায়িত্ব নেয়া সহজ কথা নয়। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন কোনটা চাই, তাহলে আমি বলব এখানেই থাকতে চাই আমি।'

একটা ভুরু উঁচু করল কবির চৌধুরী।

'সেক্ষেত্রে আরতিকে হারাতে হবে তোমার। ওর সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত

হতে হবে তোমাকে। আমার ধারণা ছিল, পরস্পরের প্রতি তোমরা খুবই ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট।'

'যতটা ভাবছেন ততটা আকর্ষণ আমার কোন মেয়েমানুষের প্রতিই নেই। ওকে কি পেরুতে পাঠানোই স্থির করেছেন?'

'ঠিক নেই,' মাথা নাড়ল কবির চৌধুরী। 'চিন্তাটা হঠাৎ মাথায় এল। এখনও স্থির করিনি কিছুই। আগে জানা দরকার আরতি একাজের উপযুক্ত কিনা, তারপর জানা দরকার ও যেতে রাজি আছে কিনা। তারপর ভেবে চিন্তে স্থির করা যাবে।' বাম হাতটা নাড়ল কবির চৌধুরী। 'আর কিছু বলার না থাকলে যেতে পারো।'

সাপের মত ঠাণ্ডা, স্থির দৃষ্টির সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল চিরঞ্জীব।

আজ একেবারে ভিত্তিমূল ধরে ওকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে কবির চৌধুরী। নিজের ঘরে নেমে গেল সে। আধগ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল একটা। অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে?

বিশ মিনিট গভীর চিন্তার পর কয়েকটা ব্যাপারে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসে গেল চিরঞ্জীব। নিশ্চয়ই কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করে হঠাৎ করেই পেরুর নাম উচ্চারণ করেছে কবির চৌধুরী। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কতখানি হাস্যকর আরতির পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব। সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতেও যে অপারেশন সেন্টার খোলার কথা কবির চৌধুরী ভাবতে পারে এতটা কল্পনাতেও আসেনি আরতির। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু ভাবতে পারে তা নয়, ভেবে বসে আছে লোকটা। ওদের কথাবার্তা শুনে ফেলেছে কবির চৌধুরী, এ সম্ভাবনাটা বাদ দিয়ে দিল চিরঞ্জীব। কারণ, আরতি পালাবার মতলব আঁটছে, এমন কি চিরঞ্জীবকেও সাথে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করছে টের পেলে ওকে সাবধান হওয়ার সুযোগ দিত না কবির চৌধুরী। নির্মম আঘাত হানত সে বিদ্যুৎবেগে। ঠাণ্ডা মাথায় গল্প করত না ওর সাথে।

গ্লাসটা শেষ করে নামিয়ে রাখল চিরঞ্জীব। বুঝতে পেরেছে সে, খুবই সতর্ক থাকতে হবে, কিন্তু অবস্থাটা ঠিক বিপজ্জনক বলা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ওর জুড়ি মেলা ভার। এত বিরাট একটা প্রতিষ্ঠান চালাবার যোগ্য লোক টাকায় ষোলোটা পাওয়া যায় না। কথাটা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে ও কবির চৌধুরীকে। হাজারটা টুকিটাকি ব্যাপার আছে, সব ওর নখদর্পণে। যাকে তাকে বসিয়ে দিলে একটি বছর হাবুডুবু খেতে হবে বাছাধনকে ঘোলের সমুদ্রে।

কাজেই ওকে সরিয়ে দেয়ার মত বোকামি করতে যাবে না কবির চৌধুরী। তবে সাবধান হতে হবে এখন থেকেই। বিশেষ করে জংগুর ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। কবির চৌধুরী ছাড়া কারও হুকুম মানে না লোকটা। অনেক আপত্তি, নালিশ এবং বিশৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়েও মনিবকে টলাতে পারেনি চিরঞ্জীব। মৃদু হেসে এড়িয়ে গেছে কবির চৌধুরী, বলেছে, প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক লেভেলেই ওর নিজস্ব লোক থাকা দরকার, যারা

সরাসরি ওর কাছেই দায়ী থাকবে। কিছুতেই জংগুর উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা পায়নি সে শত চেষ্টা করেও। খুব সাবধান থাকতে হবে জংগুর ব্যাপারে।

ড্রয়ার টেনে পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট অটোমেটিকটা বের করে যত্নের সাথে পরীক্ষা করল চিরঞ্জীব। প্রকাণ্ড শরীর জংগুর, যেমন শক্তি, তেমনি ক্ষিপ্র গতি—কিন্তু একটা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ বুলেটের শক্তি ও ক্ষিপ্রতা আরও অনেক বেশি।

আবার আধগ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিল চিরঞ্জীব। ওটা শেষ করে কাপড় ছেড়ে শাওয়ারের নিচে ভিজল সে মিনিট দশেক। তারপর প্রস্তুত হলো আরতির ঘরে যাওয়ার জন্যে। ভয় দেখিয়ে ভূত ভাগাবে সে আজ আরতির। এখান থেকে পালাবার চিন্তা যে কতখানি বিপজ্জনক, বুঝিয়ে দেবে সে আজ ভাল মত।

কাপড় পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট বাঁধল চিরঞ্জীব। নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে চেয়ে চোখ মটকে হাসল। হুইস্কির বদৌলতে আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তা বোধ এসেছে ওর মধ্যে। একটুকরো বেপরোয়া হাসির রেশ ঠোঁটে নিয়ে বেরিয়ে এল সে নিজের ঘর থেকে।

চিরঞ্জীবের এই বেপরোয়া হাসি বাসি ফুলের মত শুকিয়ে যেত যদি জানত এই মুহূর্তে মোস্তাকের সাথে কথা বলছে কবির চৌধুরী ট্রাংকলে। রিসিভারটা কানে ঠেসে ধরে বহুদূর থেকে ভেসে আসা কবির চৌধুরীর প্রতিটা কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে মোস্তাক দিল্লীর এয়ার লাইন্‌স্ হোটেলে বসে।

'এক্ষুণি রওনা হতে হবে তোমাকে,' বলল কবির চৌধুরী। 'চার নম্বর রুটে আসবে। সাথে আসবে জিনিস্‌গুলো। বুঝতে পেরেছ কি বলছি?'

'পারছি, স্যার!' নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না মোস্তাক। স্বয়ং ব্ল্যাক স্পাইডারের সাথে কথা বলবার সৌভাগ্য হয়েছে ওর! সরাসরি তার কাছ থেকে অর্ডার আসছে আজ! দিল্লীতে লোক পাঠিয়ে টাকাগুলো সংগ্রহ করবার কথা ছিল—তা না করে ওকেই ডেকে পাঠানো হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে। তার মানে চোখে পড়ে গেছে সে ব্ল্যাক স্পাইডারের। খুশি করতে পেরেছে সে।

'ঠিক সন্ধের সময় মাথেরানে পৌঁছবে তুমি। ওখান থেকে গাড়িতে নিয়ে আসা হবে তোমাকে এখানে। একটা বড় রকমের রদবদল ঘটতে যাচ্ছে হেডকোয়ার্টারে। তোমার জন্যে হয়তো ভাল একটা পোস্টের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।'

'আমি ঠিক পৌঁছে যাব, স্যার!' মোস্তাকের বীভৎস মুখে হাসি ফুটে উঠল। জ্বলজ্বল করছে ওর চোখটা।

'অলরাইট,' বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল কবির চৌধুরী। অপর হাতে তুলে নিল হাউস-টেলিফোনের রিসিভার। 'জংগু? তুমি ছাড়া আর কে কে আছে নিচে?'

'মহাবীর আছে, মিস্টার চিরঞ্জীব শর্মা আর মিস লাহিড়ী আছে, ডক্টর যোশী আর আসফ খান আছে,' বলল জংগু। 'আর লোচন অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে জুহু বীচে সামন্তকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পাহারায় থাকবে বলে।'

'মহাবীরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, তারপর কারেন্ট অফ করে দাও,' বলল কবির চৌধুরী। 'কেউ যেন বাইরে বেরোতে না পারে। বুঝতে পেরেছ? কেউ যদি বেরোবার চেষ্টা করে, আমাকে জানাবে।'

'অলরাইট, বস্!'

জংগুর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের রেশ টের পেয়ে বাঁকা একটুকরো হাসি খেলে গেল কবির চৌধুরীর ঠোঁটে।

চার

পিছনে মৃদু একটা খশখশ শব্দে ঝট করে শুয়ে পড়ল সামন্ত একপাশে। চোখের নিমেষে পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। এক গড়ান দিয়ে পজিশন নিয়ে পিস্তল তাক করল সে।

চমকে দিয়ে খানিক মস্করা করবে মনে করে পা টিপে এগোচ্ছিল লোচন, হতভম্ব হয়ে গেল ব্যাপার দেখে, থমকে দাঁড়াল পাথরের মূর্তির মত।

'গর্দভরা এইভাবেই মরে!' খেঁকিয়ে উঠল সামন্ত। 'একটা ডাক দিয়ে কাছে আসতে পারোনি?'

পিস্তলটা শোলডার হোলস্টারে গুঁজে রাখতে দেখে ধড়ে প্রাণ এল লোচনের। 'দেখতে পাইনি তোমাকে।' আবার এগোল। 'ব্যাপার কি? এত নার্ভাস হয়ে পড়েছ কেন? কি ঘটেছে?'

উঠে দাঁড়াল সামন্ত। 'কি ঘটবে আবার?' নোংরা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সামন্ত। 'কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি যে? ঘণ্টা দুয়েক পরে আসার কথা ছিল না?'

'বড় সাহেব তলব করেছে তোমাকে।' কথাটা সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করল লোচন, কিন্তু দুই চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল ওর। 'কি ঘাপলা বাধালে আবার?'

মুহূর্তে ভাবলেশহীন হয়ে গেল সামন্তের কদাকার মুখ। নির্বোধের মত চেয়ে রয়েছে লোচনের মুখের দিকে।

'কোন্ বড় সাহেব?' একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল সামন্ত, 'চিরঞ্জীব, না…'

'বড় সায়েব কয়টা আছে? চিরঞ্জীব না, ওর বাপ ডেকেছে তোমাকে। কবির চৌধুরী।' বাঁকা করে হাসল লোচন। 'রওনা হয়ে যাও। শুভস্য শীঘ্রম! এক্ষুণি গিয়ে দেখা করার হুকুম হয়েছে, ছুরি হাতে বসে আছে বড় সাহের!'

আবার কপালের ঘাম মুছল সামন্ত। গত দুই বছরে মাত্র দুইবার কথা

বলেছে সে কবির চৌধুরীর সাথে। আগ্রহ, ভয় আর উত্তেজনা মিশে অদ্ভুত এক ভাবের সৃষ্টি হলো ওর মধ্যে। একটা বড়সড় বোনাস বাগিয়ে নেয়ার মত সুযোগ এসে গেছে এবার, বুঝল সে। চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর করবার আর কোন দরকার নেই, সরাসরি বড় সাহেবকে জানাবে সে আরতির বিশ্বাসঘাতকতার কথা। লোভ হলো, কিন্তু সেই সাথে প্রচণ্ড এক ভয় চেপে ধরতে চাইছে ওকে। আরতির কথা তো জানে না কবির চৌধুরী। তবে ডেকেছে কেন? কি ভুল করে বসল সে নিজের অজান্তে?

সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে ভালবাসে লোচন। নিজের চেহারা নিয়ে বেশ একটু গর্বও আছে। বাঁকা চোখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে সামন্তকে। একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল ওর চোখে মুখে। তিন দিন শেভ করেনি, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ গিজগিজ করছে সামন্তের সারামুখে। কোট-প্যান্ট-শার্ট কয়মাস আগে ধোলাই হয়েছে বোঝার উপায় নেই, চিমটি দিলে ময়লা উঠে আসবে। তেমনি বোটকা গন্ধ পাশে দাঁড়ানো যায় না।

'একটু সাফ-সুতরো হয়ে যেয়ো। জামাকাপড় থেকে যে রকম বতু পাঁঠার গন্ধ ছাড়ছে...'

'হয়েছে, হয়েছে!' ওকে থামিয়ে দিল সামন্ত। 'মেয়েমানুষের মত সাজ-পোশাক করাটা পুরুষ মানুষকে মানায় না। কেন তলব হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু জানা গেছে?'

'জানা কোনদিন যায়? যায় না। শুধু অনুমান করা যায়। গত কয়েকমাস কিছু না করে বসে বসে বেতন খাওয়ার জন্যে কিছু কৈফিয়ৎ তলব এবং সামান্য উত্তম মধ্যমের আয়োজন হয়েছে,' বলল লোচন চোখ মটকে। 'কিংবা হয়তো তোমার ওপর ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে বড় সাহেবকে রাজি করিয়ে ফেলেছে যোশী।'

অশ্রাব্য একটা গালি দিল সামন্ত। শুনে হেসে উঠল লোচন।

'জলদি যাও!' বলল সে। 'ওদিকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বড় সাহেবের "এক্ষুণি" মানে দু'পাঁচ মিনিট পর নয়—এক্ষুণি।'

'থোড়াই কেয়ার করি আমি,' বলল সামন্ত মিথ্যে করে। 'ডরাই না। আমার কাছে এমন গরম খবর আছে, শুনলে চোখ কপালে উঠবে বড় সাহেবের। এক বছরের বোনাস তুলে দেবে আমার হাতে হাসিমুখে।'

'হ্যাঁ!' বলল লোচন, 'কোলে বসিয়ে থুতনি নেড়ে দেবে, দুই গালে চুমু দেবে।' হেসে ফেলল নিজের রসিকতায়। 'গরমে মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি ব্যাটার?'

'সে দেখতেই পাবে। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে তখন। নিজ চোখে দেখা বাবা, নিজ কানে শোনা! ইয়ার্কি না। খোঁড়া ঠ্যাং নিয়েই লাফিয়ে উঠবে বড়সাহেব খবরটা শুনলে।' চোখ পাকিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করল সামন্ত।

'কিসের খবর?' জানতে চাইল লোচন।

'তোমাকে জানানো প্রয়োজন মনে করলে জানাবে বড়সাহেব। যার তার কাছে ওসব কথা বলা যায় না। গাড়িটা কোথায় রেখেছ?'

'ওই বাংলোটার ওপাশে। অ্যাই, সামন্ত! চললে যে? খবরটা কি বলোই না!'

কোন জবাব না দিয়ে মারফতি হাসি হাসল সামন্ত, তারপর দ্রুতপায়ে এগোল রাস্তার দিকে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে।

অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে সামন্তের। জীবনে এই প্রথমবার একটু গাফিলতি হয়ে গেল ওর। লোচন বলেছিল পৌছেই রিপোর্ট করতে হবে বড় সাহেবের কাছে। কিন্তু এই অবস্থায় বড় সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সঙ্কোচ বোধ করল সে। ঠিকই বলেছে লোচন, বোটকা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ওর গা থেকে! অথচ বোনাসটা নির্ভর করছে বড় সাহেবের মনে একটা ভাল ছাপ ফেলতে পারার উপর। প্রথম দর্শনেই যদি অপছন্দ হয়, তাহলে আর পয়সা বেরোবে কি করে? তারচেয়ে চুপ করে ঘরে ফিরে চট করে দাড়ি কামিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে বাক্স থেকে ভাল কাপড় বের করে পরে নেবে সে। পাঁচ মিনিট লাগবে বড়জোর। পাঁচ মিনিটের এদিক ওদিক টের পাবে না বড় সাহেব।

মানুষ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নয়। আগামী পাঁচ মিনিটে কি ঘটতে চলেছে জানা নেই কারও। এই সামান্য একটা ভুলের কি মারাত্মক পরিণতি হতে পারে জানা থাকলে শেভ করবার তাগিদ উপেক্ষা করতে পারত সামন্ত। কিন্তু ও কি করে জানবে আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে কি ঘটতে চলেছে ওর কপালে?

জংগু কারেন্ট অফ করে দেয়ার ঠিক কয়েক সেকেন্ড আগে গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিয়ে বাড়ির পিছন দিকের একটা গোপন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল সামন্ত। বেরোবার পথ যে বন্ধ হয়ে গেল টের পেল না সে। নিশ্চিন্ত মনে লিফটে করে নেমে এল সে ত্রিশ ফুট নিচে, করিডর ধরে দ্রুতপায়ে এগোল নিজের কামরার দিকে। হ্যান্ডেলটা চাপ দিয়ে সামান্য একটু ফাঁক করেছে সে দরজাটা, এমনি সময় হাসি মুখে চিরঞ্জীব বেরোল নিজের ঘর থেকে। সামন্তকে দেখে কয়েক পা এগিয়ে এল চিরঞ্জীব।

'বড় সাহেব তলব করেছেন তোমাকে,' বলল সে, 'দেখা করেছ?'

'যাচ্ছি,' একটু ইতস্তত করে সামন্ত বলল, 'একটু পরিষ্কার হয়ে নিয়ে যাব, স্যার। কিন্তু হঠাৎ এই তলবের কারণ কি?'

'তোমাকে না পৌছনোর সাথে সাথে দেখা করতে বলা হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে গেল চিরঞ্জীবের।

'কিন্তু...এই অবস্থায় যাই কি করে, স্যার? পাঁচ মিনিটেই তৈরি হয়ে নেব। খালি শেভটা করে হাত-মুখটা ধুয়ে নেব একটু।' চিরঞ্জীবকে একটু নরম হতে দেখে বলল, 'কিন্তু এই আচমকা ডাক কেন, স্যার?'

সামন্তের ঘরের মধ্যে দু'পা এগিয়ে এসেই বোটকা গন্ধে নাক কুঁচকাল চিরঞ্জীব।

'এহ্, ঘরটাকে একেবারে মেথরপট্টি বানিয়ে ফেলেছ হে। গন্ধে তিষ্ঠানো

যাচ্ছে না।'

ব্যস্তহাতে কোট খুলে ফেলল সামন্ত। বলল, 'গন্ধ কই, স্যার? আমার নাকে তো লাগছে না?' কথা বলতে বলতে হোলস্টারসহ পিস্তলটা ঝুলিয়ে দিল একটা চেয়ারের কাঁধে। শার্ট খুলে ঘরের কোণে ফেলে ত্রস্তপদে চলে গেল বাথরুমে। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে শেভিং ব্রাশটা ভিজাতে ভিজাতে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল চিরঞ্জীবের দিকে। 'হঠাৎ বড় সাহেবের ঘরে তলব! কোন গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে গেলাম নাকি, স্যার?'

'আরে, না। অত ঘাবড়াবার কিছুই নেই। জুহু বীচের বাংলোয় আরতির চিঠি পৌঁছে দেয়ার বর্ণনাটা মনিব তোমার মুখে শুনতে চায়।'

প্রায় চমকে উঠল সামন্ত। সাবান মাখতে গিয়ে হাত থেকে ছুটে গেল ব্রাশটা। আশ্চর্য! লোকটা অন্তর্যামী নাকি? আড়ালে বসেও টের পায় কোথায় কোন্ ঘাপলা হচ্ছে। ব্রাশটা তুলে নিয়ে দু'হাতে সাবান মাখতে শুরু করল সে সারামুখে।

সামন্তের ঈষৎ চমক, হাত থেকে ব্রাশ ছুটে যাওয়া, চোখ-মুখের ভাব, সবই লক্ষ করল চিরঞ্জীব। হঠাৎ অনুভব করল, শিরশিরে এক ঠাণ্ডা স্রোত উঠে আসছে ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

'আরতিকে দেখতে পেয়েছিলে তুমি?' গলাটা স্বাভাবিক রেখে হালকা ভাবে প্রশ্ন করল চিরঞ্জীব।

'দেখেওছি, শুনেওছি।' অযথা হাঁ করে মুখটা বিকৃত করে ফেনা তুলছে সে গালে, গলায়, চিবুকে। মেশিনের মত চলছে ব্রাশ ধরা হাত।

'তোমাকে দেখতে পায়নি ও?'

'না।' ইতস্তত করল সামন্ত। যা শুনেছে সব চিরঞ্জীবকে বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছে সে। ওর সাথে ভাব না রাখলে পদে পদে বিপদ। আরতির চিহ্নও যখন থাকবে না, নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে সবাই, তখনও হয়তো ওকে কাজ করতে হবে চিরঞ্জীবের সাথে। ওকে কিছু না বলে ওকে ডিঙিয়ে বড় সাহেবকে বললে চিরশত্রু হয়ে যাবে সে চিরঞ্জীবের। কাজেই বলাই ভাল। এমন নয় যে এখন চিরঞ্জীব ওকে সবকিছু চেপে যেতে বাধ্য করতে পারবে। সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। বড় সাহেব ওপরে বসে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। এই অবস্থায় খবরটা চুপচাপ হজম করা ছাড়া উপায় নেই চিরঞ্জীবের। কোন রকম জোরজুলুম করতে সাহস পাবে না। এই নিরাপদ দূরত্ব থেকে সামন্তের খুব ইচ্ছে হলো প্রেমিকার সর্বনাশের খবর শুনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় চিরঞ্জীবের মধ্যে সেটা দেখার। মৃদু হেসে বলল, 'দেখতে পেলে তখুনি ভেগে যেত, এখানে ফিরে আসত না।'

প্রস্তুত হওয়ারও সময় পেল না সামন্ত, বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল চিরঞ্জীব। একহাতে গলা চেপে ধরে ঠেলে নিয়ে ঠেসে ধরল দেয়ালের গায়ে।

'কি বলতে চাস, হারামজাদা?' দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করল চিরঞ্জীব চাপা গলায়।

দুর্বল হাতে চিরঞ্জীবের কব্জি ধরে টানাটানি করল সামন্ত, কিন্তু আলগা

হলো না বজ্রমুঠি, বরং আরও চেপে বসছে কণ্ঠনালীর উপর। নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে সামন্তের। সাবানের ফেনা মাখা সাদা মুখটা ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে। বাম হাতে চুলের মুঠি চেপে ধরে ডান হাতটা সরিয়ে আনল চিরঞ্জীব ওর কণ্ঠনালী থেকে।

'কি বলতে চাস!' চুল ধরে জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল চিরঞ্জীব।

বুক ভরে কাঁপা শ্বাস নিল সামন্ত, কয়েক সেকেন্ড হাঁপাল, তারপর বলল, 'ছেড়ে দেন আমাকে! যা বলার বড় সাহেবের কাছে বলব আমি!'

চটাশ করে চড় মারল চিরঞ্জীব ওর গালে। ছিটকে গিয়ে দেয়ালের গায়ে লাগল সাবানের সাদা ফেনা।

'কেন ভেগে যেত?' আবার জিজ্ঞেস করল চিরঞ্জীব। 'বলে ফেল! নইলে সব ক'টা দাঁত খসিয়ে দেব এখুনি!'

'আরতি পালিয়ে যেতে চায়,' বলল সামন্ত। ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল সে। চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এসেছে চড় খেয়ে। 'ওদের সাথে চুক্তি করেছে ও।'

প্রচণ্ড এক ঘুসি তুলেছিল চিরঞ্জীব, কিন্তু সামলে নিল। লাল হয়ে গেছে ওর ফর্সা মুখ। রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। রীতিমত হাঁপাতে শুরু করেছে।

'মিথ্যুক কোথাকার!' হিংস্র বাঘের মত গর্জন করে উঠল চিরঞ্জীব।

'নিজের কানে শুনেছি আমি,' ভয়ে ভয়ে বলল সামন্ত। দেয়ালে মিশে গিয়ে নাই হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে। 'বলেছে পালিয়ে যেতে চায় ও। কিন্তু তার জন্যে টাকা দরকার। আড়াই লাখ ডলার দিলে আসফ খানকে এখান থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে।'

আরতির কথাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ল চিরঞ্জীবের। এভাবে চলতে পারে না···ধরা আমাদের পড়তেই হবে···সময় ঘনিয়ে এসেছে, বুঝতে পারছ না কেন তুমি?···ধরা পড়ার আগে কেটে পড়তে হবে আমদের!···আমার কথা শোনো, চিরঞ্জীব···পালিয়ে যাওয়া উচিত···

গর্দভ মেয়েলোক! আত্মহত্যা করতে চলেছে!

সামন্তকে ছেড়ে বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল চিরঞ্জীব।

'এই কথা নিজের কানে বলতে শুনেছ তুমি?'

'শুনেছি।' সাবানের ফেনা ধুয়ে ফেলে আবার মুখে সাবান মাখার আয়োজন করল সামন্ত। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'এইভাবে যখন-তখন গায়ে হাত তুলতে পারেন না আপনি। আমি আপনার···'

'শাট আপ!' ঠাণ্ডা গলায় ধমক দিল চিরঞ্জীব। 'নাও, শুরু করো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। একটি কথাও যেন বাদ না যায়।'

শুরু করল সামন্ত। আরতিকে দেখে পিছু নিয়েছিল সে বিপদে পড়লে উদ্ধার করবে বলে। বারান্দার উপর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।

'আপনার হুকুম ছিল বলেই গিয়েছিলাম,' চট করে যোগ করল সামন্ত, পাছে আবার আক্রমণ হয় সেই ভয়ে। 'প্রথমে আপনাদের শেখানো বুলি গড়গড় করে বলে গেল আরতি, ওরা রাজি হয়ে গেল, কাল সকালে রওনা

হবে মেয়েটা জেনেভার পথে, এমন সময় আরতি বলল, এসব মিথ্যে কথা, আসলে আসফ খানকে কোনদিনই ছেড়ে দেয়া হবে না, পুরো তেরো কোটি টাকা আদায় করে নিয়ে ওকে মেরে ফেলা হবে। ব্ল্যাক স্পাইডারের যা দাবি, তার চার ভাগের এক ভাগ টাকা ওকে দিলে আসফ খানকে মুক্ত করার ব্যাপারে ও সাহায্য করবে ওদের।'

'রাজি হলো ওরা?'

'নিশ্চয়ই। লুফে নিল প্রস্তাবটা। কিন্তু আমি বাজি রাখতে পারি, একটা পয়সাও পাবে না আরতি ওদের কাছ থেকে। কাজ হয়ে গেলে খামোকা কি আর কেউ আড়াই লাখ ডলার দেয়? এই বাড়ির কোথায় কি আছে তার একটা নকশা তৈরি করে নিয়ে যাবে ও জুহু বীচে আগামী বিষ্যুৎবার সন্ধের পর। কোথায় অ্যালার্ম আছে, কোথায় গার্ড আছে, সব।'

নিজের অজান্তেই সামনে ঝুঁকে এসেছে চিরঞ্জীব, সারামুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'এসব মিছেকথা হলে খুন হয়ে যাবে, সামন্ত!'

চাপা হিংস্র গর্জনের মত শোনাল চিরঞ্জীবের কণ্ঠস্বর। চমকে চাইল একবার সামন্ত ওর দিকে।

'না, স্যার!' ভয়ে ভয়ে বলল সে, 'একটা কথা মিছে হলে আমার কান কেটে নিয়ে কুত্তাকে খাওয়াবেন। যে কোন কিরে কাটতে পারি?'

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছল চিরঞ্জীব।

'ওরা কি পুলিসের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করবে আসফ খানকে?'

'না, স্যার। ওদের দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে আরতি, পুলিসে খবর দেবে না ওরা।'

চৌকাঠে হেলান দিল চিরঞ্জীব। আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে যাতে ভিতরের উত্তেজনা প্রকাশ না পায়। যেন কথার কথা জিজ্ঞেস করছে, এমনি ভাবে প্রশ্ন করল, 'কাউকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেছ?'

'না।'

'লোচনকে বলোনি?'

'ওকে বলতে যাব কেন?' ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে এক গালের দাড়ি নামিয়ে দিল সামন্ত। 'ওর পেটে কথা থাকে না। খবরটা শুনে বড়সাহেব দারুণ খুশি হবে, কি বলেন, স্যার? বেতন বাড়াক না বাড়াক, অন্তত ছ'মাসের বোনাস তো দেয়া উচিত, কি বলেন, স্যার?'

এসব কথা কানে ঢুকল না চিরঞ্জীবের। ভাবছে, শেষ হয়ে গেল আরতি। যোশীর হাতে তুলে দেবে এবার কবির চৌধুরী আরতিকে। তার মানে···নিজের অজান্তেই গাল দুটো একটু কুঁচকে গেল ওর। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। অনেক কথা ভিড় করে আসতে চাইছে ওর মনের ভেতর। অনেক টুকরো স্মৃতি হাজারটা কাঁটা হয়ে খোঁচাতে শুরু করেছে ওকে চারদিক থেকে। প্রথম দিন কেমন ভয় পেয়েছিল আরতি, তারপর কেমন ভাবে মন দিল ওর মত একজন চরিত্রহীন পাষণ্ডকে, ওর উপর বিশ্বাস করে

পরম নির্ভরতায় একদিন বেরিয়ে এল মেয়েটা বাপ-মা ভাই-বোন, সমাজ সংসার সব ফেলে। হঠাৎ পরিষ্কার বুঝতে পারল চিরঞ্জীব, কতটা ভালবাসে সে আরতিকে। এই উপলব্ধির তীব্রতা হতভম্ব করে দিল ওকে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। ও নিজে বুঝতে পারেনি এতদিন, কিন্তু ব্যাপারটা কবির চৌধুরীর দৃষ্টি এড়ায়নি। হঠাৎ আর একটা কথা মনে হলো ওর। পালাবার মতলবটা যে একা আরতির, একথা বিশ্বাস করবে না কবির চৌধুরী। হয়তো ধরে নেবে ও-ই আরতিকে পাঠিয়েছে এই প্রস্তাব দিয়ে। অর্থাৎ আরতি শুধু নিজে শেষ হয়নি, ওকেও শেষ করে দিয়েছে।

সামন্তের দিকে চাইল চিরঞ্জীব। মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছছে এখন। কোন কিছু দিয়ে এখন এই লোকটার মুখ বন্ধ করবার উপায় নেই। কোন কিছু দিয়েই না। ভয়ে রাজি হয়ে যাবে, যা দেবে চিরঞ্জীব তাই নেবে, কিন্তু কবির চৌধুরীর সামনে গিয়ে গড়গড় করে সব বলে দিতে এক সেকেন্ড দ্বিধা করবে না। আরতিকে বাঁচাতে হলে সামন্তের মুখ বন্ধ করতে হবে।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল চিরঞ্জীব—যেমন করে হোক, বাঁচাতেই হবে আরতিকে।

পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে দিচ্ছে সামন্ত। চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর কপালে কি আছে মনে হয় আপনার, স্যার? যোশীর হাতে তুলে দেবে ওকে?'

'জানি না,' সহজ কণ্ঠে বলল চিরঞ্জীব। 'যা হয় হোক, কেয়ারও করি না। নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছে মেয়েলোকটা।'

শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে মাথা ঝাঁকাল সামন্ত। 'আমিও তাই বলি। তাছাড়া ওর কপালে যাই থাকুক, আমার কি? তাই না?' প্যান্টের মধ্যে এক পা ঢুকাল সামন্ত। 'বোনাসটা কি নিজের মুখে চাওয়া ঠিক হবে, স্যার? রেগে যাবে না তো বড়সাহেব আবার?'

'তোমার নিজের মুখে না চাওয়াটাই বোধহয় ভাল হবে, সামন্ত,' কথা বলতে বলতে পিস্তল ঝুলিয়ে রাখা চেয়ারটার দিকে পিছিয়ে গেল চিরঞ্জীব। 'চাপ দেয়াটা ঠিক হবে না। যদি বড়সাহেব নিজের থেকে কিছু না বলে, তোমার হয়ে আমি সুপারিশ করব।'

মার খাওয়ার দুঃখ ভুলে গেল সামন্ত এক মুহূর্তে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখটা।

'করবেন, স্যার? তাহলে আমার আর কোন চিন্তাই নেই। আপনার মুখের একটা কথাই যথেষ্ট।' প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সামন্ত, ময়লায় বুজে আসা একটা চিরুনি তুলে নিল।

সাবধানে সামন্তের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল চিরঞ্জীব। খোলা দরজার দিকে চাইল। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল, গুলি করা চলবে না। জংগু বা আর কেউ যদি করিডরে থাকে ছুটে আসবে গুলির আওয়াজ শুনে। পিস্তলটা উল্টে ব্যারেল ধরল চিরঞ্জীব মুঠি করে।

'আর দেরি করলে একটা পয়সাও ছোঁয়াবে না বড় সাহেব,' বলল সে।

ধীর পায়ে এগোল সামন্তের দিকে। 'তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন উনি।'

'এই হয়ে গেছে। এবার একটু সেন্ট মেখে নিলেই আর কোন গন্ধ থাকবে না গায়ে। তারপর কোটটা চাপিয়ে...'

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল সামন্ত। আয়নায় চিরঞ্জীবের চোখ দেখে ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল চিরঞ্জীব, ঝট করে ডান হাতটা উঠল উপরে। হিম হয়ে আছে সামন্তের হৃৎপিণ্ডটা। মুখটা হাঁ করল সে প্রাণপণ জোরে চিৎকার দেয়ার জন্যে, কিন্তু এ লাইনে অভিজ্ঞ লোক সে, টের পেল কোন কিছুতেই কোন কাজ হবে না এখন আর। সময় উপস্থিত।

প্রচণ্ড জোরে নেমে এল পিস্তলের বাঁট। একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার!

হুমড়ি খেয়ে ড্রেসিং-টেবিলের উপর পড়ল, তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সামন্তের লাশ।

পাঁচ

যোশীর চলে যাওয়ার মিনিট বিশেকের মধ্যেই আবার খুলে ফেলল রানা পায়ের বেড়ি। শুধু শুধু বসে না থেকে খানিক ঘুরে ফিরে দেখা দরকার।

গুহার বাকি অংশটা অন্ধকার। গুহামুখের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেয়াল হাতড়াল রানা, কিন্তু ঠিক কোথায় এবং কত উঁচুতে লাইটের সুইচ জানা না থাকায় একটা সুইচও বাধল না হাতে। অন্ধকারেই এগোল সে আন্দাজে ভর করে। গুহার শেষ মাথায় স্টীলের দরজা, সুইচটা পাওয়া গেল দেয়ালের গায়ে। টিপ দিয়ে খুলে যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল রানা। কোন সাড়া শব্দ নেই। আরও বার কয়েক টিপ দিল বোতামে, সামনে পিছনে ধাক্কা দিল। নড়ল না দরজা।

ভাগ্য ভাল, দেয়ালের গায়ে চকচকে কি একটা দেখে হাত বাড়াল রানা। টর্চ। পেরেকের সাথে ঝুলানো। খুব সম্ভব ওটা ওখানে রাখা হয়েছে হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি ফেল করলে ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু...দূরে ওর মাথার উপর জ্বেলে রাখা বাতিটার দিকে চেয়ে দেখল রানা। কই, কারেন্ট তো আছে! তাহলে দরজাটা খুলল না কেন? নষ্ট?

টর্চের আলো ফেলে এবড়োখেবড়ো সুড়ঙ্গ পথ ধরে আবার ফিরে চলল রানা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই। মাঝামাঝি এসে ডানদিকের প্যাসেজ ধরে এগোল। কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপরই প্রকাণ্ড স্টীলের দরজা। এই দরজা দিয়েই সকালে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যোশীর অপারেশন থিয়েটারে।

বোতাম টিপতেই অস্পষ্ট একটা ক্লিক কানে এল রানার, তারপরেই দু'পাট খুলে হাঁ হয়ে গেল দরজা। সামনে উজ্জ্বল আলোকিত করিডর। একটু এগোলেই যোশীর অপারেশন থিয়েটার। এবং আরতির কথা যদি ঠিক হয়, তার ঠিক উল্টোদিকেই কন্ট্রোল রুম।

সামনে এগোবার অদম্য ইচ্ছে দমন করল রানা। আরতির সংগ্রহ করা পিস্তলের উপর নির্ভর করছে অনেকখানি। এখন ধরা পড়ে গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কপাট দুটো টেনে বন্ধ করে দিল রানা। টর্চ হাতে গুহার দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অদ্ভুত এক জিনিস আবিষ্কার করে বসল রানা। বামদিকের দেয়ালের গায়ে বিশফুট অন্তর অন্তর একটা করে গোল স্টীলের পাত বসানো আছে। পাতের গায়ে ছোট্ট একটা আংটা। সেটা ধরে এক পাশে চাপ দিতেই তিন ইঞ্চি ব্যাসের গর্ত তৈরি হয় দেয়ালের গায়ে। একটা গর্তে চোখ রাখতেই দেখা গেল চমৎকার সাজানো একটা অফিস ঘর। কেউ নেই ঘরে। বিশফুট এগিয়ে দ্বিতীয় ফোকরে চোখ রাখল রানা। সুসজ্জিত একটা শোবার ঘর। এটাও খালি। চোখ সরিয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল সে, মেঝের উপর চিরুনি হাতে শুয়ে আছে একজন লোক। ভাল করে লক্ষ করে দেখল, শুয়ে নেই, মরে পড়ে আছে একজন কার্পেটের উপর। চিনতে পারল না লোকটাকে। তৃতীয় গর্তের দিকে এগোল রানা। প্লেটটা সরাতেই দেখা গেল আরতির শোবার ঘর।

একটা টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসে আছে আরতি, কাগজ পেনসিল নিয়ে আঁকিঝুঁকি কাটছে। রানা বুঝল, কথামত নকশা আঁকছে আরতি। ডাকতে যাবে এমন সময় ঘরের দরজায় টোকার শব্দ হলো। চমকে উঠল আরতি, পেনসিলটা ছুটে গেল হাত থেকে। রাবার আর নকশা আঁকা কাগজটা চট করে ঢুকিয়ে দিল ড্রয়ারে, পেনসিলটা তুলে নিয়ে চট করে ওর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বন্ধ করে দিল ড্রয়ারটা।

অসহিষ্ণু টোকা পড়ল আবার দরজায়। চিরঞ্জীবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কি হলো, খুলবে না দরজা? কথা আছে, খোলো।'

'খুলি,' বলেই ত্রস্তহাতে ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেলল আরতি, ব্রেসিয়ারের কাঁধের বাঁধন আর পিছনের হুক খুলে টান দিয়ে বের করে আনল সেটা, তারপর চুলগুলো উস্কখুস্ক করে দিয়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। বলল, 'শুয়েছিলাম, চোখটা লেগে গিয়েছিল হঠাৎ।'

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল চিরঞ্জীব। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াতে বসল আরতি। চিরঞ্জীব বিছানার ধারে বসে সিগারেট ধরাল একটা। আড়চোখে ওর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আরতি, 'কি ব্যাপার?'

'তোমাকে যে কাজের ভার দেয়া হয়েছিল সেটা ঠিকমত পালন করেছ কিনা জিজ্ঞেস করছিল কবির চৌধুরী।' ছাতের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল চিরঞ্জীব। লক্ষ করল, কথাটা শুনেই আরতির হাতের চিরুনিটা ফসকে যাচ্ছিল, সামলে

নিল অনেক কষ্টে। রাগ হলো চিরঞ্জীবের, কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তার ধারণা বড় বেশি সহজে সেরেছ তুমি কাজটা, 'ভিতরে কিছু ভজঘট থাকতে পারে। আমি অবশ্য খুব জোরের সাথেই বলেছি, অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করেছে আরতি। তাই তো করেছ তুমি, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে তো সব বলেছি।' ভুরু কুঁচকে উঠল আরতির। 'আবার বলতে হবে গোড়া থেকে সব? তোমরা আমাকে এখন আর বিশ্বাস করতে পারছ না, তাই না?' কথাটা বলতে বলতে হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল সে। ব্যাগটা খোলাই থাকল।

ব্যাগের ভিতরের পিস্তলটা দৃষ্টি এড়াল না চিরঞ্জীবের। মৃদু হেসে ম্যাচটা জ্বেলে ধরিয়ে দিল আরতির সিগারেটটা, এবং মুহূর্তের অসাবধানতার সুযোগে বাম হাতে ঝট করে তুলে নিল ব্যাগটা। আরতি ওটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সরে গেল চিরঞ্জীবের হাত।

পিস্তলটা বের করে নিয়ে আরতির প্রশ্নের উত্তর দিল চিরঞ্জীব। 'ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। তুমি আমাদের আর বিশ্বাস করতে পারছ না, আরতি।'

স্থির হয়ে জমে গেল আরতি। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে চিরঞ্জীবের মুখের দিকে। এতক্ষণে টের পেল সে, চিরঞ্জীবকে আজ অন্য রকম লাগছে। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখ দুটো লাল, নাকের পাটা ফুলে আছে। ভিতর ভিতর ভয়ানক উত্তেজিত।

'আমার কাছ থেকেও সাবধান থাকার চেষ্টা করছ তুমি, ব্যাগটা খোলা রেখে দিচ্ছ যাতে চট করে বের করে নেয়া যায় পিস্তলটা প্রয়োজন পড়লে। কেন, আরতি, আমাকে তোমার এত ভয় কেন?'

কোন উত্তর দিল না আরতি।

পিস্তলটা উল্টেপাল্টে দেখল চিরঞ্জীব। 'সুন্দর ছোট্ট জিনিসটা। খুব কাছে থেকে মারলে বেশ কাজ দিতে পারে।' রিলিজ বাটন টিপে ম্যাগাজিনটা বের করে ফেলল সে, স্লাইড টেনে ব্রিচে পোরা বুলেটটা বের করে আনল, ম্যাগাজিন থেকে গুনে গুনে বের করল ছয়টা গুলি। তারপর ড্রেসিং টেবিলের উপর আলাদা আলাদা ভাবে সাজিয়ে দিল পিস্তল, ম্যাগাজিন আর পর পর সাতটা গুলি। 'লোডেড অবস্থায় পিস্তল জিনিসটা কোন দিনই নিরাপদ নয়, কি বলো?'

ঢোক গিলল আরতি, কথা বেরোল না মুখ থেকে। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাচ্ছে যে শ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে ওর। পিস্তলটা রেখে দিতে দেখে কিছুটা ভরসা পেল আরতি–ওর গোপন প্ল্যান নিশ্চয়ই টের পায়নি চিরঞ্জীব। চিরুনি রেখে নেইল পলিশের শিশি থেকে ব্রাশ বের করে নখের প্রতি মন দিল সে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপর হঠাৎ কথা বলে উঠল চিরঞ্জীব।

'তোমার জন্যে বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, নিজের ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা তোমার হয়েছে, আমার ভাবনাটা অনাবশ্যক

বাড়াবাড়ি।'

'কি বলছ তুমি, চিরঞ্জীব!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আরতির চোখ। 'দুশ্চিন্তার কি আছে?'

'তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম,' আপন মনেই কথা বলে চলল চিরঞ্জীব, 'সেদিন ভাবতেও পারিনি এভাবে বাঁধা পড়ে যাব। মনে করেছিলাম, ক'দিন খেলিয়ে ছেড়ে দেব। ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করেছ তুমি, আরতি। এতদিন বুঝিনি, কিন্তু আজ যখন বুঝলাম তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, তখন তুমি সরে গেছ অনেক দূরে। আশ্চর্য এক দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে তোমার আমার মাঝে। কেন এমন হয় বলতে পারবে?'

অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল আরতি চিরঞ্জীবের মুখের দিকে। জিভ দিয়ে ভেজাল শুকনো ঠোঁট। এসব কথা বলছে কেন আজ চিরঞ্জীব! অনুভব করতে পারছে ও, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু কি সেটা?

'কি হয়েছে, চিরঞ্জীব? অমন করে দেখছ কেন আমাকে? কি হয়েছে?'

'আমাকে নিয়ে পেরুতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে তুমি, যদি রাজি হয়ে যাই, যাবে?'

'কিন্তু রাজি তো হওনি, চিরঞ্জীব?'

'মানুষ তো মন পরিবর্তন করতে পারে। ধরো রাজি হয়ে গেলাম, টাকা পয়সার কি ব্যবস্থা?'

'আমাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে দেড় লাখ টাকা জমেছে। ওটা তুলে নিয়ে...'

'ওই সামান্য টাকায় ক'দিন চলবে আমাদের? আর কোন ব্যবস্থা নেই টাকার?'

'আর ব্যবস্থা হবে কি করে?' অবাক হওয়ার ভান করল আরতি। 'ওই টাকা আমাদের জন্যে যথেষ্ট। ওখানে গিয়ে হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকব না আমরা, ভদ্রভাবে টাকা রোজগার করব, খেটে খাব।'

'আমি যদি না যাই, তুমি একা যাবে?' প্রশ্ন করল চিরঞ্জীব।

খানিক ইতস্তত করল আরতি, কি বলবে ভেবে নিল, তারপর বলল, 'না। একা আমি যাব না। কিন্তু এসব কি আবোল তাবোল প্রশ্ন করছ, চিরঞ্জীব? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'খুব বেশি বাকি নেই।' মলিন হাসি হাসল চিরঞ্জীব। 'ঠকে গেলাম, আরতি। এই খানিক আগে যখন আবিষ্কার করলাম তোমাকে কতখানি ভালবাসি, তখন মনটা মস্ত বড় হয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল আমার চেয়ে বড়, আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই পৃথিবীতে। তুমি আমাকে ফাটা বেলুনের মত চুপসে ছোট করে দিলে।'

'এসব কি বলছ তুমি, চিরঞ্জীব?'

'যা বলেছি সব ভুলে যাও,' হঠাৎ কঠোর হয়ে গেল চিরঞ্জীবের কণ্ঠস্বর। 'সামন্তকে দেখতে পাওনি তুমি জুহু বীচের বাংলোয়?'

'সামন্ত!' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল আরতি। 'ও ছিল সেখানে?'

'তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে পাঠিয়েছিলাম ওকে। তোমার কয়েক হাত পিছনেই ছিল ও।'

নিজের অজান্তেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আরতি, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে এদিক ওদিক চাইল, যেন পালাবার পথ খুঁজছে। দুই চোখে নগ্ন ভীতি। সরে যাচ্ছে বিছানার কাছ থেকে একপা একপা করে।

'এই কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে সামন্ত। কবির চৌধুরী অপেক্ষা করছে ওর মুখে রিপোর্ট শোনার জন্যে। তোমার রিপোর্টে আর বিশ্বাস নেই ওর।'

কটমট করে চেয়ে রয়েছে চিরঞ্জীব, কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে যাচ্ছে আরতি। ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়েছে ওর দুই চোখ।

'গর্দভ কোথাকার!' মাথা নেড়ে বলল চিরঞ্জীব শান্ত কণ্ঠে, কিন্তু পরমুহূর্তে গর্জে উঠল, 'কী মনে করেছ তুমি! ভেবেছ বিশ্বাসঘাতকতা করে পার পেয়ে যাবে?' বিছানা ছেড়ে উঠে আরতির দিকে এগোচ্ছে সে। 'কি? উত্তর দাও! ভেবেছ সবাইকে ডুবিয়ে দিয়ে তুমি বেঁচে যাবে?' দুই হাতে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়ানো আরতির কাঁধ ধরল চিরঞ্জীব। চোখ পাকিয়ে বলল, 'সব শুনেছে সামন্ত!'

হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল আরতি, চট করে শূন্যে তুলে নিল ওকে চিরঞ্জীব। বিছানার উপর নির্দয় ভাবে ফেলল দড়াম করে।

'আড়াই লাখ ডলার! ওর বয়ে গেছে তোমাকে দিতে! এই টাকার লোভে আমাকে পর্যন্ত ভাসিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছিলে?' নিষ্ঠুর হাসি হাসল চিরঞ্জীব। 'বাহ্, যার জন্যে খুন পর্যন্ত করতে বাধে না আমার, সে-ই পিছন থেকে ছুরি সেঁধিয়ে দিচ্ছে কলজের মধ্যে! পেরুতে পালাবে! ইন্ডিয়া তো দূরের কথা, বোম্বের এই কাম্বালা হিল থেকে কোন দিন বেরোতে পারবে মনে করেছ?'

আছড়ে-পাছড়ে উঠে বসল আরতি বিছানার উপর। আতঙ্কে ডান গালটা লাফাচ্ছে ওর।

'চিরঞ্জীব! প্লীজ! তুমি বলে দেবে ওকে? ধরিয়ে দেবে আমাকে?' বিছানা থেকে প্রায় গড়িয়ে গিয়ে মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আরতি চিরঞ্জীবের সামনে। খপ করে ধরে ফেলল চিরঞ্জীবের পা। 'তোমার পায়ে পড়ি, চিরঞ্জীব। আমাকে এভাবে শেষ করে দিয়ো না! তুমি জানো ওদের হাতে ধরা পড়লে কি দশা হবে আমার।'

আরতির আতঙ্ক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা।

পা ছাড়িয়ে নিল চিরঞ্জীব। সরে দাঁড়াল।

এবার অন্য পথ ধরল আরতি।

'এই না বললে তুমি আমাকে ভালবাস। চলো, চিরঞ্জীব, পেরুতে চলে যাই আমরা। আসফ খান কথা দিয়েছে, টাকা ও ঠিকই দেবে। ও টাকা সব তোমার। চলো, বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে।'

'কবির চৌধুরী জিজ্ঞেস করছিল আমাকে, পেরুতে একটা অপারেশন সেন্টার খোলার ব্যাপারে আমরা দু'জন সেখানে যেতে রাজি আছি কিনা।'

চোখ বন্ধ হয়ে গেল আরতির।

'ওহ্! ভগবান! সব জানে তাহলে!'

'খুবই সম্ভব,' বলল চিরঞ্জীব। 'অন্তত এই কথা থেকে এটুকু পরিষ্কার বোঝা যায় পেরুতে গেলেও ওর হাত থেকে নিস্তার নেই আমাদের।'

'পেরু না হোক অন্য কোথাও যেতে পারি আমরা। জায়গার অভাব নেই, নিরাপদ জায়গা আমরা খুঁজে...'

'মনকে চোখ ঠারছ, আরতি,' কঠোর গলায় বলল চিরঞ্জীব। 'তুমি জানো, টাকা তুমি পাবে না, পেলেও কোথাও পালাবার সুযোগ তোমাকে দেবে না কবির চৌধুরী।'

'তুমি যদি এই কথা বলো তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার। যোশীর হাতে তুলে দেয়ার আগেই আত্মহত্যা করব আমি। আমার জন্যে এই সামান্য একটা ঝুঁকি নিতে পারবে না তুমি, চিরঞ্জীব। ধরা পড়ার ভয়ে তুলে দেবে আমাকে যোশীর হাতে? তোমার ভালবাসা...'

'শাট আপ!' প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল চিরঞ্জীব। আরতিকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখে দ্রুত এগিয়ে এল দুই পা। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল সামনে। 'হয়েছে, হয়েছে। ন্যাকামি রাখো। তোমার নামে নালিশ করছি না আমি। প্যানপ্যানানি থামাও এখন। কবির চৌধুরী জানে না এখনও।'

চিরঞ্জীবের চোখের দিকে চাইল আরতি। বোঝার চেষ্টা করছে ওকে।

'সত্যি? সত্যিই ব্যাপারটা চেপে যাবে তুমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি। এখন চুপ করো।' আরতিকে সামলে নিতে দেখে উঠে দাঁড়াল চিরঞ্জীব।

'কিন্তু...তাহলে সামন্ত?' আবার বিছানায় উঠে বসল আরতি। 'সামন্ত তো জানে! ওকে বিশ্বাস করা যায় না। ও ঠিক বলে দেবে কবির চৌধুরীকে।'

'বলবে না।'

'কিন্তু ওকে যে কোন মতেই বিশ্বাস...' চিরঞ্জীবের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল আরতি। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল ওর।

'মেরে ফেলেছি ওকে!' অর্ধোন্মাদের মত হাসল চিরঞ্জীব। 'কবির চৌধুরী অপেক্ষা করছে সামন্তের জন্যে, আর এদিকে চাঁদি ফাটানো অবস্থায় পড়ে আছে সামন্তের লাশ আমার ঘরে। দু'জনেই ফেঁসে গেছি আমরা। টাকার কি ব্যবস্থা করা যায়? ব্যাংক তো এখন বন্ধ?' আরতির চোখে চোখ রাখল চিরঞ্জীব। 'পালাতে হলে টাকা লাগবে। খালি হাতে অসম্ভব। সাথে কত টাকা আছে তোমার?'

'আমার কাছে? টাকা পঞ্চাশেক মত হবে।' ব্যাগ খুলবার উপক্রম করল আরতি। 'খুচরো আরও কিছু থাকতে পারে।'

'থাক থাক, আর বের করতে হবে না। আমার কাছে হাজার বিশেক আছে। ওতেই বেশ কিছুদিন চলে যাবে। তারপর সুযোগ সুবিধে মত ব্যাংকের টাকা তুলে নিলেই হবে। সামন্তের লাশ আবিষ্কার হওয়ার আগেই পালাতে হবে আমাদের। তুমি একটা ছোট্ট ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে নাও,

আমি টাকাগুলো নিয়ে আসছি।'

দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল চিরঞ্জীব মাঝপথে। ডেস্কের উপর রাখা টেলিফোন বেজে উঠেছে। তিন সেকেন্ড পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল ওরা, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল চিরঞ্জীব।

'ধরো ফোনটা।'

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল আরতি, কাঁপা হাতে তুলে নিল রিসিভার।

'চিরঞ্জীব বাবু কি আপনার ঘরে?' জংগুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'বস্ কথা বলতে চান ওঁর সাথে।'

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চিরঞ্জীবের দিকে চাইল আরতি। ভয়ে কুঁচকে গেছে গাল। রিসিভারটা এগিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'কবির চৌধুরী! তোমাকে চায়!'

ছয়

ফোকর দিয়ে বিনে পয়সার সিনেমা দেখছিল রানা, এইবার চঞ্চল হয়ে উঠল নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে। থেকে থেকে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এখন। এই কিছুক্ষণ আগেও মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিল সে আরতির সাহায্যের ব্যাপারে, কিন্তু এখন কি ঠিক অতটা নিশ্চিত হওয়া যায়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই দুইজন এখন ভাগার মতলবে আছে। সামন্তের মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার আগেই পালাতে হবে ওদের, নইলে দু'জনই ডুববে একসাথে। রানার কথা ভাববার সময় আর নেই ওদের। অথচ কারও সাহায্য ছাড়া এখান থেকে যে বেরোতে পারবে সে সম্ভাবনা খুবই কম। কি করবে সে? এখনি ডেকে কথা বলবে ওদের সাথে? না করিডরে দেখা করবে?

ঘেমে নেয়ে উঠেছে চিরঞ্জীব, রুমাল বের করে মুখ মুছে এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে। শেষটুকু দেখে যাওয়ার জন্যে দাঁড়াল রানা।

চিরঞ্জীব রিসিভারটা কানে চেপে ধরতেই কবির চৌধুরীর নরম কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'সামন্তের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোথায় ও, চিরঞ্জীব?'

'আমিও তো ওরই জন্যে অপেক্ষা করছি,' বলল চিরঞ্জীব। 'হয়তো পথে গাড়ির কোন গোলমাল হয়েছে। আমি বেরোচ্ছি এখনই গাড়ি নিয়ে, দেখি কি হয়েছে ওর।'

'গাড়ির কোন গোলমাল হয়নি,' শান্ত কণ্ঠে বলল কবির চৌধুরী। 'মহাবীরকে খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলাম। ও বলছে গ্যারেজে রয়েছে গাড়িটা, অথচ সামন্তের কোন পাত্তা নেই।'

'ঠিক আছে, আমি ওপরে আসছি,' বলল চিরঞ্জীব।

'তার কোন দরকার নেই,' চট করে বলল কবির চৌধুরী চিরঞ্জীব রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই। 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো।' শুকনো একটুকরো হাসি শোনা গেল। 'এছাড়া অবশ্য আর কোন উপায়ও নেই।' কেটে গেল লাইন।

হাসিটা পিলে চমকে দিয়েছে চিরঞ্জীবের। কি, ব্যাপার। টের পেয়ে গেল নাকি! শেষের কথাটা বলল কেন!

বিছানায় গিয়ে বসেছিল আরতি, চিরঞ্জীব ঘুরে দাঁড়াতেই ওর মুখ দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

'কি হলো!' চাপা গলায় জানতে চাইল আরতি।

'এখানেই থাকো! আমি আসছি!' বলে ত্রস্ত পায়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল চিরঞ্জীব।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে মাথাটা বের করে করিডরের এপাশ ওপাশ দেখল আরতি, তারপর ফিরে এল। ডেস্কের সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারটা টান দিয়ে বের করে রাখল মেঝের উপর, তারপর উপুড় হয়ে যতদূর যায় ঢুকিয়ে দিল ডান হাত। একশো টাকা নোটের ছয়টা বান্ডিল বের করল ওখান থেকে। ষাট হাজার টাকা। ড্রয়ারটা যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে আলনার হুকে ঝুলানো এয়ার ব্যাগ নামিয়ে তাতে পুরল টাকাগুলো, তারপর দ্রুত হাতে একজোড়া করে শাড়ি, ব্লাউজ আর পেটিকোট সাজিয়ে ফেলল টাকার বান্ডিলের উপর। একটা ব্লাউজ বোধহয় ম্যাচ হচ্ছিল না, সেটা বদলে আরেকটা ব্লাউজ ব্যাগের মধ্যে পুরে টেনে দিল যিপ।

রানা বুঝল, এই সময়। আর কিছু না হোক, কোন মতে পিস্তলটা যদি বাগাতে পারে আরতির কাছ থেকে তাহলে কাজ দেবে। চিরঞ্জীব এসে পড়ার আগেই সারতে হবে কাজটা। ফোকরে মুখ লাগিয়ে ডাক দিল সে।

'আরতি!'

চেঁচিয়ে উঠল আরতি আচমকা ডাক শুনে, চমকে ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল। কাউকে দেখতে না পেয়ে মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারা। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত।

আবার ডাকল রানা।

'আরতি! এইদিকে।'

রানা যেদিকে রয়েছে সেদিকে ফিরল আরতি, কিন্তু রানাকে দেখতে না পেয়ে আরও ভয় পেল। দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। এখুনি মূর্ছা যাবে আশঙ্কা করে আবার ডাকতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল জংগু।

ঘরে ঢুকেই চারপাশে চোখ বুলাল প্রকাণ্ড নিগ্রোটা। মেঝের উপর মূর্ছিত আরতির দিকে চাইল, এয়ার ব্যাগটা দেখল, তারপর দৃষ্টিটা এসে স্থির হলো ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা পিস্তলটার উপর। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে পিস্তলটা তুলে নিল জংগু। হাসল। ওর হাতে ছোট্ট একটা খেলনার মত লাগছে অস্ত্রটা। গুলিগুলো তুলে নিল টপাটপ, ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে

পকেটে রাখল। আবার আরতির দিকে চাইল সে। হাসল। তারপর বের হয়ে গেল লম্বা পা ফেলে।

যাহ্‌। হতাশ হয়ে পড়ল রানা। পিস্তলটার উপর অনেকখানি নির্ভর করে ছিল সে। এখন অন্য পথ দেখতে হবে। ইচ্ছে থাকলেও আরতি কোন সাহায্য করতে পারবে না। যতদূর সম্ভব টের পেয়ে গেছে কবির চৌধুরী সামন্তের মৃত্যুর ব্যাপারটা। ফোকরের সামনে থেকে সরে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ঘরে ঢুকল চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীবের মুখের দিকে চেয়ে আর নড়তে পারল না রানা। ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ওর চেহারা, ঠোঁট দুটো সরে গেছে দাঁতের উপর থেকে, হঠাৎ মনে হয় হাসছে। একটা রুমালে জড়িয়ে কি যেন নিয়ে এসেছে হাতে করে।

ঘরে ঢুকেই আরতির অবস্থা দেখে ছুটে গেল চিরঞ্জীব, কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল।

'কি হলো, আরতি! কি হলো তোমার?'

নড়ে উঠল আরতি, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চিরঞ্জীবকে দেখতে পেয়ে শান্ত হলো কিছুটা।

'কি হয়েছিল?' আবার জিজ্ঞেস করল চিরঞ্জীব। 'জ্ঞান হারিয়েছিলে? ঘরে কেউ ঢুকেছিল?'

'কে যেন ডাক দিল আমার নাম ধরে!' সভয়ে ঘরের চারপাশে আবার একবার চাইল আরতি। কাউকে দেখতে না পেয়ে আশ্বস্ত হলো। 'তুমিই ডেকেছিলে আমাকে?'

'কি যা তা বলছ, আরতি! মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার? নাও ধরো এগুলো। বিশ হাজার টাকা আছে এখানে।' আরতির হাতে একতোড়া নোট দিয়ে বলল, 'রেখে দাও ব্যাগে। কিন্তু বেরোব কি করে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ওদিকের চোরা দরজাটা খোলা যাচ্ছে না। সামনে দিয়েই বেরোতে হবে আমাদের।'

'কারেন্ট অফ করে দেয়নি তো!' জিজ্ঞেস করল আরতি।

কথাটা শুনেই ভিতর ভিতর একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠল চিরঞ্জীব।

'তাই তো! তা-ও তো হতে পারে!' এক লাফে ডেস্কের কাছে চলে এল সে, টেলিফোনের রিসিভার তুলল কানে। 'জংগু?'

'বলুন, চিরঞ্জীব বাবু?'

'পিছন দিকের দরজাটায় কি যেন গোলমাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। খোলা যাচ্ছে না।'

'ঠিক বলছেন, বাবু!' খুশি খুশি গলায় বলল জংগু। 'বসের অর্ডার। কারেন্ট অফ করে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন আমাকে।'

কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চিরঞ্জীব। ভাবলেশহীন মুখ, যেন একটা মুখোশ আঁটা আছে ওর মুখে। তারপর কথাটার মানে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে কান্নার ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে গেল ওর মুখটা। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে, 'ঠিক আছে, ওঁর কানেকশনটা দাও। উনি নিশ্চয়ই ভুলে

গেছেন আমি আছি নিচে।'

'ভুলবেন কেন?' যেন আকাশ থেকে পড়ল জংগু। চিরঞ্জীব বুঝতে পারল অবস্থাটা খুবই উপভোগ করছে জংগু। দু'জন কেউ কাউকে দেখতে পারে না দু'চোখে। হেসে উঠল জংগু, 'কারেন্ট অফ করার হুকুম দিয়েছিলেন উনি নিচে কে কে আছে সে খবর নেয়ার পরেই। উনি জানেন যে, আপনি আছেন নিচে।'

'ওঁর কানেকশন দাও তুমি!' ধমকের সুরে কথাটা বলবার চেষ্টা করল চিরঞ্জীব, কিন্তু গলাটা ভেঙে গেল হাস্যকর ভাবে।

'এক্ষুণি দিচ্ছি,' বলল জংগু। প্লাগটা বের করে নিয়ে কবির চৌধুরীর ঘরে রিং করল সে।

'কি খবর, জংগু?' কবির চৌধুরীর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'চিরঞ্জীব বাবু আপনার সাথে কথা বলতে চান, বস্।'

'তাই নাকি?' বাঁকা একফালি হাসি খেলে গেল কবির চৌধুরীর ঠোঁটে। 'ওকে জানিয়ে দাও, আমি খুব ব্যস্ত আছি। কাল সকালের আগে কথা বলবার সময় হবে না।'

'ও. কে, বস্!' একগাল হাসিতে ভরে উঠল জংগুর বীভৎস মুখ। মস্ত গোলমাল বেধে গেছে, বুঝে নিয়েছে সে। চিরঞ্জীবের জালিয়াতি খতম হতে চলেছে এতদিনে। আবার প্লাগটা আগের জায়গায় পুরে বলল, 'সরি, চিরঞ্জীব বাবু। বস্ এখন ব্যস্ত, কাল সকালের আগে কথা বলতে পারবেন না।'

দড়াম করে রাখল চিরঞ্জীব রিসিভারটা। ধীরে ধীরে ফিরল আরতির দিকে। চিবুক বেয়ে টপটপ ঘাম ঝরছে কার্পেটের উপর।

'গর্দভ! গর্দভ কোথাকার! খুব চালাকি করতে গিয়েছিলে!' রীতিমত হাঁপাচ্ছে চিরঞ্জীব। 'আটকা পড়েছি আমরা! সব টের পেয়ে গেছে কবির চৌধুরী। অফ করে দিয়েছে কারেন্ট। বেরোবার কোন রাস্তা নেই। খুব খুশি লাগছে না খবরটা শুনে?'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল আরতি, দুই হাতে কপালের দু'পাশ চেপে ধরেছে সে।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল চিরঞ্জীব ঘর থেকে। এক দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সামন্তের মৃতদেহের দিকে একটি বার না চেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিস্তল রাখা ড্রয়ারটার উপর। টান দিয়ে ড্রয়ারটা খুলেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল চিরঞ্জীবের। নেই! ব্যস্তহাতে ভিতরের কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করল সে। নেই। ওর অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ সরিয়ে ফেলেছে পিস্তলটা। নিশ্চয়ই জংগু!

কাঁপা হাতে অন্যান্য ড্রয়ারগুলো অনর্থক খুঁজল চিরঞ্জীব। সেখানেও নেই। থাকবার কথাও নয়। নিজ হাতে এই খানিকক্ষণ আগেই রেখেছে সে ওটা উপরের ড্রয়ারে। লাশটার দিকে ফিরল সে একবার। সামন্তের পিস্তলটা রয়েছে ওর ঘরে। পাগলের মত ছুটল চিরঞ্জীব করিডর ধরে। দড়াম করে খুলল সামন্তের ঘরের দরজা। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়েই পরিষ্কার দেখতে

গেল—চেয়ারের কাঁধের সাথে ঝোলানো হোলস্টারটা খালি। সরিয়ে ফেলা হয়েছে পিস্তলটা।

ধক ধক করে লাফাচ্ছে বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা। বরফের মত জমে গেছে যেন চিরঞ্জীব। এবার? এবার তাড়া করে ধরবে জংগু। ওর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই!

হঠাৎ মনে পড়ল ওর, আরতির পিস্তলটা তো আছে! জিনিসটা খেলনার মত, কিন্তু কাছাকাছি থেকে ঠিক জায়গা মত গুলি ঢোকাতে পারলে জংগুকে ঠেকানো অসম্ভব নাও হতে পারে। একেবারে নিরস্ত্র থাকার চেয়ে ওই খেলনাটা হাতে থাকা অনেক ভাল। হয়তো ওটার ভয়ে এগোতে সাহস পাবে না জংগু।

ছুটে চলে এল চিরঞ্জীব আরতির ঘরে। তেমনি কপালের দু'পাশ চেপে ধরে বসে আছে আরতি। তিন পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল চিরঞ্জীব। নেই। একটু আগে নিজ হাতে সাজিয়ে রেখেছিল সে পিস্তল, ম্যাগাজিন আর বুলেটগুলো। কিন্তু এখন নেই। চিরঞ্জীবের দুইচোখে অবিশ্বাস। চেয়ে রয়েছে ড্রেসিং টেবিলের দিকে।

'পিস্তলটা কোথায়?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল চিরঞ্জীব।

চমকে ওর দিকে চাইল আরতি। টেরই পায়নি কখন ফিরে এসেছে চিরঞ্জীব।

'পিস্তলটা কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করল চিরঞ্জীব।

'জানি না,' ভয়ে ভয়ে বলল আরতি। 'তুমিই তো রাখলে ওটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর।'

'জানি না!' দাঁত কড়মড় করে ভয়ঙ্কর চেহারা বানিয়ে ফেলল চিরঞ্জীব। তিন কদম এগিয়ে এল আরতির দিকে। 'জানি না বললেই হলো? কোথায় সরিয়েছ, বের করো ওটা!'

চিরঞ্জীবের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল আরতি।

'আমি জানি না। ওখানেই তো ছিল, নেই ওটা?'

ভ্রূ কুঁচকে গেছে চিরঞ্জীবের। ঝপ করে বসে হ্যান্ড ব্যাগটা খুলে হাতড়ে দেখল ভিতরটা, এগিয়ে এসে এয়ার ব্যাগ খুলে হাত ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। চিলের মত ছোঁ মেরে পড়ল আরতি, কিন্তু প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। নিজের দেয়া নোটের বান্ডিলটা বের করে কার্পেটের উপর রেখে কাপড়গুলো টান মেরে বের করতে শুরু করল। তারপর বের করল ছয়টা দশ হাজারী বান্ডিল। অবাক হয়ে টাকাগুলোর দিকে চেয়ে রইল চিরঞ্জীব কয়েক সেকেন্ড। তারপর ফিরল আরতির দিকে।

'মাত্র পঞ্চাশটা টাকা আছে তোমার কাছে, তাই না? অতি বড় চালাক হয়েছ তুমি! এবার ভালয় ভালয় পিস্তলটা বের করে দাও।'

'সত্যিই জানি না আমি। আমি নিইনি।' পায়ে পায়ে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়েছে আরতি।

বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল চিরঞ্জীব, বাঁ হাতে চেপে ধরল

আরতির চুলের মুঠি।

'বের কর, হারামজাদী! কোথায় রেখেছিস পিস্তল? বের কর!' চুল ধরে ঝাঁকাল সে আরতিকে।

'সত্যিই আমি...'

ঠাস করে চড় পড়ল আরতির গালে। চিৎকার করে উঠল সে ব্যথায়।

'কোথায় পিস্তল? খুন করে ফেলব আজ তোকে! কোথায় রেখেছিস ওটা? পিস্তল ছাড়া খুন হয়ে যাব দু'জনেই। কোথায় ওটা? শুনতে পাচ্ছিস? কোথায়?'

আরেকটা চড় পড়ল। সাথে সাথেই জ্ঞান হারিয়ে চিরঞ্জীবের গায়ে ঢলে পড়ল আরতি।

সাত

নিঃশব্দে ফোকরটা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসেছে রানা। বোঝা গেছে এদের মতলব টের পেয়ে গেছে কবির চৌধুরী, পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে, এবার নেমে আসবে অমোঘ শাস্তি। এরা নিজেরাই ভয়ে অস্থির হয়ে আছে, এদের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পাওয়া এখন অসম্ভব। যা করবার নিজেকেই করতে হবে ওর। এবং দ্রুত করতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির কাছে চলে এল রানা। প্রকাণ্ড দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে টিপ দিল বোতামে। যা হোক কিছু করতে হবে এখনি। অপেক্ষা করবার মানে হয় না কোন। দু'ফাঁক হয়ে খুলে গেল স্টীলের দরজা। নিঃশব্দে উজ্জ্বল আলোকিত করিডরে ঢুকে পড়ল রানা। ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে চট করে দেখে নিল শূন্য করিডর। দরজাটা বন্ধ করে এগোল সামনে। যোশীর অপারেশন থিয়েটারের ঠিক উল্টো দিকের ঘরটা কন্ট্রোল রুম। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াল রানা দরজাটার সামনে। নাহ্, এখন ঢোকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আগে একটু ঘুরে ফিরে দেখে নেয়া দরকার জায়গাটা। যে কেউ এখন করিডরে বেরিয়ে এলেই দেখে ফেলবে ওকে, কিন্তু এই ঝুঁকিটুকু নিতেই হবে ওর। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল রানা সকালে যে পথে কবির চৌধুরীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল সে পথে। কিছুদূর এগিয়ে বাম দিকে মোড় নিয়ে চলে এল আরেকটা প্যাসেজে, খানিক এগিয়েই স্টীলের দরজা। বোতাম টিপল রানা। একবার নয়, পরপর কয়েকবার। অটল, অনড় দরজা যেমন ছিল তেমনি রইল। ফিরে এসে লম্বা করিডর ধরে একেবারে শেষ মাথায় চলে এল রানা। এই দরজাও খোলা গেল না। পাশেই একটা লিফট। কোন কাজ হলো না বোতাম টিপে। অতএব? বেরোবার সব পথ রুদ্ধ। একমাত্র পথ জংগুকে কাবু করে কন্ট্রোল রুম দখল করে নিয়ে আবার কারেন্ট চালু করা। নিরস্ত্র অবস্থায়

সহজ হবে না সেটা।

নিঃশব্দ পায়ে কন্ট্রোল রূমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। দরজার হাতলে চাপ দিতে গিয়েও মত পরিবর্তন করল সে। আগে এক এক করে অন্যান্য ঘরগুলো খুঁজে দেখা দরকার কোনরকম অস্ত্র পাওয়া যায় কিনা, তারপর সম্ভব হলে আরতি ও চিরঞ্জীবের সাথে কথা বলে ওদের দলে টানার চেষ্টা করা উচিত। ওদের তিনজনেরই উদ্দেশ্য বর্তমানে এক—এখান থেকে মুক্তিলাভ। কাজেই একটা সমঝোতায় পৌঁছানো অসম্ভব নয়। ওরা দু'জন যদি জংগুর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার ব্যাপারেও কিছুটা সাহায্য করে তাহলে ওকে হয়তো বেকায়দায় ফেলে কাবু করা যেতে পারে। নিজের গরজেই সাহায্য করবে ওরা।

অপারেশন থিয়েটারে আছে শুধু ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, তাছাড়া খুব সম্ভব যোশী রয়েছে ওখানে, কাজেই প্রথমেই ওখানে না ঢুকে তার পাশের ঘর থেকে শুরু করবে স্থির করল রানা। দরজার গায়ে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড তারপর চাপ দিল হ্যান্ডেলে। খুলে গেল দরজা। ভিতরে অন্ধকার। চট করে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। টর্চ জ্বেলে ঘরের চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হলো, ঘরে কেউ নেই। এবার দেয়ালের গায়ে সুইচ খুঁজে বের করে বাতি জ্বেলে দিল। বেশ বড়সড় একটা বেডরূম। আসবাবপত্র অত্যন্ত দামী, কিন্তু খুবই অগোছাল। ডান পাশে সারা দেয়ালজোড়া বুক শেলফের কয়েকটা বইয়ের নাম পড়েই টের পেল সে এটা যোশীর ঘর।

খাটের মাথার কাছে ছোট্ট টেবিলের উপর একটা টেলিফোন রাখা। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা, পরমুহূর্তে হাসি খেলে গেল ওর মুখে। ডায়্যাল টোন পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে এটা ওপেন লাইন—যেখানে খুশি ফোন করতে পারে সে ইচ্ছে করলেই।

দরজায় বল্টু তুলে দিয়ে বিছানার ধারে বসে পড়ল রানা, ডায়্যাল করল জুহু বীচের বাংলোর নাম্বারে।

তিনবার রিঙ হওয়ার পর ক্লিক করে শব্দ হলো, তারপর পরিষ্কার ভেসে এল গিলটি মিঞার কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো। কাকে চাইতা হ্যায়?'

'তোমাকে চাইতা হ্যায়, গিলটি মিঞা। আমি মাসুদ রানা।'

আঁৎকে উঠল গিলটি মিঞা।

'বলেন কি, স্যার। কোত্থেকে বলচেন? ইদিকে ভেবে মরচি আমরা আপনার জন্যে। আমরা ধরে লিয়েচি, একোনো বুজি এঁটকে রয়েচেন চোদ্রি বাড়িতেই।'

'এখনও মাটির নিচেই বন্দী হয়ে আছি। ওখান থেকেই বলছি। পায়ের বেড়ি খুলে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি ঠিকই, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছি না।'

'কুনো চিন্তা করবেন না, স্যার। দু'চার দিনের মধ্যে ছাড়িয়ে লিয়ে আসব আপনাকে। ঢাকায় যে মেয়েটার পিছু লিয়েছিলেন, সেই মেয়েটা একোন

আমাদের দলে। ও বাড়ির নকশা…'

'ও সব আমার জানা আছে, গিলটি মিঞা,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ওর সাথে তোমাদের যা কথা হয়েছে সব ভুলে যাও। সব গোলমাল হয়ে গেছে। এদের একজন লোক তোমাদের আলোচনা শুনে ফেলেছিল। তোমরা যা প্ল্যান করেছিলে সব ভেস্তে গেছে। এখন আমারই মত ওই মেয়েটাও আটকে গেছে এই মাটির নিচের ফাঁদে। কারেন্ট অফ করে দেয়া হয়েছে কন্ট্রোল রূম থেকে, বাইরে থেকে সাহায্য না পেলে বেরোবার কোন উপায় নেই।'

'হায় হায়।' মুহূর্তে উবে গেল গিলটি মিঞার সব উৎসাহ। 'তাহলে? এবার কি করতে হবে আমাদের? পুলিসের কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'কেন?'

'আজ সকালে সার্চ করে এসেচে ওরা ও বাড়ি। আমার কতা শুনে কিন্তুক…'

'সে আমি জানি। ওরা চোরা দরজাটা খুঁজে পায়নি।'

'কাজেই আবার যকোন বিকেল বেলা গিয়ে হাজির হলুম, আরতির কতা বললুম, মাটির নিচে ঘরের কতা বললুম, সে ঘরে পানি ভরে মানুষকে ডুবিয়ে মারার ব্যবস্তার কতা বললুম, প্রথম খুব একচোট হাসলে, তারপর আমার মুক শুঁকে দেকলে গ্যাজা খেইচি কিনা, তারপর পরামর্শ দিলে বাসায় ফিরে একটা ঘুম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিচুতেই বোজাতে পারলুম না, স্যার। বড় সায়েবের সাতেও দেকা করতে পারলুম না। ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলে বেশি বাড়াবাড়ি করলে হাজতে পুরে দেবে। গতিক সুবিদে না দেকে ফিরে এলুম।'

'ঢাকায় ট্রাংকল করেছিলে?'

'সকালে সালমা দি করেছিল। তাইতেই তো সার্চের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার কতার তো কানাকড়িও দাম দেয়নি ওরা। ঢাকা থেকে জামান সায়েবের ফোন এল বলেই না…'

'ঠিক আছে, গিলটি মিঞা, আমি এখুনি একবার থানায় ফোন করছি। তুমিও পারলে আর একবার ঢাকায় ট্রাংকল করে ডি.আই.জি. সাহেবকে বর্তমান অবস্থাটা জানিও। এখন মন দিয়ে শোনো কয়েকটা কথা। পুলিসের আশায় বসে থাকলে আমাদের চলবে না। ওরা সাহায্য করুক আর না-ই করুক আজই বেরোতে হবে আমাকে এখান থেকে। ঠিক রাত আটটার সময় আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব এখান থেকে বেরোবার। তুমি গাড়িটা নিয়ে কালকের জায়গায় হাজির থাকতে পারবে না?'

'নিশ্চয়। পারব না কেন? কিন্তুক, স্যার দিনের বেলা কুত্তাগুনো বোধায় বাঁদা থাকে, উঁকি মেরে দেকতে পেলুম না একটাকেও, রাতের বেলায় ওগুনোকে সামলাবেন কি করে? তার ওপর গাড রয়েচে চার-চারটে…'

'এখন আমি নিরস্ত্র, কিন্তু এখান থেকে যদি বেরোতে পারি তাহলে পিস্তল হাতেই বেরোব। গার্ডদের ফাঁকি দেয়া কিছুই না, কিন্তু কুকুরগুলো সামলানো সত্যিই মুশকিল হবে। কি আর করা…'

'আপনি কিছু, ভাববেন না, স্যার। একটা কিছু বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। কুকুরের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'ঠিক আছে, গিলটি মিঞা। থানায় ফোন করে এখনি কথা বলছি আমি। ওরা যদি সহযোগিতা করে তাহলে আর তোমার দেয়ালের ওপর থাকার দরকার নেই, সোজা ওদের সাথে ভেতরে চলে আসবে। একতলার বসবার ঘরে ঢুকেই হাতের বাঁয়ে দেখবে একটা স্টীলের আলমারি রাখা আছে দেয়ালের গায়ে। ওটাই নিচে নামার পথ। আলমারির ডালা খুললে মনে হবে ওটা সত্যিই একটা আলমারি, কিন্তু ছোট একটা বোতাম আছে ভেতরে, সেটা টিপলে খুলে যাবে পেছনের তিন ইঞ্চি পুরু স্টীলের দরজা। তার পরেই নিচে নামার সিঁড়ি। পেছন দিক দিয়ে আরও পথ আছে, কিন্তু কোথায় জানা নেই আমার।'

'একবার ঢুকতে পারলে সব বের করে নোব, স্যার। আমার চোক ফাঁকি দোয়া সহজ নয়। তাহালে রাত ঠিক আটটায় বেরোচ্চেন?'

'হ্যাঁ। তৈরি থেকো তোমরা। সালমা কোথায়?'

'এইত্তো, পাশেই ডেঁড়িয়ে আচেন। দোব?'

'না, থাক। এখন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আমার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়া দরকার। রাখলাম।'

'ঠিক আচে। খোদা হাফেজ।'

ক্রেডলে টোকা দিয়ে বোম্বে পুলিসের ইমার্জেন্সি ফোন টু সিক্স ওয়ান এইট ডাবল ফাইভ ডায়্যাল করল রানা। ঠিক এমনি সময় কথা বলে উঠল জগজীবন যোশী সরু মেয়েলী কণ্ঠে।

'একটু নড়লেই গুলি খাবেন, মিস্টার মাসুদ রানা। ফোনটা নামিয়ে রেখে যেমন আছেন তেমনি বসে থাকুন।'

ঘরের চারপাশে চাইল রানা, দেখতে পেল না কাউকে। বুক কেসের দিকটার সামান্য নড়াচড়া টের পেয়ে ফিরল সেদিকে। রিভলভার ধরা একটা হাত দেখা যাচ্ছে কব্জি পর্যন্ত। বুক কেসের একাংশ সরে গেল আর একটু। ঘরে ঢুকল ডক্টর যোশী। এদিকে মোটা একটা পুরুষ কণ্ঠ হ্যালো হ্যালো করছে রিসিভারে।

অবস্থাটা স্বীকার করে নিতেই হলো রানাকে। রিভলভার দিয়ে রাগান্বিত ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করল যোশী রিসিভারটা নামিয়ে রাখার জন্যে। ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল সে রিসিভার।

'গুড বয়!' বলল যোশী। 'এবার মাথার ওপর হাত তুলে উঠে দাঁড়ান, ধীরে ধীরে সরে যান খাটের কাছ থেকে।'

উঠে দাঁড়াল রানা, হাত তুলল মাথার উপর, সরে গেল কয়েক পা।

'দ্যাটস্ গুড! এবার আসুন জংগুর সাথে আলাপ করিয়ে দেয়া যাক।'

এগিয়ে এল ডক্টর যোশী। খাটের পায়ার সাথে লাগানো একটা সুইচ টিপে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল হাসিমুখে।

আট

সালমার দিকে ফিরে একগাল হাসল গিলটি মিঞা, যেন দিগ্বিজয় করেছে।

খুশিতে ঝিক করে হেসে উঠল সালমাও। জীবনে কখনও এমন অবস্থায় পড়েনি বলে দুশ্চিন্তায় আধমরা হয়ে গিয়েছিল সে।

'একোন ওখেনেই এঁটকে রয়েচেন, কিন্তুক হাত-পায়ের বাঁদন খুলে দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্চেন। মাসুদ রানাকে বেঁদে রেকে দোয়া সোজা কতা নয় বাওয়া। রাত আটটায় বেরিয়ে পড়বে। পুলিস যদি সাহায্য করে, তাহালে ঢুকব আমরা ওই চোদ্রি বাড়িতে, আর নাহায়...'

'আরতি? ওর কি হলো? সাহায্য করবে না ও?'

'নাহ্! ওসব ফেঁসে গেচে। ওদের লোক নাকি নুকিয়ে ছিল এ বাড়ির আশেপাশে, আমাদের কতাবার্তা সব শুনে নালিশ করেচে। সে-ও একোন বন্দী। বেরোবার পত বন্দ...ভাল কতা, উনি ওকেন থেকে থানায় ফোন করচেন একোন, কিন্তুক ওনাকেও হেসে উড়িয়ে দিতে পারে শালারা। ঢাকায় আরাক বার ফোন করে সব কতা জানাতে বলেচেন আমাদেরকে।'

'ঠিক আছে, আমি এখনই কল বুক করছি,' রিসিভার কানে তুলে নিল সালমা। 'কিন্তু একটা কথা ভাবছি। দুপুরে যখন এবাড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে লোক ছিল, এখনও নিশ্চয়ই আছে?'

তাজ্জব হয়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল গিলটি মিঞা। চোখ বড় করে আপাদমস্তক দেখল সালমাকে।

'বেরেনটা আপনার খুলে গেচে, সালমা দি! ঠিক বলেচেন! নিচ্চয় আশেপাশে কোতাউ নুকিয়ে বসে আচে কোন শালা! একেবারে জলজ্যান্ত প্রমাণ! দাঁড়ান তিন মিলিটে ধরে লিয়ে আসচি বানচোৎ, তোবা তোবা, শালাকে।'

'আমিও যাচ্ছি,' বলল সালমা। 'আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে না। কলটা বুক করে...'

একগাল হাসল গিলটি মিঞা।

'আমার জন্যে মিচে চিন্তে করচেন, সালমা দি। আপনি নিচ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমাকে দেকার আগেই ওকে আমি দেকব।' পিস্তলটা হাতে নিল সে। 'এটা দেকলে বাগেও চমকে ওটে, ও তো কোন ছার! আপনি এখেনেই থাকুন, আপনার লাইন এটা নয়। যদি খুব ভারি লাগে তাহালে ডাকব আপনাকে।'

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল গিলটি মিঞা।

আম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে লোচন, টেরও পেল না কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদটা বেশ ভাল লাগছে ওর কাছে।

বাংলোটার দিকে মুখ করে বসে আছে সে সেই দুপুর থেকে, আবোল তাবোল ভাবনা ভাবছে, মাঝে মাঝে গুনগুন করছে দেহাতি সুর। খানিক বাদেই এসে যাবে মহাবীর, ব্যস আজকের মত ছুটি। সাড়ে ছ'টার শোতে দ্বাবিংশতিবার ববি দেখবে সে।

আবার একবার সামন্তের কথাটা মনে এল লোচনের। কি তথ্য পেল ব্যাটা? নাকি চাল মেরে গেল? যে রকম টগবগ করে ফুটছিল উত্তেজনায় তাতে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পেরেছে সামন্ত। হয়তো ভাল একটা ইনক্রিমেন্ট হয়ে যেতে পারে ওর। হোক। হিংসে করে না সে। টাকার ওপর লোভ নেই লোচনের। ভীরু সে, কোনরকম ঝুঁকির কাজে সে যেতে রাজি নয়। কোন হোটেলের লবিতে, রেস্তোরাঁয়, কিংবা পার্কে চুপচাপ বসে কারও ওপর নজর রাখতে পারলেই সে খুশি। আর খুশি সিনেমা দেখতে পেলে। চুলোয় যাক সামন্ত। আপন মনে পিনপিনে সুরে গেয়ে উঠল সে, হাম তুম, ইক কামরেমে বান্দহু, অওর চাবি খো যায়ে!

দাঁত বেরিয়ে পড়ল গিলটি মিঞার। ঝোপঝাড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে এইদিকেই এগোচ্ছিল সে, চিকন গলায় গান শুনে সোজা চাইল আম গাছটার দিকে। ঝোপের জ্বালায় দেখা গেল না কিছু, কিন্তু লোকটার সঠিক অবস্থান জানা হয়ে গেছে ওর। আগের চেয়ে আরও সাবধানে এগোল সে এবার।

বাম পাশ থেকে লোচনের পাঁচ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল গিলটি মিঞা, তবু ঘুণাক্ষরেও টের পেল না সে। চোখদুটো আধবোজা করে ও এখন ধরেছে—ম্যায় আশেক ত নাহি, মাগার এ্যায় হাসিন, য্যবসে দেখা...

'নড়েচ কি মরেচ!' গর্জে উঠল গিলটি মিঞা।

আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার দশা হলো লোচনের। ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল গিলটি মিঞার বিকটদর্শন খেলনা পিস্তলটা দেখে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সাথে সাথেই ঠকাস করে গুলি এসে লাগল ওর কপালের মাঝ বরাবর। পরিষ্কার বুঝতে পারল লোচন, মরে যাচ্ছে সে, কোন আশাই নেই আর বাঁচবার, কপাল ভেদ করে চলে গেছে গুলি। জ্ঞান হারিয়ে ধড়াস করে পড়ল সে মাটিতে। গুলি, অর্থাৎ কাঁচের মার্বেলটা ওর কপালে লেগে আম গাছের গায়ে ঠোকর খেয়ে পড়ল গিলটি মিঞার পায়ের কাছে।

মার্বেলটা যথাস্থানে ভরে রেখে পকেট থেকে একটা সরু নাইলনের কর্ড বের করল গিলটি মিঞা। শক্ত করে বাঁধল লোচনের হাত-পা, তারপর দুই হাত মুখের কাছে চোঙের মত ধরে ডাকল সালমাকে।

'সালমা দি, এইদিকে! হ্যাঁ, সোজা আম গাচটার দিকে তাকান। দরজার হুড়কোটা নিয়ে সোজা চলে আসুন। আর কুনো ভয় নেই।'

বন্দীর হাত-পা বাঁধা দেখে বুঝতে পারল সালমা মরেনি লোকটা, রাগের মাথায় হুড়কোটা তুলল পিঠের উপর এক ঘা বসিয়ে দেবে বলে।

'করেন কি, করেন কি, সালমা দি!' হাঁ হাঁ করে উঠল গিলটি মিঞা। 'মরে যাবে তো! ওকে দিয়ে কতা বলাতে হবে একোন।'

হুড়কোটা লোচনের দুই হাতের মধ্যে দিয়ে ভরে দু'জন ধরল দুইদিকে, তারপর মাটির উপর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল বাংলোর দিকে। ওকে বারান্দায় শুইয়ে চট করে এক বালতি পানি নিয়ে এল গিলটি মিঞা বাথরুম থেকে, হড়হড় করে ঢেলে দিল লোচনের নাকেমুখে। ফুঁপিয়ে উঠল লোচন, হুড়মুড় করে উঠে বসল কাশতে কাশতে। একটু সামলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে চাইল চারপাশে।

'শোন বাপু,' বলল গিলটি মিঞা, 'চোদ্রিবাড়ির কোতায় কোন ফাঁদ হায়, কোথায় গাড থাকতা হায়, কোতায় হুঁশিয়ারি ঘণ্টী হায়, কোতায় কোতায় মাটির নিচে যানেকা দরজা হায় সব আমি জানতে চাইতা হায়। বুয়েচ?' পিস্তল দিয়ে লোচনের কপালের ফুলে ওঠা জায়গাটায় খোঁচা দিল একটা। 'মিচে কতা বোলনেসে এই জায়গা বরাবর আরাকটা গুলি মারেগা। বুয়েচ? কতা তোমার বোলনেই পড়েগা বাওয়া, কাজেই যত তাড়াতাড়ি বলেগা ততই কম মার খায়গা। কি, কতা বোলতা নাই যে বড়? রাজি হায়?'

চোখ দুটো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড় হয়েছে লোচনের। মাথা নেড়ে সায় দিল।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' থুতনি ধরে আদর করল গিলটি মিঞা। 'আরাম্ভ কর তাহালে। টেলিফোনে কতা হুয়া হায় আসপ খান সায়েবের সাতে, কাজেই সাবদান, মিচে কতা বলনেসেই ধরে ফেলেগা। বুয়েচ?'

কপালের ফুলে ওঠা জায়গাটায় আরেকটা খোঁচা খেয়েই গড়গড় করে বলতে শুরু করল লোচন।

মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ডক্টর যোশীর মুখের হাসি।

খাটের পায়ার বোতামটা টিপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বড়জোর এক সেকেন্ড সময় ব্যয় করেছে সে। এই এক সেকেন্ডের অসাবধানতার সুযোগ গ্রহণ করেছে রানা। ডেস্কের উপর থেকে তুলে নিয়েছে একটা পেপার ওয়েট। রিভলভারটা রানার দিকে তুলে ট্রিগার টেপারও সময় পেল না যোশী। ধাঁই করে নাকের উপর এসে পড়ল ভারী পেপার-ওয়েট। বোঁ করে চোখের সামনে এক পাক খেলো ঘরটা, অজস্র সর্ষেফুল বনবন ঘুরতে শুরু করল চারপাশে, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সব। কখন যে সাইড টেবিলের উপর আছড়ে পড়ল, টেলিফোনের সাথে জোরে ঠুকে গেল কপাল, তারপর ধড়াস করে মেঝেতে পড়ল ওর জ্ঞানহীন দেহটা টেরই পেল না সে।

এক লাফে এগিয়ে এল রানা। রিভলভার আর পেপার ওয়েটটা তুলে নিল মেঝে থেকে, চট করে বল্টু খুলে দিল ঘরের, তারপর বুক-শেলফের ফাঁক গলে চলে গেল ওপাশে। ওপাশটায় যোশীর অপারেশন থিয়েটার। এর দরজাটা কন্ট্রোল রুমের ঠিক সামনেই।

এক্ষুণি এসে পৌঁছবে জংগু। যোশীর জ্ঞান ফিরতে এখনও অনেক দেরি আছে। কিন্তু ওর এই অবস্থা দেখে কি সিদ্ধান্ত নেবে জংগু? মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে মনে করবে, না টের পেয়ে যাবে যে বাইরের কেউ

ঢুকেছিল ঘরে? সেক্ষেত্রে এ ঘরটাও খুঁজে দেখবে জংগু। ওর সাথে এখনি বোঝাপড়া করে লাভ নেই, বরং ক্ষতি হতে পারে। রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। কাজেই জংগু যোশীর শোবার ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই বেরিয়ে যেতে হবে ওকে অপারেশন থিয়েটার থেকে। বুক শেলফটা সামান্য একটু ফাঁক করে সেই ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

আধ মিনিটও যায়নি, ঘরে এসে ঢুকল জংগু। যোশীর অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল দরজার গোড়ায়, ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। দরদর করে রক্ত ঝরছে যোশীর নাক থেকে। কিন্তু প্রথমেই যোশীর কাছে না গিয়ে দ্রুতপায়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল জংগু। প্রকাণ্ড একটা মাউযার পিস্তল বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। চট করে বাথরুমটা একবার দেখে নিয়েই যোশীর পাশে এসে দাঁড়াল জংগু। মাথা নেড়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল, তারপর নিচু হয়ে যোশীর জ্ঞানহীন দেহটা তুলে নিল যেন ছ'মাসের শিশুকে কোলে নিচ্ছে এমনি সহজ ভঙ্গিতে। খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে পালস পরীক্ষা করছে এখন।

আর দাঁড়ানো সমীচীন মনে করল না রানা। যদিও পুলিসে একটা ফোন করা এখন অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু যথেষ্ট ঝুঁকি নেয়া হয়েছে, আর নেয়া ঠিক হবে না এখন। গিলটি মিঞার ফোন পেয়ে ঢাকা থেকে কিছু তো নিশ্চয়ই করতে পারবে জামান। তাছাড়া আরও সুযোগ হয়তো পাবে সে। এখন কেটে পড়াই ভাল।

দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। সামান্য ফাঁক করে বাইরেটা একবার দেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে উজ্জ্বল আলোকিত করিডরে। ছুটে গিয়ে আরতির ঘরে টোকা দিল সে। হ্যান্ডেলে চাপ দিল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বার কয়েক নাম ধরে ডাক দিল রানা আরতিকে, আবার টোকা দিল, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে যে কোন সময় বেরিয়ে আসতে পারে জংগু যোশীর ঘর থেকে। করিডরে পা দিলেই দেখতে পাবে সে রানাকে। কাজেই আর দাঁড়াল না রানা, বন্দীগুহা থেকে স্টীলের পাত সরিয়ে ফোকর দিয়ে এদের সাথে কথা বলবে স্থির করে দৌড়ে চলে এল সে গুহার প্রবেশ-দ্বারের সামনে। বোতাম টিপতেই খুলে গেল দরজা।

এদের সাথে আলাপ করে এখান থেকে বেরোবার একটা প্ল্যান তৈরি করে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে রাত আটটা পর্যন্ত পায়ে বেড়ি পরে বসে থাকবে বলে ঠিক করল রানা। সোজা আরতির ঘরের ফোকরের সামনে এসে দাঁড়াল সে, পাতটা সরিয়ে ডাক দিল।

'চিরঞ্জীব!'

আধগ্লাস হুইস্কি ঢেলে তার মধ্যে দুটো বরফের কিউব ছাড়ল কবির চৌধুরী। নাড়া দিয়ে ঠুনঠুন আওয়াজটা শুনল কান পেতে, মুখে মৃদু হাসি। হঠাৎ ঝট করে দরজার দিকে ফিরল সে। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল মহাবীর।

দশ সেকেন্ড চুপচাপ ঘর্মাক্ত কলেবর মহাবীরের হাঁপানি দেখল সে স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কি চাও এখানে? তোমাকে তো ডাকিনি আমি?'

ভীত-সন্ত্রস্ত চোখ জোড়া নিচু করে অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে মহাবীর বলল, 'জ্বি আজ্ঞে, লোচন ধরা পড়েছে, স্যার!'

আইস টঙ যথাস্থানে রেখে ধীর পায়ে নিজের চেয়ারের দিকে এগোল কবির চৌধুরী, গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বসল চেয়ারে, তারপর তেমনি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কার হাতে?'

'জ্বি আজ্ঞে, জুহু বীচে সেই বাংলোর লোকদের হাতে, স্যার। লোচনের পরই ছিল আমার শিফট, আমি পৌঁছে দেখি ওরা দুইজন ওর হাত পা বেঁধে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাগানের মধ্যে দিয়ে বাংলোর দিকে।'

'বাধা দাওনি কেন?'

গ্লাসটা তুলে নিয়ে দুই ঢোকে অর্ধেকটা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করল কবির চৌধুরী, গ্লাসটা নামিয়ে রেখে চাইল আবার মহাবীরের মুখের দিকে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে একটা চুরুট দাঁতে চেপে আগুন ধরাল তাতে।

ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল মহাবীরের। তোতলাতে শুরু করল সে।

'জ্বি আজ্ঞে, লোল্ লোল্ লোকটার হাতে পি-পিস্তল ছিল, স্যার!'

'হুম! তারপর কি হলো?'

'বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ক-কথা আদায় করছিল লোকটা, মেয়েটা ঘরের ভেতর চলে গিয়েছিল। পনেরো মিনিটের মধ্যে এক জীপ পুলিস এসে হাজির হলো।'

নাকের পাশটা চুলকাল কবির চৌধুরী। বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। তারপর?'

'জ্বি, আজ্ঞে, তারপর আমি ছুটে এলাম আপনাকে খবরটা দিতে, স্যার!'

গ্লাসের অবশিষ্টটুকু এক ঢোকে নামিয়ে দিয়ে কবির চৌধুরী বলল, 'বেশ। বেশ করেছ।' সোজা দেয়ালের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল সে পনেরো সেকেন্ড।

কবির চৌধুরীকে এত নিস্পৃহ আর ঠাণ্ডা দেখে কয়েক গুণ বেড়ে গেল ওর প্রতি মহাবীরের শ্রদ্ধা। কিন্তু তাতে কাঁপুনি কমল না। এর সাথে ওর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও জড়িত। ঠক ঠক কাঁপছে ওর পা দুটো।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে এক সেকেন্ডও দেরি হলো না কবির চৌধুরীর। এর মানে বোম্বের খেলা শেষ। লোচনকে পাঠানো মস্ত ভুল হয়ে গেছে। অ্যামেচার। সামন্ত হলে কিছুতেই ধরা পড়ত না। যাই হোক ধরা যখন পড়েই গেছে আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। এর ফলাফলটা পানির মত পরিষ্কার। যা জানে সব গড়গড় করে বলে দেবে লোচন। অনেক কথাই জানে সে। আসফ খান কোথায় রয়েছে জানা আছে লোচনের, ব্ল্যাক স্পাইডারের কার্যকলাপের অনেক কিছুই জানা। ওর বিরুদ্ধে এতদিন পুলিসের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না, এবার জলজ্যান্ত প্রমাণ হাতে পেঁয়েছে ওরা। যা জানে সব বলবে লোচন। হ্যাঁ, মস্ত ভুল হয়েছে। এ ভুল এখন আর শোধরাবার উপায় নেই। এখুনি বিদায় নিতে হবে ওকে বোম্বের পাট চুকিয়ে।

মহাবীরের দিকে ফিরল কবির চৌধুরী।

'দশ মিনিটের মধ্যে তুমি আর আমি চলে যাব এখান থেকে,' বলল সে। 'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আমার গাড়িটা নিয়ে এসো ল্যাবরেটরির দরজার আছে। আমার শোবার ঘরে সিন্দুকের মধ্যে চারটে কাঠের বাক্স আছে, এই নাও চাবি, বাক্সগুলো গাড়িতে তোলো। ওয়ারড্রোবে দেখবে একটা চামড়ার হাত ব্যাগ আছে, সেটাও তুলে ফেলো গাড়িতে। রেডি হলে খবর দেবে আমাকে।'

'জ্বি-আজ্ঞে, স্যার।' তড়িৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল মহাবীর।

উঠে দাঁড়াল কবির চৌধুরী, প্রস্থানরত মহাবীরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে খালি গ্লাসটা নিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াল লিকার-ক্যাবিনেটের সামনে। আবার আধগ্লাস ভরে নিয়ে ফিরে এল চেয়ারে।

এরকম একটা অবস্থার জন্যে অনেক আগে থেকেই তৈরি ছিল সে। সেজন্যে বোম্বে থেকে সমুদ্র পথে ত্রিশ মাইল আর রাস্তা দিয়ে গেলে সত্তর মাইল দক্ষিণে আলিবাগ অঞ্চলে সাগর পারের একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল সে বেনামীতে। একটা স্ট্রংরূম তৈরি করে নিয়েছিল নিজের খরচে। সেখানেই সঞ্চিত আছে ওর সমস্ত ধনরত্ন। ইয়টও তৈরি আছে। টাকাপয়সা ইয়টে তুলে নিয়ে সোজা চলে যাবে সে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারব্যান শহরে। সেখানেও সব ব্যবস্থা করা আছে। কোন অসুবিধে নেই।

একমাত্র অসুবিধে ঢাকার ওই মোস্তাকটাকে নিয়ে। দিল্লী থেকে চার্টার করা প্লেন নিয়ে ঠিক সন্ধের সময় পৌছবে সে মাথেরানের এক পরিত্যক্ত এয়ার-স্ট্রিপে। তেইশ লাখ টাকা নিয়ে আসছে ও। টাকাগুলো ফেলে পালাতে চায় না ও। কিন্তু সেজন্যে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি ঠিক হবে?

সেসব পরে চিন্তা করা যাবে, ভাবল কবির চৌধুরী। এখন এখানকার কি করা যায় করে ফেলতে হবে ঝটপট।

প্রথমে মহাবীরের কথাই ধরা যাক। একে কি সাথে নেবে সে? মাথা নাড়ল কবির চৌধুরী আপন মনে। নাহ্। লোকটার রান্নার হাত চমৎকার, কিন্তু তাছাড়া আর কোন কাজের না। ওকে খতম করে দিতে হবে, পুলিসের হাতে ধরা পড়তে দিলে চলবে না।

যোশী আর জংগুরও ধরা পড়া চলবে না। যোশীকে তো একটা চিমটি কাটলেই হড়হড় করে যা জানে সব উগরে দেবে। জংগু অবশ্য তা করবে না, এবং ওর মত প্রভুভক্ত লোক পাওয়া আজকালকার দিনে প্রায় অসম্ভব, কিন্তু তবু ওকে নেয়া যাবে না সাথে। ওর চেহারা এতই প্রকাণ্ড এবং এতই প্রকট যে চোখে পড়ে যাবে ও পুলিসের। ওর সূত্র ধরে আবার শুরু হয়ে যাবে পুলিসী তৎপরতা। নাহ্। যতই প্রিয় হোক, মেরে রেখে যেতে হবে ওকেও।

আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে তিন জোড়া খুন করতে হবে ওকে, ভেবে মৃদু হাসি খেলে গেল কবির চৌধুরীর মুখে। চুমুক দিল গ্লাসে। উপায় নেই। এদের আর বাঁচিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ওর নিজেরই। চিরঞ্জীব-আরতিকে হত্যা করতে না

পারলে মরেও শান্তি পাবে না সে, যোশী-জংগুকে হতে হচ্ছে অবস্থার শিকার, আর আসফ খান-মহাবীরকে মরতে হবে এদের বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই বলে।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠায় একটু চমকে উঠল কবির চৌধুরী। ছিন্ন হলো চিন্তার সূত্র। তুলে নিল হাউস-টেলিফোনের রিসিভার।

'বলো, জংগু, কি ব্যাপার?'

'অদ্ভুত ব্যাপার, বস্! ডক্টর যোশীর জ্ঞান ফিরে এসেছে…'

'এতে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন, জংগু?' কথার মাঝখানে বাধা দিল কবির চৌধুরী। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে যে লোক জ্ঞান হারিয়েছিল তার জ্ঞান ফিরে আসাটাই তো স্বাভাবিক। অদ্ভুত কি দেখলে এর মধ্যে?'

'জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলছেন মাসুদ রানা বলে এক লোক পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মেরে নাকি জখম…'

'কি বললে!' চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠবার উপক্রম করল কবির চৌধুরী। 'মাসুদ রানা! কি বলছ তুমি?'

'আমি না, বস্। ডক্টর যোশী বলছেন। আসফ খানের আসল নাম নাকি মাসুদ রানা। কেমন করে নাকি বাঁধন খুলে ওর শোবার ঘরে ঢুকেছিল, ফোনে কথা বলছিল বাংলোয় ওর লোকদের সাথে। তারপর থানায় ফোন করার উপক্রম করতেই নাকি উনি বুকশেলফের ওপাশ থেকে রিভলভার দেখিয়ে কাবু করেন ওকে, কিন্তু আমাকে ডাকার জন্যে যেই নিচু হয়ে বোতাম টিপেছেন ওমনি নাকি একটা পেপার-ওয়েট তুলে ওর নাকের ওপর মেরে রিভলভার কেড়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে।'

'কোথায়! কোথায় ও এখন!' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী। এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে কেন আসফ খানের চেহারাটা চেনা চেনা লাগছিল। কোন সন্দেহ নেই আর!

'সব বাজে কথা, বস্!' বলল জংগু। 'আমি বন্দী-গুহায় উঁকি দিয়ে দেখে এসেছি, তেমনি পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে আসফ খান। আমার মনে হয় স্বপ্ন দেখেছেন ডক্টর যোশী।'

'আমার তা মনে হয় না, জংগু। এতক্ষণে চিনতে পেরেছি আমি ওকে। ও আমার পুরানো শত্রু মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এক স্পাই। ওসব ঠুনকো পায়ের বেড়ি খোলা ওর পক্ষে কিছুই না, জংগু। ভয়ঙ্কর লোক ও। দাঁড়াও, জংগু, তুমি লাইনে থাকো, আমি একটা কাজ সেরে আসছি এখনি।'

আশ্চর্য এক পরিবর্তন এসে গেছে কবির চৌধুরীর মধ্যে মাসুদ রানার নাম শোনামাত্র। ওর চিরশত্রু এই লোকটা। বহু কষ্টে তৈরি করা ওর চার চারটে মহা পরিকল্পনা ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে এই লোক। আজ! আজ পাওয়া গেছে ওকে বেকায়দায়! জন্মের শোধ তুলে নেবে সে এবার। সাবধান! কোথাও কোন ভুল হলে চলবে না! নিজেকেই চোখ রাঙাল কবির চৌধুরী।

চেয়ার ছেড়ে উঠে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটল কবির চৌধুরী বাড়ির পিছন

দিকে। ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে এ বাড়ির যাবতীয় মেন সুইচ আর মিটার বসানো আছে। দ্রুত হাতে চারটে বড় বড় মেনসুইচ অফ করে দিল কবির চৌধুরী। পর মুহূর্তে পৈশাচিক বিজয়োল্লাসে হা-হা করে ফেটে পড়ল সে অট্টহাসিতে। এইবার? এইবার কোথায় যাবে তুমি, মাসুদ রানা? ঠ্যাঙ দেখাল সে রানাকে উদ্দেশ্য করে। মনে মনে বলল, যদি জংগুকে কাবু করে কন্ট্রোল রুম দখল করে নেয়ার প্ল্যান এঁটে থাকো, তাহলে এই কাঁচকলা! কন্ট্রোল রুমের কন্ট্রোল কেটে দেয়া হলো মেন সুইচ অফ করে দিয়ে। আর কোন উপায় নেই, মাসুদ রানা! কোনই উপায় নেই! এবার আর নিস্তার নেই তোমার।

হাসতে হাসতে ফিরে এল কবির চৌধুরী বসবার ঘরে। রিসিভার কানে তুলে নিয়ে বলল, 'জংগু, আছ লাইনে?'

'আছি, বস্।' ভেসে এল জংগুর কণ্ঠস্বর। একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কন্ট্রোল রুমের কারেন্ট অফ করে দিলেন কেন?'

'কারণ আছে, তোমাকে বলব একটু পরে। তার আগে তুমি একটা কাজ করতে পারবে? আরতির ঘরে কানেকশনটা লাগিয়ে দিয়ে ওই মাসুদ রানাকে জ্যান্ত ধরে আনতে পারবে কোন ফোনের কাছে?'

এই ধরনের অনুরোধে যার-পর-নাই অবাক হলো জংগু। কবির চৌধুরীর হুকুম শুনেই সে অভ্যস্ত, মুখ থেকে কোন কথা বেরোনো মাত্র কুত্তার মত ছুটে গিয়ে আদেশ পালন করে আসছে সে আজ তিন বছর। অনুরোধটা বড় বিসদৃশ ঠেকল ওর কানে। বলল, 'নিশ্চয়ই, বস্! পারব না কেন? এখনি ধরে নিয়ে আসছি ওকে আমি।'

'ঠিক আছে, আমি ততক্ষণে চিরঞ্জীবের সাথে কয়েকটা কথা সেরে নিই। তুমি ধরে আনো ওকে। কিন্তু খুব সাবধান, জংগু। ওই লোকটা ভয়ঙ্কর। তার ওপর যোশীর রিভলভারটা এখন ওর কাছে। বাংলাদেশের সেরা এজেন্ট মাসুদ রানা। ওকে ধরা খুব সহজ হবে না। কিন্তু যাবার আগে ওর সাথে দুই একটা কথা বলতে বড় ইচ্ছে করছে।'

'যাবার আগে?' আবার একটা ধাক্কা খেলো জংগু।

'হ্যাঁ। বাইরে ভয়ানক গোলমাল বেধে গেছে। পুলিস রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণে। পালিয়ে যাচ্ছি আমরা, তুমি আর আমি। যাও, দেরি কোরো না। ধরে নিয়ে এসো ওকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

'ও. কে, বস্।'

আরতির ঘরে কানেকশন দিয়ে বেরিয়ে পড়ল জংগু কন্ট্রোল রুম থেকে।

রিসিভার তুলল চিরঞ্জীব।

'এই যে, চিরঞ্জীব।' মিষ্টি গলায় বলল কবির চৌধুরী। 'কেমন বোধ করছ? ভেবেছিলাম আগামীকাল সকালে তোমার সাথে কথা বলব, কিন্তু এদিকে ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছে, আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না।'

এইসব মারফতি কথার ধার দিয়েও গেল না চিরঞ্জীব, সোজাসাপ্টা

জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? জংগু বলছে আপনার হুকুমে নাকি কারেন্ট অফ করে দেয়া হয়েছে? আমি নিচে আছি একথা জেনেও নাকি আপনি এই আদেশ দিয়েছেন? এক্ষুণি আমার দেখা হওয়া দরকার আপনার সাথে। বিশেষ জরুরী একটা কথা আছে আমার–'

'কিন্তু তোমার কোন কথাই যে আর শোনার ইচ্ছে নেই আমার।' মৃদু হেসে এক ঢোক হুইস্কি খেলো কবির চৌধুরী গ্লাস থেকে। 'সময় আমার খুবই কম। তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। লোচন ধরা পড়ে গেছে। তোমাকে নিশ্চয়ই এর মানেটা ভেঙে ব্যাখ্যা করে বলবার দরকার নেই? বুঝতেই পারছ, এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। তোমাকে কেন সাথে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না সেটা জানিয়ে যাওয়া উচিত মনে করে তোমার কানেকশনটা চাইলাম। তাছাড়া জংগুকে পাঠিয়েছি আসফ খানকে ধরে আনার জন্যে। তোমরা যাকে আসফ খান বলে জানো সেই লোকটা আসলে আমার এক ভয়ঙ্কর শত্রু–মাসুদ রানা। বাংলাদেশের স্পাই। ওর সাথে দুটো কথা না বলে যেতে মন সরছে না, তাই এই ফাঁকে তোমার সাথে আলাপটা সেরে নিচ্ছি। শোনো, চিরঞ্জীব। তোমাকে ডুবিয়েছে আরতি। নিচের প্রত্যেকটা ঘরে গোপন মাইক্রোফোন ফিট করা আছে। যখন খুশি যে কোন ঘরের কথাবার্তা শুনতে পাই আমি। যখন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকি তখন চালু থাকে টেপ রেকর্ডার, সব কথা রেকর্ড হয়ে যায়, অবসর সময়ে শুনি। তোমার এবং আরতির গত কয়েকদিনের কথোপকথন সত্যিই উপভোগ করবার মত। সামন্তের ব্যাপারে ঠিক যতটা কঠোর এবং নিষ্ঠুর হতে পেরেছ, আরতির ব্যাপারেও ঠিক ততটাই শক্ত হওয়া উচিত ছিল তোমার! পারোনি। প্রেমে মজে ডুবেছ তুমি। তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, তুমি শোনোনি আমার কথা, বেশি চালাকি করতে গিয়েছিলে। তাই ডুবেছ যখন, ডুবিয়েই মারব আমি তোমাকে। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলে, এবার খাবে পানিতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে যাব আমি। যাবার আগে খুলে দিয়ে যাব ওয়াটার পাইপের মুখ। সব ডুবিয়ে দেব। কন্ট্রোল রূম এখন আউট অভ কন্ট্রোল, কাজেই জংগুকে ঘায়েল করলেও কোন লাভ হবে না। চল্লিশ মিনিট ইঁদুরের মত ছুটোছুটি...'

মাথা খারাপ হয়ে গেল চিরঞ্জীবের। অশ্রাব্য গালিগালাজ ছুটল ওর মুখ দিয়ে। গলার রগ ফুলিয়ে কুৎসিত গালি দিয়ে চলেছে সে অনর্গল। বুঝতে পেরেছে, অনুনয় বিনয় করে বা ক্ষমা চেয়ে লাভ হবে না। মরতেই হবে ওদের।

রিসিভার নামিয়ে রাখল কবির চৌধুরী। ঘড়ি দেখল। আর দুই মিনিট অপেক্ষা করবে সে জংগুর জন্যে।

গ্লাসটা খালি করে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিল সে আবার। উঠে গিয়ে স্টাডি ডেস্কের ড্রয়ার থেকে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য টুকে রাখা একটা ডায়েরী বের করে নিয়ে এল।

ঘরে ঢুকল মহাবীর।

'কি হে, সব জিনিস তোলা হয়েছে? রেডি?' জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী।

'জ্বি-আজ্ঞে, সবকিছু রেডি, স্যার।'

'ভেরি গুড! এবার খানিকটা ডাইনে সরে দাঁড়াও দেখি?'

'জ্বি, আজ্ঞে, ডানদিকে, স্যার?' বোকার মত জিজ্ঞেস করল মহাবীর।

'হ্যাঁ। কোনটা ডান কোনটা বাম জানা আছে না তোমার?'

'জ্বি আজ্ঞে, স্যার।' কয়েক পা ডাইনে সরে গেল মহাবীর, কবির চৌধুরী আঙুল দিয়ে ইশারা করতেই থেমে দাঁড়াল। টের পেল না, গোপন বন্দুকটার ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে এখন।

'ব্যস, ব্যস, ব্যস–হয়েছে,' অমায়িক ভঙ্গিতে বলল কবির চৌধুরী। 'এতেই চলবে।'

সাদা বোতামটার গায়ে আঙুল বুলাল কবির চৌধুরী কয়েক সেকেন্ড, তারপর মহাবীরের ভড়কে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে হাসল মিষ্টি করে, সেই সাথে টিপে দিল বোতামটা।

নাহ্, আর দেরি করা যায় না। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া দরকার।

নয়

বেরিয়ে পড়ল ঠিক, কিন্তু কেমন যেন খটকা বেধে গেল জংগুর মনের ভিতর।

যোশীর আক্রমণের গল্পটা বিশ্বাস করেনি সে, মনে করেছিল মাতাল অবস্থায় পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল যোশী, সেই সময় স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু কবির চৌধুরীর কথায় এখন মনে হচ্ছে ঠিকই দেখেছে যোশী। তাই যদি হয়, তাহলে লোকটা এখন সশস্ত্র। খুব সাবধানে এগোতে হবে।

কিন্তু খটকাটা ঠিক এখানে নয়। জংগু ভাবছে কবির চৌধুরীর কথা। হঠাৎ এমন বেসামাল হয়ে পড়েছে কেন বস্? আধঘণ্টা আগেও ঠিক ছিল, কিন্তু এইমাত্র টেলিফোনে যা কথাবার্তা হলো সেটা কেমন যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে ওর কাছে। কথায় কাজে কোথায় যে ঠিক অসঙ্গতিটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না সে, কিন্তু বুঝতে পারছে হিসেবে মস্ত ভুল আছে কোথাও।

কন্ট্রোল রুমের কারেন্ট অফ করে দেয়ার কি কারণ? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এখান থেকে যেন কেউ বেরোতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। বস্ ভয় পেয়েছে ওকে কাবু করে হয়তো মাসুদ রানা উঠে আসবে, তাই বন্ধ করে দিয়েছে কারেন্ট। মাসুদ রানাকে ধরে ফেললেই আবার অন করে দেবে মেইন সুইচ। কথাটা ভেবে কিছুটা আশ্বস্ত হলো জংগু। কিন্তু কই, খটকা তো যাচ্ছে না মন থেকে!

পুলিস! হ্যাঁ, পুলিস আসছে। পালিয়ে যেতে হচ্ছে কবির চৌধুরীকে।

আরতি, চিরঞ্জীব আর মাসুদ রানাকে সাথে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। যোশীকেও নেয়া হবে না। বস্ বলেছে: পালিয়ে যাচ্ছি আমরা, তুমি আর আমি। কিন্তু যাবার আগে নিশ্চয়ই ওদের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে যাবে না কবির চৌধুরী? চিরঞ্জীব আর আরতির শাস্তি হওয়াই উচিত। এত অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে দেয়া হবে শাস্তি? হিসেবটা মিলছে না এখনও।

বন্দী-গুহার স্টীলের দরজাটা খুলে সিঁড়ির ধাপ ক'টা নেমে এল জংগু। আর একটু এগিয়ে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল প্যাসেজে। ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। নেই লোকটা! উজ্জ্বল আলোর নিচে এই কিছুক্ষণ আগেও বসে ছিল লোকটা। এখন নেই।

চট করে টর্চ বের করল জংগু। এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত বুলাল টর্চের আলো। কোথাও দেখা গেল না মাসুদ রানাকে। নিশ্চয়ই আবার পায়ের বাঁধন খুলে ফোন করবার চেষ্টা করছে ও পুলিসে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে লম্বা বন্দী-গুহাটা ভাল করে খুঁজে দেখল সে। জংগু জানে এখন আর পুলিসে ফোন করে কোন লাভ নেই। করুক ব্যাটা ফোন, কথা বলার ফাঁকে ওকে ধরতে সুবিধে হবে। বাইরের লাইন একমাত্র যোশীর ঘরে। ওখানেই পাওয়া যাবে ওকে।

স্টীলের দরজা পেরিয়ে চলে এল জংগু। স্থির করল, অপারেশন থিয়েটার হয়ে বুক শেলফের ফাঁক গলে ঢুকবে যোশীর শোবার ঘরে। অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে এপাশ থেকে ঢুকে পড়ল জংগু। খুবই সাবধানে ফাঁক করল বুক শেলফটা। কিন্তু কোথায়? বিছানায় শুয়ে আছে যোশী, মাথার কাছে টেবিলের উপর চুপচাপ বসে আছে টেলিফোনটা, যেন হাত পা গুটানো অক্টোপাসের বাচ্চা। এ ঘরে আসেনি মাসুদ রানা। তাহলে নিশ্চয়ই আরতির ঘরে ঢুকেছে!

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়েই অবাক হয়ে গেল জংগু। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে কন্ট্রোল রুমের দরজা। ঝট করে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল সে। প্রথমে বেরোল একটা রিভলভার ধরা হাত, তারপর দেখা গেল রানার শরীরের একাংশ। টর্চলাইটটা দিয়ে ধাঁই করে মারল সে রানার কব্জির উপর। আচমকা বাড়ি খেয়ে রিভলভারটা ছিটকে দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল রানার হাত থেকে।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল রানা। জংগুকে দেখেই ঝটাং করে লাথি মেরে বসল হাঁটুর নিচে হাড়ের উপর। এক লাফে বেরিয়ে এল করিডরে। ব্যথায় কুঁচকে গেছে জংগুর চোখ-মুখ, কিন্তু সেই অবস্থাতেই দাঁতে দাঁত চেপে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার উপর। স্যাঁৎ করে ওর গায়ের সাথে সেঁটে গিয়ে হিপ-থ্রো করল রানা। রানার পিঠের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ধপাস করে শানের উপর পড়ল জংগু। মাথাটা ঠুকে গেল, কিন্তু কেয়ার করল না সে। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে এল আবার। পিছিয়ে যাচ্ছে রানা।

এমনি সময় দড়াম করে খুলে গেল আরতির ঘরের দরজা। তীক্ষ্ণ একটা নারীকণ্ঠের আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল। দিশেহারার মত ঘর থেকে

বেরিয়ে এল চিরঞ্জীব, তার পিছু পিছু আরতি। ছোট্ট একটা গর্জন করেই লাফ দিল জংগু। কণ্ঠনালী সই করে কারাতের কোপ মারল রানা, কিন্তু চিবুকটা নিচু করে ফেলায় কোপটা পড়ল জংগুর নাকের নরম হাড়ের উপর। একই সাথে রানার পাঁজরের উপর পড়ল জংগুর বাম হাতের প্রচণ্ড এক ঘুসি! ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ল রানা একপাক ঘুরে। নাক থেকে গল গল করে রক্ত নেমে জংগুর প্রকাণ্ড চওড়া বুকের উপর পড়ছে, ভিজে লাল হয়ে উঠছে শার্টটা। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওর মিশমিশে কালো চেহারাটা, ঠোঁট সরে গিয়ে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র জানোয়ারের মত। দুই তিন পা দৌড়ে এসেই ডাইভ দিল। পা জোড়া ভাঁজ হয়ে গেল রানার, উড়ন্ত অবস্থাতেই জংগুর বুকে পা ঠেকিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে লাথি মারল। লাথি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জংগু, কিন্তু পরমুহূর্তে হাঁটুর উপর আরেক লাথি খেয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। এবার রীতিমত ভয় পেয়েছে সে। লোকটাকে ধরে নিয়ে ফোনের কাছে হাজির করা যত সহজ হবে বলে মনে করেছিল আসলে তত সহজ নয়।

চিৎকার করে উঠল আরতি, 'কি করছেন আপনারা! পাইপের ভাল্ভ্ খুলে দিয়ে চলে গেছে কবির চৌধুরী! আমাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারছে!' মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে আরতির মুখ। কাঁপছে থরথর করে।

রানা চেয়ে দেখল টাকা ভর্তি ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে আরতি একা দাঁড়িয়ে, চিরঞ্জীব দৌড়াচ্ছে করিডরের ও মাথার স্টীলের দরজার দিকে, কিন্তু শেষ মাথায় না গিয়ে ঢুকে পড়ল বাম দিকের একটা ঘরে।

'কি বললেন? ডুবিয়ে মারছে!' এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা।

আরতির দিকে এগোতে যাচ্ছিল রানা জংগুর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে, এক লাফে এগিয়ে এসে পিছন থেকে সাপটে ধরল জংগু ওকে। একটা শাবল হাতে দৌড়ে এদিকে এগিয়ে আসছিল চিরঞ্জীব, চিৎকার করে ধমক দিল জংগুকে।

'ছেড়ে দাও, গাধা কোথাকার! মরছি আমরা সবাই!' কথাটা বলতে বলতেই আঁৎকে উঠল চিরঞ্জীব পানি দেখে।

রানাও দেখতে পেয়েছে। করিডরের ওমাথা থেকে গড়িয়ে আসতে শুরু করেছে পানি। জংগু দেখতে পায়নি, কারও কথায় কান দিল না সে, জাপটে ধরে টান দিল রানাকে কন্ট্রোলরুমের দিকে। ধাঁই করে কনুই মারল রানা জংগুর তলপেটে। হাতটা ঢিল হতেই আরেকটা প্রচণ্ড আছাড় মারল ওকে জুডোর পদ্ধতিতে।

এই আছাড়টা খেয়েই হিসেব মিলে গেল জংগুর। মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই টের পেল সে পানি ঢুকতে শুরু করেছে করিডরে। ভিজে শার্ট নিয়ে তড়াক করে উঠে বসল সে। বিস্ফারিত চোখে দেখল করিডরের দুই দিক থেকে প্রবল বেগে ঢুকছে পানি। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চারদিকে চাইল, বোধহয় খুঁজল পালাবার পথ। নেই। কোন উপায় নেই এখান থেকে বেরোবার। এবার আর বুঝতে বাকি রইল না ওর কিছু। শুধু আরতি, চিরঞ্জীব, মাসুদ রানা আর

যোশীকেই নয়, ওকেও হত্যা করছে কবির চৌধুরী।

উদ্‌ভ্রান্ত পা ফেলে করিডরে বেরিয়ে এল যোশী। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইল সবার মুখের দিকে। দেখল, এক ইঞ্চি পানি জমে গেছে করিডরেও। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে চৌকাঠের উপর। সবই বুঝেছে সে, তবু চিরঞ্জীবকে শাবল হাতে এদিকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার! জল কিসের?'

'আমাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারছে কবির চৌধুরী। দীঘির ভালভ খুলে দিয়েছে!' জংগুর উপর খিঁচিয়ে উঠল চিরঞ্জীব, 'হাঁ করে কি দেখছ? কিছু একটা করো। বেরোবার কোন উপায় জানা আছে তোমার?'

মাথা নাড়ল জংগু। 'কন্ট্রোল রুম কাজ করছে না। মেন সুইচ অফ করে দিয়েছে।'

রানা দেখল বিপদের ভয়ঙ্করতা টের পেয়ে সবাই বোকা হয়ে গেছে। ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে হয়তো কারও মাথায় কোন বুদ্ধি খেলতেও পারে। ততক্ষণে যতটা সম্ভব তথ্য জেনে নেয়া দরকার। প্রয়োজন হলে ওকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। চিরঞ্জীবের দিকে ফিরল সে।

'সবটা ডুবে যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'সিঁড়ির কাছে যে দরজা আছে, ওটাও খোলা যাবে না?' জংগুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'খোলা যাবে, কিন্তু বেরোনো যাবে না। ওপরের দরজা…'

'সেটা পরে দেখা যাবে। আমি এখনি ফোন করছি আমার বাংলোয়। খুব জোরে গাড়ি চালালে পৌঁছে যাবে সময় মত। দীঘির ভাল্‌ভ বন্ধ করতে হলে কি করতে হবে জানা আছে কারও?'

সবাই মাথা নাড়ল। কেউ জানে না। যোশী কোন কথাই বলল না। কারও কোন কথা শুনছে না সে। দুই হাতে মাথা ধরে বসে আছে দরজায় হেলান দিয়ে।

উজ্জ্বল বাতির দিকে চেয়ে রানা বলল, 'এমনিতে তো বাতি আছে দেখছি, এই কারেন্ট ব্যবহার করে কন্ট্রোল রুম চালু করা যায় না?'

মাথা নাড়ল জংগু। 'থ্রী-ফেজ দরকার। ফোর ফরটি ভোল্ট।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তুমি ওই দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করো। আমি ফোনটা সেরেই আসছি।' আরতির দিকে চেয়ে বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, মিস আরতি। যেমন করে হোক বেরিয়ে যাব আমরা এখান থেকে।'

পায়ের কব্জি পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি, দ্রুত বাড়ছে আরও। ছপাৎ ছপাৎ পা ফেলে ঢুকে পড়ল রানা যোশীর শোবার ঘরে। দুই দিকের দেয়ালের দুটো দু'ইঞ্চি ব্যাসের ফুটো দিয়ে পানি আসছে প্রবল বেগে। তিন লাফে টেলিফোনের কাছে গিয়ে পৌঁছল রানা। রিসিভারটা কানে তুলে ডায়াল টোন পেয়ে স্বস্তির সাথে ছাড়ল আটকে রাখা দম। ব্যস্তহাতে ডায়াল করল

বাংলোর নাম্বারে।

'সালমা? গিলটি মিঞা কোথায়?' সালমার হ্যালো শুনেই জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার কণ্ঠস্বরে জরুরী ভাবটা লক্ষ করল সালমা। ধড়াস করে উঠল ওর বুক।

'একটা লোককে বন্দী করা হয়েছে। ড্রইংরুমে পুলিস জেরা করছে ওকে। ওখানেই আছে গিলটি মিঞা। ডাকব?'

'না। ওকে বলো, এক্ষুণি যেন চলে আসে এখানে। আগে যা কথা হয়েছে সব বাদ। আমরা পাঁচজন এখানে আটকা পড়ে গেছি, বেরোবার পথ বন্ধ, পানি আসতে শুরু করেছে। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ভরে যাবে সব ঘর।'

'এক্ষুণি বলছি!' ভয়ের চোটে এক পর্দা চড়ে গেল সালমার কণ্ঠস্বর। 'আমিও আসছি সাথে। পুলিস আনব?'

'আনতে পারো। কবির চৌধুরী পালিয়েছে, কিন্তু গার্ডগুলো থাকতে পারে। পুলিস সাথে থাকলে সুবিধে হবে।'

'ঠিক আছে। আর কিছু, নাকি রাখব?'

'রাখো।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে মেঝের দিকে চাইল রানা। আরও দেড় ইঞ্চি বেড়েছে পানি। করিডরে বেরিয়ে দেখল আরতি দাঁড়িয়ে আছে শুধু, চিরঞ্জীব আর জংগু করিডরের দু'পাশের প্রত্যেকটা দরজা খুলে হাঁ করে দিচ্ছে। যেমন ছিল তেমনি বসে আছে যোশী। প্যাসেজে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে পানি। ভয় পেল রানা এত দ্রুত পানি বাড়তে দেখে।

'সাঁতার জানা আছে তো আপনার?' জিজ্ঞেস করল রানা আরতিকে।

মাথা নাড়ল আরতি। জানে না। আরেক ফ্যাসাদ।

'আপনি জানেন তো?' যোশীকে জিজ্ঞেস করল রানা।

কোন জবাব দিল না যোশী। বোবা হয়ে গেছে একেবারে। যেন এ জগতেই নেই।

'আপনারা দু'জন চলে যান ওপরে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে। আমি গুহার দরজাটা খুলে দিয়ে আসছি।'

হাঁটু পানিতে পা টেনে টেনে বন্দী-গুহার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। সুইচটা টিপে দিল, কিন্তু নড়ল না দরজা। বোঝা গেল, পানির চাপে আটকে রয়েছে দরজাটা। হাতল ধরে টান দিল রানা, সামান্য নড়ল দরজা। একটা কপাটে পা বাধিয়ে অপর কপাটের হাতল ধরে প্রাণপণে টানল সে। ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেল কপাটটা। হড়হড় করে করিডরের পানি নেমে যাচ্ছে বন্দী-গুহায়, দরজার চাপ কমে গেছে। নিচে নেমে দরজাটা আরও ফাঁক করতে গিয়ে পানির তোড়ে পা পিছলে চলে যাচ্ছিল রানা আর একটু হলে, সামলে নিল চট করে একটা কপাট ধরে। দুটো দরজা খুলে হাঁ করে দিয়ে টের পেল রানা পরিশ্রমটা বৃথাই গেছে। তিন মিনিটেই একই লেভেলে পৌঁছে গেছে দুই অংশের পানি। বন্দী-গুহার ছাতটা খুবই উঁচু, কিন্তু চওড়ায় খুবই

কম। ছয় ইঞ্চি পরিমাণ কমেছে করিডরের পানি, এই যা লাভ।

ফিরে এসে আবার কন্ট্রোল রুমে ঢুকল রানা। ভাবল যন্ত্রপাতিগুলো চোখের সামনে দেখলে হয়তো কোন বুদ্ধি খেলে যেতে পারে মাথায়। কিন্তু দশ মিনিট মাথা ঘামিয়েও কোন বুদ্ধি বের করতে পারল না সে। চোখের সামনে পর পর দুটো ফিউজ ছ্যাঁৎ করে নীলচে আগুন ছড়িয়ে জ্বলে যেতে দেখে এখানে আর থাকা উচিত মনে করল না সে। বেরিয়ে এল বাইরে।

করিডরের পানি এখন কোমর ছুঁই ছুঁই। বসে ছিল, এখন উঠে দাঁড়িয়ে আছে যোশী।

'চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ওদিকে চলুন।'

কেউ যেন একটা মুখোশ এঁটে দিয়েছে যোশীর মুখে। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানার দিকে, জবাব দিল না। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। আতঙ্কে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে লোকটা।

আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে এগোল রানা। বেশ কষ্ট হচ্ছে কোমর পানিতে হাঁটতে। জুতো জোড়া খুলে ফেলে দিল রানা পানিতে। প্রয়োজন হলে কোট প্যান্টও খুলতে হবে। এখন থাক। লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে বাঁয়ের প্যাসেজে এসেই দেখতে পেল রানা এখানেও সেই একই সমস্যা–দরজা খোলা যাচ্ছে না। পাগলের মত ধাক্কাধাক্কি করছে জংগু আর চিরঞ্জীব। রানা গিয়ে হাত লাগাল। কিন্তু এক ইঞ্চির বেশি ফাঁক করা গেল না দরজাটা। ওপাশে পানি জমে গেছে, সে ওজন ঠেলে সরানো যাচ্ছে না।

আরতির নাভি ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পানি। ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধে হচ্ছে বলে এক হাতে দেয়াল ধরে আছে, মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখ। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, আর খানিক বাদেই ভেসে থাকার জন্যে সাঁতার কাটতে হবে সবাইকে, ওর বোঝা নেবে না কেউ–আগামী পনেরো মিনিটের মধ্যে মারা যাবে সে। মৃত্যুর এত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে বুঝতে পারল আরতি জীবন মহা মূল্যবান, এটাকে যেমন খুশি খরচ করে ফেলা পাপ, সমাজ-সংস্কার মেনে নিয়ে আর সবার মত বাঁচা উচিত ছিল ওর, কারণ ও আর সবার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। চরম হতাশার সাথে স্বীকার করল আরতি, অপচয় করেছে সে নিজেকে, এ তারই শাস্তি। আর শুধরে নেয়ার সময় নেই, পনেরো মিনিটের মধ্যেই মরতে হচ্ছে ওকে।

'শাবলটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফেলে দিয়েছিলাম হাত থেকে,' এদিক ওদিক চাইল চিরঞ্জীব। ভয়ে শুকিয়ে গেছে মুখ। 'ঠিক কোনখানটায় ফেলেছিলাম মনে নেই।'

'এই তো আমার পায়ের কাছে,' বলল আরতি।

'পায়ের কাছে তো, সঙের মত দাঁড়িয়ে না থেকে তুলে এগিয়ে দাও না,' মুখ ভেংচে উঠল চিরঞ্জীব। 'তোলো ওটা!'

তুলতে গিয়েও আবার সোজা হয়ে গেল আরতি। নাকে মুখে পানি গিয়ে ছটফট করে উঠল, কাশল। পা দিয়ে তুলতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে ধরে সোজা করে দিল রানা। ডুব দিয়ে তুলে আনল

শাবলটা। সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলা দিল এবার জংগু আর চিরঞ্জীব, রানাও ঠেলা দিল কাঁধ ঠেকিয়ে। আধ ইঞ্চি ফাঁক হতেই সেই ফাঁকে ভরে দিল রানা শাবলটা। আর একটু ঢুকিয়ে জোরে একটা চাঁড় দিতেই বেশ কিছুটা ফাঁক হয়ে গেল দরজা। প্রবল বেগে পানি আসছে ওপাশ থেকে। জোরে একটা চাপ দিতেই খানিকটা বাঁকা হয়ে গেল শাবল। এবার বাঁকা দিকটা বাধিয়ে জোরে আরেকটা চাপ দিতেই এক ফুট মত ফাঁক হয়ে গেল দরজা।

'আপনারা ঠেলা দিতে থাকুন, আমি ভেতর থেকে টানছি,' বলেই কাত হয়ে ফাঁক দিয়ে গলে ওপাশে চলে গেল রানা।

এক কপাটে পা বাধিয়ে আরেকটা ধরে প্রাণপণে এক হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে গেল প্রকাণ্ড স্টীলের দরজার এক পাট। প্রবল তোড়ে জমে থাকা পানি বেরোচ্ছে, তারই মধ্যে চিরঞ্জীব আর জংগু একে অপরকে পিছু ফেলে কে আগে সিঁড়িতে উঠে পড়বে তার প্রতিযোগিতা করছে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আধ মিনিট ঠেসে ধরে রাখল রানা দরজাটা। এবার খোলা কপাটটা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় কপাট খুলতে গিয়ে খেয়াল করল আরতিকে দেখা যাচ্ছে না। ঝট করে ফিরল সিঁড়ির দিকে। ওখানেও নেই। জংগু আর চিরঞ্জীব উঠে দাঁড়িয়েছে নিরাপদ জায়গায়।

'আরতি? আরতি কোথায়?' চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাত দিয়ে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করল চিরঞ্জীব। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'ভেসে গেছে।'

দশ

অবাক হলো রানা। এই কিছুক্ষণ আগেই এই লোকটা আরতিকে বাঁচাবার জন্যে খুন করেছে আরেকজন লোককে। সেটা ছিল আরেকজনের প্রাণ। আরতির প্রতি তার দুর্বলতাকে আরেকজনের প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছিল চিরঞ্জীব। পরিমিত পরিমাণে বিপদের ঝুঁকিও নিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন নিজের প্রাণের প্রশ্ন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আরতি সাঁতার জানে না, ভেসে যাওয়া মানেই ডুবে যাওয়া, মরে যাওয়া, জেনেও নিশ্চিন্তে ভেসে যেতে দিয়েছে সে ওকে। মরুক আরতি, কিছুই এসে যায় না ওর। ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের অমূল্য প্রাণটা বিপদগ্রস্ত করতে পারে না সে। নিজের প্রাণটা সবচেয়ে বড়।

অবাক হওয়ার পিছনে এক সেকেন্ডের বেশি ব্যয় করল না রানা। কোটটা খুলে ছুঁড়ে সিঁড়ির উপর ফেলেই ডাইভ দিল বুক সমান পানিতে। প্যাসেজ থেকে করিডরে এসেই দেখতে পেল রানা আরতিকে। হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চলে যাচ্ছে বন্দী গুহার দিকে। যোশীকেও দেখতে পেল রানা। সিঁড়ি ঘরের পানির তোড়ে যে বড়সড় একটা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার

নিচে তলিয়ে গিয়েছিল, ভেসে উঠেছে আবার। ওখানটায় এখন সাঁতার পানি, অনবরত হাত পা ছুঁড়ছে যোশী, কোনমতে ভেসে আছে পানির উপর।

এত পানিতে হাঁটবার চেষ্টা না করে ফ্রী-স্টাইল সাঁতার কেটে এগোল রানা। কাছাকাছি আসতেই চিৎকার করে উঠল যোশী, 'তোর জন্যে! তোর জন্যে...' খামচে ধরল সে রানার চুল, টেনে নিচে নামাবার চেষ্টা করল। দুই পায়ে জড়িয়ে ধরল রানার কোমর।

আর মাত্র তিন ফুট বাকি আছে পানি ছাতে গিয়ে ঠেকবার। কাজেই সময় নষ্ট না করে দড়াম করে ঘুসি মারল রানা যোশীর থেঁতলানো নাকের উপর। ব্যথায় ককিয়ে উঠল যোশী, কিন্তু ছাড়ল না রানাকে। দু'জনেই তলিয়ে গেল পানির নিচে। এবার কনুই চালাল রানা। গোটা তিনেক গুঁতো খেয়ে রানাকে ছেড়ে দিয়ে ভেসে উঠল যোশী, ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল। যোশীর বুকের উপর পা বাধিয়ে ঝাঁপ দিল রানা আরতির দিকে। ধাক্কার চোটে কয়েক হাত পিছিয়ে গেল যোশী, রানা গেল এগিয়ে।

তলিয়ে গেছে আরতি শাড়িতে জড়িয়ে গিয়ে, ডুব দিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে পায়ের সাহায্যে এগোল রানা। করিডরের শেষ মাথায় বাথরূমের সামনে পেল সে ওকে। হাল ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বসে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর। টেনে তুলে আনল রানা ওকে উপরে। নাকমুখ দিয়ে একরাশ পানি বেরোল, ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল আরতি, ফুসফুসে পানি ঢুকে পড়ায় কাশল পাগলের মত, তারপর একটু সুস্থির হয়ে লাল চোখ মেলে চাইল রানার মুখের দিকে। ককিয়ে কেঁদে উঠে জাপটে ধরল রানাকে বেকায়দা ভঙ্গিতে। রানা যতই হাত ছাড়াতে যায়, ততই আঁকড়ে ধরে। শ্বাস নেয়ার জন্যে রানার গায়ে চাপ দিয়ে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করছে সে।

'জোরাজুরি করবেন না,' বলল রানা। 'তাহলে দু'জনেই ডুবে মরব। শরীরটা ঢিল করে দিন। ভয় নেই, আমি আপনাকে ভাসিয়ে রাখব।'

রানার কথাটা বুঝতে পেরে স্থির হয়ে গেল আরতি।

'শাড়িটা খুলে ফেলুন, তারপর পা দুটো সামনে-পিছনে নাড়তে থাকুন।'

অভ্যস্ত হাতে এখানে ওখানে তিন-চারটে টান দিয়েই আরতি খসিয়ে ফেলল শাড়িটা, পা নাড়তে শুরু করল। চিত সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা এক হাত আর দুই পায়ের সাহায্যে।

যোশীর কাছাকাছি এসেই চিৎকার করে উঠল আরতি। খামচে ধরেছে ওকে যোশী। দড়াম করে লাথি মারল রানা এবার যোশীর মুখে। সামনের কয়েকটা দাঁত ভেঙে গেল। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে আরতির হাত ছেড়ে দিল যোশী, ডুবে গেল, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভেসে উঠল আবার। আরতিকে টেনে নিয়ে বেশ খানিকটা সরে গেছে রানা ততক্ষণে।

উপরে হাত বাড়ালেই করিডরের ছাত ধরা যায়। আর মাত্র দেড় ফুট আছে। ছোট বড় নানান জাতের মাছ চলে এসেছে দীঘি থেকে পানির তোড়ে। উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে ওগুলো স্বচ্ছ পানিতে। ঝিক করে উঠছে চিতল, মৃগেল, ফলির চকচকে পেট। প্রপেলারের

মত চলেছে রানার পা দুটো। চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে আরতি, টেনে নিয়ে চলেছে ওকে রানা।

সিঁড়ির সাত-আটটা ধাপ ডুবে গেছে ইতোমধ্যেই। আরতিকে একটা সিঁড়ির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে যোশীর জন্যে এগোতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু কয়েক গজ গিয়েই থেমে গেল। আট ইঞ্চি ফাঁক রয়েছে আর। যোশীর কাছে পৌঁছবার আগেই ছাতে গিয়ে ঠেকবে পানি। এতটা পথ দম না নিয়ে সাঁতরে আসা অসম্ভব। ফিরে এল রানা। আশ্চর্য! এতবার করে বলা সত্ত্বেও লোকটা সিঁড়ি ঘরের দিকে এল না কেন? নিশ্চিত মৃত্যু ঠেকাবার কোনই উপায় নেই, জানে সে তাই?

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল রানা শাবল হাতে। শাবল দিয়ে তিন ইঞ্চি পুরু স্টীলের দরজা ঘায়েল করা যাবে না, জানে রানা। কিন্তু তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাছাড়া ওরা ঠিক কোনখানটায় আছে সহজেই টের পাবে গিলটি মিঞা ঘটাং ঘটাং আওয়াজ শুনতে পেলে।

'শাবল দিয়ে কি হবে?' টিটকারির ভঙ্গিতে বলল চিরঞ্জীব। 'কারেন্ট অন না করলে খোলা যাবে না এই দরজা। আর এখন অন করতে গেলেই ইলেকট্রিফায়েড হয়ে মারা পড়ব সবাই।'

'লোক আসছে আমার,' বলল রানা। 'পৌঁছে যাবে অল্পক্ষণেই। দরজা খুলুক বা না খুলুক আওয়াজ শুনলে ওরা বুঝতে পারবে আমরা কোথায় আছি।'

'বুঝে কি ঘণ্টা করবে ওরা?' খেঁকিয়ে উঠল চিরঞ্জীব। 'এখান থেকে কিভাবে বের করবে আমাদের শুনি?'

এমনি সময়ে নিচের করিডরের আলোগুলো নিভে গেল দপ করে। তার মানে ছাতে পৌঁছে গেছে পানি। এবার বাকি শুধু এই সিঁড়ি ঘরটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল সবাই। সবারই মনে এক চিন্তা—আর কতক্ষণ?

ভক ভক করে প্রকাণ্ড বুদ্বুদ উঠছে সিঁড়ি ঘরের পানিতে। সমস্ত বাতাস এসে জমতে চাইছে ফাঁকা জায়গাটুকুতে।

শাবলটা জংগুর হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

'তুমিই শুরু করো। পালা করে আমরা সবাই চালাব শাবল। দরজার গোড়ায় মেঝেতে মারো। বেকায়দা মত চাঁড় দিতে পারলে বলা যায় না হঠাৎ খুলেও যেতে পারে দরজাটা।'

মুখ বাঁকিয়ে হাসল চিরঞ্জীব। কিন্তু রানার হাত থেকে শাবলটা নিয়েই কাজে লেগে গেল জংগু।

সিঁড়ি ঘরটার চারপাশে চাইল রানা। মাথার উপর উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। প্রায় বিশ ফুট নিচে টলটল করছে বাড়ন্ত পানি। দ্রুত বাড়ছে আরও। মাটির নিচের সমস্ত বাতাস অবশিষ্ট ফাঁকা জায়গায় এসে জমায় কেমন একটা চাপা গুমোট ভাব। বাতাসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ ছাতের গায়ে চব্বিশ ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোল চক্র আবিষ্কার

করল রানা। এমনভাবে প্লাস্টিক পেইন্ট করা যে সহজে চোখে পড়ে না। ভাল করে ঠাহর করে তিনটে স্ক্রুও আবিষ্কার করল সে। মনে হচ্ছে একটা স্টীলের গোল পাত স্ক্রু দিয়ে আঁটা আছে জায়গাটায়। ওটা খুললে কি বেরোবার পথ পাওয়া যাবে?

খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু উবে গেল খুশিটা যখন টের পেল, ওখানে পৌঁছবার কোন উপায় নেই। উঁচু খুব বেশি না, কিন্তু নিচের ল্যান্ডিং থেকে যদি মই লাগিয়ে ওঠা যায় কেবল তাহলেই সম্ভব ওই চাকতিটার কাছে পৌঁছানো। মইয়ের প্রশ্নই আসে না এখন, কাজেই এ চিন্তা বাদ।

আর কিছু ভেবে না পেয়ে দরজার দিকে ফিরল রানা। বিভিন্ন দিক থেকে শাবল চালিয়েও কোন সুবিধা করতে পারছে না জংগু। পাথরের গা থেকে সামান্য একটু চলটা উঠেছে মাত্র আর কোন লাভ হয়নি। শাবলটা নিয়ে রানাও কসরৎ করল কিছুক্ষণ, দরজার এখানে ওখানে আঘাত করল, আরও খানিকটা গর্ত খুঁড়ল মেঝেতে। বিদ্রূপাত্মক হাসি ঠোঁটে টেনে দাঁড়িয়ে রইল চিরঞ্জীব সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে, কাজে হাত লাগাল না। জংগুর হাতে শাবলটা দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা কতদূর পর্যন্ত পানি উঠেছে দেখবে বলে।

নিচে আর নামার প্রয়োজন হলো না। কয়েক ধাপ নিচে সিঁড়ির উপর বসে ছিল আরতি, হঠাৎ চিৎকার করেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

'এসে গেছে! এসে গেছে জল!'

কথাটা শোনা মাত্র এক লাফে উঠে দাঁড়াল জংগু। পানি কোথায় এসেছে, কতদূর এসেছে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করল না সে। চিরঞ্জীবের কোট চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে দিল কয়েক সিঁড়ি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে। নিজের আগের জায়গায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করল চিরঞ্জীব কিন্তু ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল আবার। শাবলটা তুলল জংগু মাথার উপর।

'খবরদার!' নিকষ কালো মুখে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর। 'কেউ ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে না।'

জংগুর এই আকস্মিক মার-মূর্তি দেখে থমকে গেল বাকি তিনজন। কেউ আর উপরে উঠতে সাহস পেল না। বাড়ছে পানি। নীরব বিভীষিকার মত উঠে আসছে, অলঙ্ঘ্য নিয়তির মত এগিয়ে আসছে ক্রমে। এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে মৃত্যু –চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ওরা। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই সব শেষ হয়ে যাবে। রানা ভাবল, এখনও পৌঁছুচ্ছে না কেন গিলটি মিঞা? পথে কোন অ্যাক্সিডেন্ট হলো?

হাঁটু ছাড়িয়ে উরুর অর্ধেক পর্যন্ত পানি উঠে আসতেই হঠাৎ তীব্র আতঙ্কে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল চিরঞ্জীব। কান্নার মত আওয়াজ বেরোল ওর গলা দিয়ে, উন্মাদের মত দুই ধাপ উপরে উঠে খামচে ধরল জংগুর জামা, চেষ্টা করল আবার নিজের জায়গায় ফিরে যেতে। ধাঁই করে চিরঞ্জীবের পেটে হাঁটু দিয়ে মারল জংগু। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড জোরে শাবলের বাড়ি পড়ল ওর কানের

উপর। রেলিং ডিঙিয়ে ঝপাৎ করে পড়ল চিরঞ্জীব পানিতে।

আরতির মুখের দিকে চাইল রানা। খাতার সাদা পাতার মত ভাবলেশহীন ওর মুখ। যেন বুঝতেই পারেনি কি ঘটে গেল। রেলিঙের উপর দিয়ে নিচের দিকে চাইল রানা। লাল ধোঁয়ার মত রক্ত ছাড়তে ছাড়তে নেমে যাচ্ছে চিরঞ্জীব। পনেরো ফুট পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা গেল ওকে, তারপর ধীরে ধীরে আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল গভীর পানিতে।

উপরে ওঠার চেষ্টা করলে কি দশা হবে চোখের সামনে দেখে যেখানে ছিল সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রানা আর আরতি। রানার বুক আর আরতির গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেল পানি।

'আর এক ধাপ ওপরে উঠতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা জংগুকে।

'খবরদার!' চোখ পাকিয়ে কটমট করে চাইল জংগু।

অগত্যা আরতির কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে পানির উপর ভাসিয়ে রাখল রানা।

রানার গলা পর্যন্ত পানি উঠতেই একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

'আপনি কি কাচাকাচিই কোতাউ আচেন, স্যার?'

খুশিতে লাফিয়ে উঠল রানার বুক। নিজের অজান্তেই আরতিকে নিয়ে একধাপ উঠে এল সে উপরে। শাবলটা উঁচু করেও দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে থেমে গেল জংগু, মারল না।

'হ্যাঁ!' চিৎকার করে জবাব দিল রানা। 'দরজা খোলার কি ব্যবস্থা করছ, গিলটি মিঞা?'

'মেন সুইচ খুঁজে পেইচি, কিন্তুক আপনাকে জিজ্ঞেস না করে কারেন চালু করা উচিত মনে করলুম না। ভেতরে তো পানি, তাই না, স্যার?'

'হ্যাঁ। তিন মিনিটের মধ্যে ছাতে গিয়ে ঠেকবে। এখন কারেন্ট চালু করলেই মারা পড়ব শক খেয়ে।'

'ও বাবা!' আঁতকে উঠল গিলটি মিঞা। 'তাহালে তো একেবারে শেষ অবস্তা! হাত-বোমা লিয়ে এসেচি, স্যার, মেরে দেব?'

'না, না! খবরদার! দরজার এপারেই আমরা!' চিৎকার করে উঠল রানা।

'ঠিক আচে, স্যার। ঘাবড়াবেন না। আমি অন্য ব্যবস্তা দেকচি।' নিচু গলায় সাথের কোন লোককে কিছু বলল গিলটি মিঞা, তারপর আবার চিৎকার করল রানার উদ্দেশে। 'আমি সরে যাচ্চি একান থেকে। কিচু বলবেন, স্যার?'

'পানির পাইপটা খুঁজে বের করে সেটা উড়িয়ে দিতে পারো কিনা দেখো চেষ্টা করে। যা করবার তাড়াতাড়ি করো, গিলটি মিঞা। আর মাত্র চারফুট বাকি আছে।'

গিলটি মিঞার তরফ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কথা না বাড়িয়ে ছুট দিয়েছে সে।

আরও এক ধাপ উঠল রানা। এবারও শাবল চালানো উচিত হবে কিনা

স্থির করতে না পেরে নিশ্চল রইল জংগু। কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে ওর।

'পারবে না ওরা,' চাপা গলায় বলল আরতি। 'কিছুই করতে পারবে না।'

'আজ পর্যন্ত ওকে কোন কাজ না পারতে দেখিনি আমি,' কথাটা বেশ জোরের সাথে বলবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু গলায় তেমন জোর পেল না। কিছুতেই বুঝতে পারল না সে কিভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে গিলটি মিঞা ওদের। তবু বলল, 'একটা কিছু বুদ্ধি ও বের করে ফেলবেই।'

চুপচাপ কেটে গেল মিনিট খানেক। জংগুর কাঁধ সমান উঠে গেছে পানি। আর উপরে উঠতে সাহস না পেয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে রানা এক হাতে আরতিকে ভাসিয়ে রেখে। হঠাৎ উদ্ভট এক প্রশ্ন করল সে।

'একটা পয়সা দিতে পারবেন? আছে?'

অবাক দৃষ্টিতে চাইল আরতি রানার মুখের দিকে। ভাবল, মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গিয়েও ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে রাখায় ঠাট্টা করছে রানা। টিটকারি মারছে।

'ঠাট্টা করছেন?' বলল সে।

'না।' চব্বিশ ইঞ্চি ব্যাসের গোল চাকতিটার দিকে ইঙ্গিত করল রানা। পানি উপরে উঠে আসায় ওখানে পৌঁছতে এখন আর মইয়ের প্রয়োজন নেই, সাঁতার কেটে একটু সরে গেলেই হলো। 'একটা পয়সা পেলে ওটা খোলার চেষ্টা করে দেখা যেত। বলা যায় না, ওটা এখান থেকে বেরোবার গোপন পথও হতে পারে।'

ঝট করে চাইল জংগু আর আরতি স্টীলের চাকতিটার দিকে। এতক্ষণ ওরা কেউ দেখতে পায়নি ওটা। ব্যাগটা খুলে দুই সেকেন্ড খুঁজে একটা পয়সা বের করে দিল আরতি। জংগুর দিকে ফিরল রানা।

'জংগু, এঁকে একটু ধরবে?'

'খামোকা ধরে রেখেছেন। ছেড়ে দেন হারামজাদীকে! চলে যাক ওর নাগরের কাছে। এরই জন্যে আজ আমাদের এই অবস্থা।'

জংগুর বক্তব্য শুনে ওর হাতে আরতিকে সোপর্দ করা ঠিক হবে বলে মনে করল না রানা। আর মাত্র দুই ফুট আছে। চাপা বাতাসে ঘামছে ওরা দরদর করে। শ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। অগত্যা ওই অবস্থাতেই একহাতে আরতিকে ধরে আরেক হাতে স্ক্রু খোলার জন্যে তৈরি হলো রানা।

'আমাকে বরং ছেড়েই দিন,' বলল আরতি। 'সত্যি বলছি, আমার প্রাণের খুব একটা দাম নেই।'

'বাজে কথা রাখুন। সবার প্রাণের দাম আছে। ঢাকায় যাকে খুন করিয়ে ফিরে এসেছেন, তারও, আপনারও। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। এবার জোরে জোরে হাত-পা নাড়তে থাকুন, তাতে আমার ওপর চাপটা হালকা হবে।'

বেশ শক্ত করে আঁটা স্ক্রুগুলো, একটা খুলতেই বেশ অনেকখানি সময় ব্যয় হয়ে গেল। সেইদিকটা টেনে সামান্য একটু ফাঁক করে দেখল রানা

উপরে আবছা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আশায় দুলে উঠল ওর মনটা।

'ওপরে আলো দেখা যাচ্ছে!' বলল সে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে রানা। 'আর একটা খুলতে পারলেই বোঝা যাবে।'

গিলটি মিঞার কোন সাড়া ছিল না এতক্ষণ। হঠাৎ ওর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'পানির পাইপ খুঁজে পাওয়া গেল না, স্যার। মাটির নিচ দিয়ে গেছে ওটা। দরজা থেকে দূরে সরে যান যতটা পারেন। আমি রেডি বললেই ডুব দেবেন। বোম মারব আমি একোন দরজায়।'

রানা বুঝল, এছাড়া গিলটি মিঞার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়। হ্যান্ড গ্রেনেড মেরে তিন ইঞ্চি স্টীলের দরজা ধসানো যাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু করুক চেষ্টা। রানাও চেষ্টা করছে। দু'জনের একজন সফল হলেই যথেষ্ট। বলল, 'ঠিক আছে, গিলটি মিঞা।'

গিলটি মিঞার বক্তব্য বুঝতে পেরেই শাবলটা হাত থেকে ফেলে ডাইভ দিয়ে চলে এল জংগু এপাশে।

চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেছে রানা। পানি বেড়ে উঠেছে আরও। বাকি দুটো স্ক্রুর একটাকেও নড়ানো যাচ্ছে না একটুও। আঙুল দুটো ব্যথা হয়ে গেছে ওর। বাম হাতে ধরা আরতির দেহটা কাঁপছে থর থর করে।

'ডুব দেন, স্যার!' গিলটি মিঞার কণ্ঠস্বর।

লম্বা করে দম টেনে ঝুপ করে ডুব দিল জংগু। রানা ডুব দিল না। ভাবল, যা হয় হোক, ডুব দিলে আর আরতিকে নিয়ে ভেসে ওঠা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। দাঁতে দাঁত চেপে জোরে একটা চাপ দিতেই স্ক্রু খুলে গেল আধ প্যাঁচ।

'ভয় লাগছে?' আরতিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখন আর ততটা লাগছে না। আপনার?'

'আমার লাগছে, কিন্তু পাত্তা দিচ্ছি না। ভয় পেয়ে লাভ নেই তো।'

বাইরে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। কিন্তু দরজা যেমন ছিল তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পানিতে সামান্য একটু কাঁপন অনুভব করা গেল মাত্র। ভুশ করে ভেসে উঠল জংগু। মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখের উপর থেকে পানি সরাল। অবাক হয়ে দেখল দ্বিতীয় স্ক্রুটা খুলে তৃতীয়টা আটকানো অবস্থাতেই স্টীলের পাতটা সরিয়ে দিচ্ছে রানা ফোকরের মুখ থেকে। চওড়া একটা গর্ত সৃষ্টি হচ্ছে সিলিঙের গায়ে।

হঠাৎ ওপাশের দেয়ালের গায়ে পা বাধিয়ে ঝাঁপ দিল জংগু, প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা ও আরতিকে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল আরতি। রানাকে আবার ডুব দেয়ার নির্দেশ দিল গিলটি মিঞা, তিন সেকেন্ড পরেই আরও একটা বিস্ফোরণ হলো দরজার গায়ে। এবারও দরজা যেমন ছিল তেমনি রইল।

ছাতে ঠেকল রানার মাথা। সিলিঙের বালবটাও পানি ছুঁই ছুঁই করছে।

'চিত হয়ে থাকুন,' বলল রানা, 'তাহলে শ্বাস নেয়ার জন্যে আরও ছয়

ইঞ্চি জায়গা পাওয়া যাবে। এই ছ'ইঞ্চি ভরার আগেই বেরিয়ে যাব আমরা এখান থেকে। সিনেমার মত। ঠিক শেষ মুহূর্তে উদ্ধার পেয়ে যাব, দেখবেন আপনি।'

কিছুদূর ফাঁক হয়েই ফেঁসে গেছে স্টীলের ঢাকনা। টানা হেঁচড়া করছে জংগু ওটা নিয়ে।

'সান্ত্বনা দিচ্ছেন?' ম্লান হাসল আরতি। 'তার দরকার নেই, মিস্টার মাসুদ রানা। বুঝতে পেরেছি, মারা যাচ্ছি আমরা। কিন্তু এখন আর তেমন খারাপ লাগছে না। তাছাড়া এমনিতেও মরতে হত আমাকে। কবির চৌধুরীর সাথে বিরোধিতা করে আজ পর্যন্ত কেউ বাঁচতে পারেনি। আমার কপাল ভাল, আপনার মত একজন মহৎ মানুষের সাথে মরবার সুযোগ পেয়েছি। আমি জানি, যদি স্বর্গ বলে সত্যিই কিছু থাকে, তাহলে আমার মত একটা পাপিষ্ঠার জন্যে এতকিছু করার জন্যে আপনি সেখানেই যাবেন। আর আপনার সাথে দেখা হবে না আমার, কারণ আমি ওখানে পৌঁছতে পারব না। বিদায়ের আগে একটা কথা বলে যাই—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এবার দয়া করে ছেড়ে দিন। আর বৃথা চেষ্টা না করে তলিয়ে যাই।'

'হাল ছাড়বেন না, মিস আরতি। শেষ না দেখে হাল ছাড়তে নেই। তাহলে আর লাস্ট মিনিট রেসকিউর সুযোগ থাকে না। শেষ মুহূর্ত উপস্থিত না হলে তো আর নাটক জমতে পারে না।' হাসল রানা।

'আমরা নাটক করছি বুঝি? তাই কি চিরঞ্জীবের মৃত্যুতে এক বিন্দু খারাপ লাগল না আমার? উঁহুঁ। তা নয়। করিডরে ভেসে যাওয়ার সময় ওর সাথে চোখাচোখি হলো আমার, ও দেখল ভেসে যাচ্ছি আমি, সরিয়ে নিল চোখ। বুঝতে পারছি, এতদিন নাটক করেছি আমরা। আজ দাঁড়িয়েছি এসে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি।'

গিলটি মিঞার কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবছা মত, কিন্তু কি বলল বোঝা গেল না।

এদিকে স্টীলের পাতটা সিলিঙের সাথে চেপে বসায় গর্তের মুখটা আর বড় করতে পারছে না জংগু। বেশ কিছুক্ষণ অনর্থক ব্যয় করল সে ওটাকে সমান্তরাল ভাবে টানাটানি করে। তারপর বুদ্ধি করে হ্যাঁচকা টান মারল নিচের দিকে। মড়াৎ করে স্ক্রু ভেঙে চলে এল পাতটা জংগুর হাতে। ওটা ছেড়ে দিয়েই দুই কনুই দিয়ে আঁকড়ে ধরল সে গর্তের কিনারা, চাপ দিয়ে উঠে গেল উপরে।

পরমুহূর্তে ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ শুনতে পেল রানা।

জংগুর আর্তনাদ।

দপ করে নিভে গেল বাতি।

মাংস পোড়া গন্ধ এল নাকে।

ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল ভারী কিছু।

এগারো

অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতেই গোল ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেল রানা। আরতিকে টেনে নিয়ে এল সে ফাঁকটার কাছে। আরেকটা বিস্ফোরণের মৃদু ধাক্কা অনুভব করল।

আর তিন ইঞ্চি আছে, ফাঁকটার কাছে নাক জাগিয়ে রাখতে পারলেও লাভ। একহাতে গর্তের কিনারাটা ধরে মাথা উঁচু করল রানা। মুহূর্তে বুঝতে পারল সে জংগুর আর্তনাদের কারণ। টের পেল কতটা জঘন্য চরিত্রের লোক এই কবির চৌধুরী, কতখানি ধূর্ত নর-পিশাচ।

ইলেকট্রিক শক খেয়ে মারা গেছে জংগু। সমস্ত নিচতলাটা ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে তৃপ্ত হয়নি কবির চৌধুরী, কিছু সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচেরও ব্যবস্থা করেছে। রীতিমত প্ল্যান করে বসানো হয়েছে স্টীলের পাতটা এখানে। মৃত্যুফাঁদে আটকা পড়া লোকগুলো প্রাণভয়ে ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠে আসবে, জানা আছে কবির চৌধুরীর। কোনদিকে বাঁচবার কোন পথ আছে কিনা খুঁজবে তারা। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবে কিছু, কিছু মরবে পানিতে ডুবে। বাকিদের মধ্যে কারও না কারও চোখে পড়বে সিলিঙের গায়ে প্রায় মিশে থাকা এই পাতটা, লক্ষ করবে স্ক্রু দিয়ে আঁটা আছে ওটা, মনে করবে ওটা খুলতে পারলে হয়তো পাওয়া যাবে মুক্তির পথ। কাজেই যত্নের সাথে ইলেকট্রিকের খোলা তার রেখে দেয়া হয়েছে সেই অতি বুদ্ধিমানের মুক্তির পথে। স্পর্শ করবার সাথে সাথেই মৃত্যু ঘটবে তার। কিন্তু একাধিক লোক থাকলে তাদের জন্যে কি ব্যবস্থা?

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছেঁড়াখোঁড়া তারগুলো। আর শক দেয়ার ক্ষমতা নেই ওগুলোর। প্রথমজনের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়জন যদি এই ছেঁড়া তার দেখে সাহস করে উঠে আসে উপরে, তাহলে? তার জন্য কি কোন ব্যবস্থা রাখেনি কবির চৌধুরী?

গর্তটা তিনচার ফুট উঁচু। আরতিকে জড়িয়ে ধরে বহু কষ্টে উঠে গেল রানা উপরে। হাত পা ছড়ে গেল, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। গর্ত থেকে মাথাটা বেরোতেই চাপা গর্জন শুনতে পেল রানা। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল উলফ-হাউন্ডগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে। দূরদৃষ্টি আছে বটে কবির চৌধুরীর!

'আমাকে আগে উঠতে দিন,' বলল আরতি। 'কিছুই বলবে না ওরা আমাকে। বেঁধে ফেললেই আপনি উঠে আসতে পারবেন।'

ঠেলে তুলে দিল রানা আরতিকে। চোঙের মাঝামাঝি এসে থেমে গেছে পানির বৃদ্ধি। খুব সম্ভব দীঘির পানির সাথে একই সমান উচ্চতায় পৌঁছে গেছে পানি। সব কিছুই মাপাজোখা, একেবারে হিসেব করা। এখন নিচে

নামারও উপায় নেই।

আরতির ডাকে বেরিয়ে এল রানা ফোকর গলে চার হাতপায়ের সাহায্যে। চোখ গরম করে চাইল ওর দিকে কুকুরগুলো, চাপা গলায় ধমকও দিল দু'চারটে, কিন্তু শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলায় এগোতে পারল না।

ছোট্ট একটা কুকুরের ঘরে উঠে এসেছে ওরা। লোহার শিকের তৈরি গেটে প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে বাইরে থেকে। ঘরের একদিকে তারের জাল দেখে অবাক হলো রানা। ওপাশেও তারের জাল, তারপর ফাঁকা মাঠ। জাল ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া খুবই সহজ।

'ওটা মাকড়সার ঘর,' রানাকে ওদিকে চাইতে দেখে বলল আরতি। 'ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার। কয়েক হাজার মাকড়সা আছে ওর মধ্যে। একটা কামড় দিলেই মারা যাবেন।'

রানা বুঝল, এটা হচ্ছে কবির চৌধুরীর শেষ রসিকতা। যদি কেউ কুকুরের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, কিংবা কোন কৌশলে কুকুরগুলোকে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে অত প্রকাণ্ড তালা ভাঙার বৃথা চেষ্টা না করে সরু তারের জালটা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে সে। এবং তা করতে গেলেই মারা পড়বে নির্ঘাত। মোটকথা রেহাই পাওয়ার কোন রাস্তা রাখেনি কবির চৌধুরী।

'আমাকে কি পুলিসে দেবেন?' হঠাৎ পরিষ্কার কণ্ঠে প্রশ্ন করল আরতি।

'এখান থেকে বেরোনো যায় কিভাবে বলুন তো?' আরতির প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। 'হাঁক ডাক শুরু করব?'

'তার দরকার নেই। কুকুরগুলোকে আমিই খাওয়াই রোজ। ওই তালার চাবি রয়েছে আমার ব্যাগের মধ্যে।' আবার আগের প্রশ্নটা করল আরতি। 'নিশ্চয়ই পুলিসও এসেছে আপনার লোকের সাথে। ধরিয়ে দিচ্ছেন আমাকে?'

'কতদিন ধরে পালাবার চেষ্টা করছেন এখান থেকে?' এবারও এড়িয়ে গেল রানা প্রশ্নটা।

'ছয়-সাত মাস।'

'ব্ল্যাক স্পাইডারের হয়ে যেসব অন্যায় কাজ করেছেন তার জন্যে অনুশোচনা হয় না আপনার?'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল আরতি, তারপর বলল, 'আমি হুকুম তামিল করেছি। না করে উপায় ছিল না। কিন্তু তাই বললে আমার যে দোষ স্খালন হয় না, তা জানি।'

'কথাবার্তায় আপনাকে শিক্ষিতা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ভদ্র ঘরের মেয়ে। এপথে এলেন কি করে?'

খুব সংক্ষেপে বলল আরতি বাবা-মা-ভাই-বোনের কথা। বিশেষ করে অধ্যাপক পিতার কথা বলতে গিয়ে টপটপ কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখ থেকে। তারপর বলল কিভাবে চিরঞ্জীবের সাথে পরিচয়, প্রেম, পলায়ন, না খেয়ে মরার দশা, তারপর এই চাকরি।

চুপচাপ শুনল রানা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ওদিকে হাল ছেড়ে না দিয়ে

পাগলের মত একটার পর একটা গ্রেনেড মেরে চলেছে সিলটি মিঞা স্টীলের দরজার উপর। রানা বুঝতে পারল, ভদ্রঘরের ভদ্র একটা মেয়ে ভুল করেছিল, ভুল পথে পা দিয়েছিল মোহের বশে, সে-ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে গর্ভপাত ঘটিয়ে চার মাসের সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে, পুলিসের তাড়া খেয়ে আতঙ্কিত জীবন যাপন করে, কবির চৌধুরীর রোষে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গিয়ে। ফিরে যেতে চাইছে মেয়েটা স্বাভাবিক জীবনে। পুলিসের হাতে পড়লে সেটা সম্ভব হবে না। অনুতপ্ত একজন দোষী মানুষের উপর আইনের পক্ষপাতহীন বিচার হবে নির্মম। একে কোনরকম সুযোগ দেয়ার কথা ভাববে না আইন। কিন্তু রানা তো দয়া, মায়া, অনুকম্পা, আবেগবর্জিত বিচারক নয়। ও তো সাধারণ একজন মানুষ।

নাহ্! একে ধরিয়ে দিলে পাপ হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা।

আরেকটা গ্রেনেড বিস্ফোরণের সাথে সাথেই ধড়াস করে একটা শব্দ হলো। বোঝা গেল বিরামহীন আক্রমণ আর সহ্য করতে না পেরে ধসে গেল দরজাটা। আরতির চোখের উপর চোখ রাখল রানা।

'আপনাকে যদি ছেড়ে দিই, পারবেন পালিয়ে যেতে?'

ঘাড় কাত করল আরতি। 'পারব।'

উঠে দাঁড়াল রানা। বাঁধানো কুয়োর মত গর্তটায় উঁকি দিয়ে দেখল দ্রুত নেমে যাচ্ছে পানি।

'তাহলে কথা দিন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবেন, আর ফসকাবে না পা?'

কাছে এসে রানার একটা হাত তুলে নিল আরতি। কৃতজ্ঞতায় পানি বেরিয়ে এল চোখ ফেটে। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'কথা দিচ্ছি। আর কোনদিন ভুল হবে না।'

দুই হাতে কুয়োর কিনার ধরে পা দুটো ভাঁজ করে তুলে ভিতরে ঢুকল রানা।

'গুড গার্ল! আপনি যেদিন সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেন, সেদিন জানবেন আমার ঋণ শোধ হয়ে গেছে। তার আগে পর্যন্ত ঋণীই থাকছেন।'

নেমে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ কথা বলে উঠল আরতি।

'আলিবাগে সমুদ্রের ধারে সানি ভিলায় সমস্ত টাকা পয়সা জমা করেছে কবির চৌধুরী। এখান থেকে পালিয়ে সোজা সেখানে যাবে ও। বাড়ির পেছনে ওর নিজস্ব জেটিতে নোঙর করা আছে একটা ইয়ট। টাকা পয়সা ইয়টে তুলে নিয়ে একবার ভেসে পড়লে আর খুঁজে পাবেন না ওকে। সানি ভিলার খবর জানতাম শুধু আমি আর চিরঞ্জীব। ও জানে আমরা দু'জনেই মারা গেছি, কাজেই খুব একটা তাড়াহুড়ো করবে না, এখনও পিছু ধাওয়া করলে পেয়ে যেতে পারেন ওকে ওখানেই।'

ভুরু কুঁচকে শুনল রানা খবরটা। তারপর দু'হাত ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে পড়ল আট হাত নিচের পানিতে।

বারো

সাদা বোতামটা টিপে দিয়েই উঠে দাঁড়াল কবির চৌধুরী। আর দেরি করা চলে না।

মাসুদ রানার সাথে দুটো কথা বলতে পারলে বড় ভাল হত, গায়ের ঝাল মিটিয়ে কয়েকটা কথা শুনিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু বড্ড দেরি করছে জংগু। পুলিস এসে পৌঁছানোর আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে। তাছাড়া কথা না বললেও কার হাতে মারা যাচ্ছে বুঝতে পারবে মাসুদ রানা। শুধু জানবে না যে রানার পরিচয়টাও জানা হয়ে গেছে ওর। এইখানটায় মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে। কিন্তু কি আর করা!

পানির ভালভটা খুলে দিয়েই গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল কবির চৌধুরী। প্রকাণ্ড গাড়িটা গেটের কাছে পৌঁছতেই বিস্ফারিত হয়ে গেল গার্ড দু'জনের চোখ ওকে নিজে ড্রাইভ করতে দেখে, সামলে নিয়ে দ্রুত হাতে গেট খুলে হাঁ করে দিল। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

ঘুর পথে যেতে হবে। ওয়ার্ডেন রোড ধরে কিছুদূর দক্ষিণে গিয়ে গোভালিয়া ট্যাংক রোড ধরে সোজা ছুটল সে পুব দিকে। বড় রাস্তা বর্জন করে অনেক গলিঘুঁচি ঘুরে বেরিয়ে এল সে শহরের বাইরে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল সে মাথেরানে। মেন রোড ছেড়ে একটা এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে এগোল এবার সেই পরিত্যক্ত এয়ার স্ট্রিপের দিকে। সন্ধের সময় পৌঁছে যাবে মোস্তাক। সন্ধে হতে বিশেষ দেরি নেই, বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। হোক। তাড়া নেই ওর। একমাত্র আরতি আর চিরঞ্জীবের জানা ছিল আলিবাগের কথা। ঘড়ি দেখল কবির চৌধুরী, এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে ওরা। পুলিসের সাধ্যও নেই এত অল্প সময়ে খুঁজে বের করে ওকে।

একটা ঝোপের আড়ালে গাড়িটা রেখে চুরুট ধরাতে যাচ্ছিল কবির চৌধুরী, এমন সময় কাছেই নড়ে উঠল একটা ছায়া। চমকে উঠল কবির চৌধুরী, ঝট করে হাতে তুলে নিল পাশের সীটে রাখা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা। আঁৎকে উঠল ওপাশের জানালায় বীভৎস একটা মুখ দেখে। দুঃস্বপ্নে দেখা বিকট মুখ।

'আপনি কি ব্ল্যাক স্পাইডারের লোক?' কুৎসিত মুখে ভয়ঙ্কর হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'আমি মোস্তাক।'

পিস্তলটা নামাল কবির চৌধুরী, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল একবার কদাকার মুখটা দেখে, কিন্তু সামলে নিল চট করে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মোস্তাক? সন্ধের সময় না ল্যান্ড করবার কথা ছিল। আগেই চলে এসেছ কেন?'

লোকটা তুমি করে বলছে, ধমকের সুরে কথা বলছে দেখে রেগে উঠতে যাচ্ছিল মোস্তাক, কিন্তু হঠাৎ কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা মনে হওয়ায় বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল কবির চৌধুরীর মুখ। ইনিই কি ব্ল্যাক স্পাইডার? ওর চরম সৌভাগ্যের মুহূর্ত কি উপস্থিত?

'সন্ধের পর ঝড় উঠবে, তাই আগেভাগেই কাজ সেরে ফিরে গেছে পাইলট,' বলল মোস্তাক।

কপালে উঠল কবির চৌধুরীর চোখ।

'ঝড় উঠবে! তাহলে তো মহা মুশকিল হবে দেখা যাচ্ছে!' আকাশের দিকে চাইল কবির চৌধুরী, তারপর বলল, 'কোথায়? জিনিস কই?'

'এই তো এখানেই আছে,' বলল মোস্তাক। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনি...'

'আমি ব্ল্যাক স্পাইডার। মালপত্র জলদি তুলে ফেলো! ঝড়ের আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে আলিবাগে। পথে গাছটাছ একআধটা ভেঙে পড়লে আটকে যাব।'

'আলিবাগ! বোম্বে যাচ্ছি না আমরা?'

'বাজে কথা বাড়িয়ো না!' ধমকে উঠল কবির চৌধুরী। 'তোমাকে যা বলেছি তাই করো।'

'ইয়েস, স্যার।'

দ্রুত পায়ে চলে গেল মোস্তাক সুটকেস আনতে। কবির চৌধুরী বুঝল, মস্ত ভুল করেছে সে একে ঢাকা থেকে আনিয়ে। জংগুকে যে কারণে সাথে রাখা যায় না, একেও ঠিক সেই একই কারণে সাথে রাখা যায় না। একবার দেখলে কেউ ভুলবে না এর চেহারা। একেও খসিয়ে দিতে হবে। তবে এখন না। সার্দি ভিলার স্ট্রংরূম থেকে ধনরত্ন ইয়টে তোলার ব্যাপারে এর সাহায্য দরকার। কাজ শেষ হয়ে গেলে স্ট্রংরূমের ভিতরেই একে মেরে রেখে তালা মেরে চলে যাবে সে।

একটা প্রকাণ্ড সুটকেস নিয়ে এল মোস্তাক। গাড়ির পিছনের বুটে সেটা রাখতে রাখতে লক্ষ করল চারটা কাঠের বাক্স, আর একটা ব্যাগ রাখা আছে ওখানে। ব্যাপার কি? কি আছে এই বাক্সগুলোর মধ্যে? আলিবাগে চলেছে কেন? সেখানে পৌঁছানোর ব্যাপারে এত তাড়াহুড়োই বা কিসের জন্যে? লোক না পাঠিয়ে নিজে এল কেন ওকে নিতে? গোলমাল হয়েছে কোন? পালাচ্ছে ব্ল্যাক স্পাইডার? ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠল সে।

কবির চৌধুরীর ইঙ্গিতে পিছনের সীটে উঠে বসল মোস্তাক। ওর ধূর্ত মস্তিষ্কে বনবন ঘুরছে চিন্তা।

'মিস আরতি লাহিড়ী কি আলিবাগেই আছেন?' জিজ্ঞেস করল মোস্তাক গাড়িটা চলতে শুরু করতেই।

আবার ধমকে উঠল কবির চৌধুরী।

'বাজে কথা রাখো তো! আজে বাজে কথা বলে আমার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটিয়ো না।'

রাগে সর্বশরীর জ্বলে গেল মোস্তাকের। এই রকম যদি মনিবের ব্যবহার হয়, তাহলে সে এর সাথে কাজ করবে কি করে? আগে জানলে টাকাগুলো এতদূর পর্যন্ত বয়ে না এনে নিজেই সাবড়ে দিত সে। যাই হোক কিছু একটা গোলমাল বেধেছে তাতে সন্দেহ নেই। ফোনে খানিকটা আভাস দিয়েছিল ব্ল্যাক স্পাইডার। বলেছিল বড় রকমের রদবদল হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে, ওকে ভাল একটা পজিশন দেয়ার লোভ দেখিয়েছিল। দেখা যাক, চোখ-কান খোলা রাখলে অবস্থার গতিক বুঝে নিতে বেশি সময় লাগবে না ওর।

পুনার পথে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে গাড়ি। চুপচাপ চলেছে ওরা। সন্ধে হয়ে আসায় ফগ-লাইট জ্বেলে দিয়েছে কবির চৌধুরী। কুরজার কাছাকাছি এসে হঠাৎ কথা বলে উঠল সে।

'পিস্তল আছে তোমার কাছে?'

'আছে, স্যার।' জবাব দিল মোস্তাক।

'সামনে একটা রোড ব্লকের মত মনে হচ্ছে। তোমার পিস্তলে সাইলেন্সার আছে?'

'না, স্যার।'

'ঠিক আছে। তোমারটা আমাকে দাও, আমারটা রাখো তোমার হাতে। কথাবার্তা যা বলার আমিই বলব। কিন্তু যদি আমাদের আটকাতে চায় তাহলে গুলি করবে তুমি। আমার ইঙ্গিত পেলেই গুলি করবে।'

সজাগ হয়ে গেল মোস্তাক। ব্যাপার কি? আটকাতে চাইবে কেন! জিজ্ঞেস করল, 'পুলিসের রোড ব্লক?'

'তবে কি তোমার হবু শালা-শালীদের?' খেঁকিয়ে উঠল কবির চৌধুরী, নাহ্ এই লোকটাকে নিয়ে পারা যাবে না। 'দেরি করছ কেন? দাও তোমার পিস্তল।'

হেড লাইট জ্বেলে দিয়েছে কবির চৌধুরী। দূরে একটা সাদা কালো ডোরা আঁকা বাঁশ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে, দেখতে পেল মোস্তাক। পিস্তলটা বের করে এগিয়ে দিল সে সামনের সীটের উপর দিয়ে, কিন্তু তার আগেই রিলিজ বাটন টিপে বের করে নিয়েছে সে ম্যাগাজিনটা। একটা মাত্র গুলি আছে পিস্তলের ব্রিচে।

মোস্তাকের পিস্তলটা পাশের সীটে রেখে নিজেরটা এগিয়ে দিল কবির চৌধুরী। সে-ও যে আলগোছে ম্যাগাজিনটা খুলে রেখে একটা মাত্র গুলি ভরা পিস্তলটা ওর হাতে দিয়েছে, টের পেল না মোস্তাক। দু'জনই খুশি হয়ে উঠল মনে মনে।

বাঁশটার কাছাকাছি এসে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে ব্রেক চাপল কবির চৌধুরী। এগিয়ে এল একজন সেপাই। নাম্বার প্লেটের দিকে চেয়েই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল সেপাইটা।

'কোথায় চলেছেন?' বাঁ পাশের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল সেপাই।

'পুনা,' স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল কবির চৌধুরী।

হঠাৎ ঝট করে অটোমেটিক কারবাইনটা কাঁধে তুলে নিল সেপাইটা

ধরল কবির চৌধুরীর চোখের দিকে লক্ষ্য করে। আঁৎকে উঠে আবস্থা ইঙ্গিত করল কবির চৌধুরী মোস্তাককে।

'নেমে আসুন গাড়ি থেকে। আপনাদেরকে অ্যারেস্ট...' দুপ করে একটা শব্দ হলো, দু'পা পিছিয়ে গেল সেপাইটা, তারপর কারবাইনসহ হুড়মুড় করে পড়ে গেল রাস্তার পাশের খাদে। এমনি সময় ডান পাশ থেকে আরেকজন এগিয়ে এল। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিল বলে ওকে দেখতে পায়নি কবির চৌধুরী।

'কিয়া হুয়ারে, লছমানিয়া! ই গাড়ি...'

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল দ্বিতীয় সেপাই কবির চৌধুরীর হাতের পিস্তলটা দেখে। কোটর থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হলো ওর। প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ বেমানান লাগছে ওর ভীত মুখে।

'বাঁশ তোলো!' আদেশ করল কবির চৌধুরী।

কারবাইনটা রাস্তার উপরই ছেড়ে দিয়ে ভয়ে ভয়ে বাঁশ তুলে দিল লোকটা। বাম হাতে স্টীয়ারিং ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে এল কবির চৌধুরী। তারপর থেমে দাঁড়িয়ে টাশ্‌শ্‌ করে গুলি করল ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর। বাঁশ ছেড়ে দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেপাইটা রাস্তার উপর, তিন-চার সেকেন্ড ছটফট করে স্থির হয়ে গেল। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

'এদের ওপর এই গাড়িটা আটকাবার হুকুম ছিল,স্যার!' বলল মোস্তাক উত্তেজিত কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' আপন মনে বলল কবির চৌধুরী। 'নিশ্চয়ই গার্ডদের কাছে পেয়েছে পুলিস এই গাড়ির নম্বর। ভয় নেই। আর খানিক এগিয়েই আমরা ধরব ডানদিকের পাহাড়ী পথ। আমরা যেখানে চলেছি সে ঠিকানা জানা নেই বোম্বের কারও। যাদের জানা ছিল তারা আর কেউ বেঁচে নেই। পুলিস যখন এই ঠিকানা জানবে তখন আমি বহুদূরে, ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

মোস্তাকের কাছে পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। ভাগছে শালা। ওর জানা আছে, মানুষের দুর্বলতম সময় হচ্ছে তার পালাবার সময়। তা সে যত বড় দস্যু সর্দারই হোক না কেন। যখন পালাচ্ছে তখন সে একটা কুকুর লেলিয়ে দেয়া ভিখারীর চেয়েও দুর্বল। তাকে যদি কাবু করতে হয়, তাহলে তার পালাবার মুহূর্তে আঘাত করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, আঘাত করবে সে। তার আগে দেখা যাক কি মতলব এঁটেছে ব্যাটা। প্রায় মাইল ত্রিশেক খাড়াই উৎরাই ভেঙে সানি ভিলার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। নেমে গিয়ে গেট খুলে দিল মোস্তাক, আবার এসে উঠে বসল। একেবারে গাড়ি বারান্দায় গিয়ে থামল গাড়িটা।

প্রায় তিন বিঘা জমির উপর ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। সমুদ্রের ধারে। খাড়া পাহাড়ী তীরে এসে আছড়ে পড়ছে আরব সাগরের ঢেউ। মহা কলরোল। জন-প্রাণীর চিহ্ন নেই আশেপাশে কোথাও। বেশ অনেকক্ষণ হলো আঁধার হয়ে গেছে।

'ইয়ট চালাতে পারো?' গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী।

'নেভিগেশন সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে?'

মিথ্যে কথা বলল মোস্তাক। 'না, স্যার। কেন?'

কোন কর্মের নয় লোকটা, ভাবল কবির চৌধুরী। লম্বা সমুদ্রপথ পাড়ি দেয়ার ব্যাপারে যদি কোন কাজে লাগত তাহলেও না হয় আজকেই শেষ করে না দিয়ে আর কয়টা দিন বাঁচিয়ে রাখা যেত ব্যাটাকে। সেক্ষেত্রে ডারব্যান পৌঁছবার একদিন আগে ওকে খতম করে দিলেই চলত। যাই হোক, ঝামেলা না বাড়িয়ে আজই শেষ করে দেবে সে। তার আগে ওকে দিয়ে মোট বইয়ে নেয়া যাক।

'শোনো, মোস্তাক। এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি আজই রাতে। হেডকোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারব্যান শহরে। চিরঞ্জীব, আরতি বা আর কেউ যাচ্ছে না আমার সাথে। তুমি যাবে?'

'আপনি হুকুম করলে যাব, স্যার।'

মুখে এই কথা বলল মোস্তাক, কিন্তু মনে মনে বলল, দাঁড়াও শালা, তোমার যাওয়া বের করছি আমি। হয় তুমি যাবে, নয় আমি যাব–দু'জন একসাথে যাব না কোথাও।

'ঠিক আছে, মোস্তাক। তুমি যাবে আমার সাথে। এখানে আর অনর্থক দেরি করার মানে হয় না। এসো আমার সাথে। কয়েকটা বাক্স তুলতে হবে ইয়টে।'

তালা খুলে ঢুকে পড়ল ওরা বাড়ির ভিতর। সিঁড়ি ঘরে এসে কয়েকটা ভাঙাচোরা চেয়ার টেবিল সরাতে বলল কবির চৌধুরী মোস্তাককে। সেগুলো সরানো হলে দেয়ালের কাছে গিয়ে এককোণে ঝুলে থাকা একটা রশি ধরে টান দিল কবির চৌধুরী। এতক্ষণ যেটাকে দেয়াল মনে হচ্ছিল সেটা আসলে একটা পর্দা, সরে গেল দু'ফাঁক হয়ে। একটা স্টীলের দরজায় পরপর তিনটে চাবি ঘুরাতেই খুলে গেল সেটা। দরজার ওপাশে সাত-আট ধাপ সিঁড়ি। ভিতরে ঢুকে একটা সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল একটা আটফুট বাই দশ ফুট ঘর। ঘরের মেঝেতে সাজানো আছে ছোট বড় নানান আকৃতির পনেরো-ষোলোটা কাঠের বাক্স।

একটা বাক্স দেখিয়ে কবির চৌধুরী বলল, 'এটা নিতে হবে সবচেয়ে শেষে। দু'জন না ধরলে হবে না। ভারী।'

বাক্সের ভিতর কি আছে বুঝতে অসুবিধে হলো না মোস্তাকের। ইঙ্গিত পেয়ে বড়সড় একটা বাক্স তুলে নিল সে কাঁধের উপর। রওনা হলো দরজার দিকে। সাত ব্যাটারির একটা টর্চ হাতে পিছু পিছু আসছে কবির চৌধুরী। বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে সোজা গজ পঞ্চাশেক হেঁটে এসে থামল ওরা জেটিতে নোঙর করা সুন্দর একটা ইয়টের পাশে।

'ব্যস, ব্যস। এখানেই নামিয়ে দাও তুমি, আমি ওপরে তুলছি।' গাড়ির ইগনিশন কী-টা পকেটে আছে কিনা পরীক্ষা করে নিয়ে বলল, 'এবার তুমি গাড়ির মালগুলো নিয়ে এসো।'

ঘেমে নেয়ে উঠল মোস্তাক। মনে মনে কবির চৌধুরীর চোদ্দগুষ্ঠী উদ্ধার

করল সে। ব্যাটা ভাবছে, খুব খাটিয়ে নিচ্ছে। দাঁড়াও। শেষ বাক্সটা উঠে যাক আগে ইয়টে, তারপর দেখতে পাবে মোস্তাক আহমেদের আসল চেহারা। তোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নেব আগে, তারপর খুন করব।

একে একে সব ক'টা বাক্সই উঠল ইয়টে, বাকি শুধু এখন বড় বাক্সটা। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকছিল এতক্ষণ কবির চৌধুরী, এবার নেমে এল-মোস্তাকের পিছু পিছু। ওর ঠোঁটের কোণে ভয়ঙ্কর একটা চাপা হাসি খেলে গেল, দেখতে পেল না মোস্তাক।

স্ট্রংরুমের সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে নামল মোস্তাক, তারপর কবির চৌধুরী। বড় বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মোস্তাক, ওটা ঘরের মাঝখানে আনবার জন্য টান দিয়েই বোকা হয়ে গেল সে। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'এটা তো খালি!'

ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল মোস্তাক কবির চৌধুরীর হাতে পিস্তল। সোজা ওর বুকের দিকে তাক করা। মুখে নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি। বিদ্যুৎবেগে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা বের করল মোস্তাক। বিস্তৃততর হলো কবির চৌধুরীর মুখের হাসিটা।

'শুধু ওটা নয়, তোমার পিস্তলটাও খালি। তোমাকে সাথে নিতে পারছি না, মোস্তাক। দুঃখিত।'

গুলি করল মোস্তাক।

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। গুলি বেরোল না।

হাহা করে হেসে উঠল কবির চৌধুরী। অব্যর্থ লক্ষ্য স্থির করল মোস্তাকের হৃৎপিণ্ড বরাবর। টিপে দিল ট্রিগার।

এবারও ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। গুলি বেরোল না।

তিন সেকেন্ড পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল ওরা। পরমুহূর্তে ক্ষুধার্ত চিতাবাঘের মত লাফ দিল মোস্তাক।

সাঁই করে পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল কবির চৌধুরী। প্রচণ্ড জোরে লাগল সেটা মোস্তাকের চাঁদিতে। ঠকাস করে আওয়াজ হলো। কিন্তু নকল পা নিয়ে ঠিক সময় মত সরে যেতে পারল না সে। হুড়মুড় করে ওর গায়ের উপর এসে পড়ল মোস্তাক। পড়ে গেল কবির চৌধুরী।

খুলি ফেটে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে মোস্তাকের, কিন্তু তাই নিয়েই পাগলের মত ঘুসি মেরে চলেছে সে কবির চৌধুরীর নাকে, মুখে, বুকে। উপায়ান্তর না দেখে ঘ্যাচ করে একটা আঙুল ভরে দিল কবির চৌধুরী মোস্তাকের ডান চোখে, উপড়ে তুলে আনল ওর অবশিষ্ট চোখটা।

গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল মোস্তাক। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারাল।

মোস্তাকের জ্ঞানহীন দেহটা নিজের শরীরের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কবির চৌধুরী। থুক করে একটা ভাঙা দাঁত ফেলল মেঝেতে, তারপর টালমাটাল হয়ে উঠে দাঁড়াল। মোস্তাকের মাথার কাছে পড়ে রয়েছে ওর চোখটা, কটমট করে চেয়ে রয়েছে সেটা কবির চৌধুরীর দিকে।

নিজের পিস্তলটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল কবির

চৌধুরী। বেরিয়ে এসে স্ট্রংরুমের দরজায় চাবি মেরে দিল পরপর তিনটে। তারপর পর্দাটা যেমন ছিল তেমনি করে টেনে দিয়ে পিছন ফিরল। এবং ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল।

ঠিক পাঁচফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাসুদ রানা। হাতে পিস্তল।

অবিশ্বাস্য!

দুই হাতে চোখ ডলল কবির চৌধুরী, বার কয়েক চোখ মিটমিট করল, তবু যখন অদৃশ্য হয়ে গেল না রানা, তখন বুঝতে পারল চোখের ভুল নয়। আশ্চর্য কোন উপায়ে বেঁচে ফিরে এসেছে মাসুদ রানা বন্দী-গুহা থেকে। ধাওয়া করে এসেছে এখানে ওর পিছু পিছু।

আর কোন আশা নেই। হেরে গেছে সে।

তবু শেষ চেষ্টা করল কবির চৌধুরী। গুলি নেই, তবু ঝট করে বের করল সে পিস্তলটা। যদি ভয় দেখিয়ে…কোন…রকমে…যদি…

গুলি করল রানা।

এমনি সময়ে সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেল।

দ্রুত এগিয়ে আসছে পুলিসের গাড়ি।

***